রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা সংখ্যা : ১ ॥ বসন্ত ১৪২৬

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

সংখ্যা : ১ ॥ বসন্ত ১৪২৬

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা



সংখ্যা : ০১ ॥ বসন্ত ১৪২৬

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

প্রকাশক
রেজিস্ট্রার, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

স্বত্ব
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সংখ্যা : ১ ॥ বসন্ত ১৪২৬ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২০

মুদ্রণ
কালার লাইন
৬৯/এফ, গ্রিন রোড, পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

The Rabindra Biswabidyalaya Patrika
[Bilingual Journal of Rabindra University, Bangladesh]
Editor : Biswajit Ghosh
Volume : 01 ॥ Basanta 1426 ॥ February 2020

অনলাইন সংস্করণ : www.rub.ac.bd

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

সম্পাদক

বিশ্বজিৎ ঘোষ

সহযোগী সম্পাদক

মোঃ মাইনুল ইসলাম

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা

সম্পাদনা পরিষদ

বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক)
মাননীয় উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

মোঃ ফখরুল ইসলাম (সদস্য)
চেয়ারম্যান, রবীন্দ্র অধ্যয়ন বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

মোহাম্মদ তানভীর আহমেদ (সদস্য)
চেয়ারম্যান, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ অধ্যয়ন বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

আরিফুল ইসলাম (সদস্য)
চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

মোঃ মাইনুল ইসলাম (সহযোগী সম্পাদক)
প্রভাষক, রবীন্দ্র অধ্যয়ন বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধে উপস্থাপিত তথ্য, অভিমত বা মন্তব্যের দায় সম্পাদনা পরিষদের নয়, তা একান্তই লেখক/লেখকবৃন্দের।

সূচি

এম. মতিউর রহমান ॥ নান্দনিক ও অ-নান্দনিক মনোভাব ॥ ১

জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ ॥ লিপির উৎপত্তি : প্রসঙ্গকথা ॥ ২৫

আকলিমা ইসলাম কুহেলী ॥ রাগসংগীতের ইতিহাসে রামপুর (সহসওয়ান) ঘরানার ঐতিহ্য ॥ ৪৫

শারমিন মুস্তারী ॥ নজরুলের নাটকে লোক-উপাদানের ব্যবহার ॥ ৫৩

মো. জফির উদ্দিন ॥ বিশ্বভারতী : রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্বসাধনা ॥ ৬১

সাবিনা ইয়াসমিন ॥ শামসুর রাহমানের কবিতা : আত্মজৈবনিকতা ও আত্মস্বীকারোক্তি ॥ ৮৫

মাখন চন্দ্র রায় ॥ সতীনাথ ভাদুড়ীর *চিত্রগুপ্তের ফাইল* : ব্যক্তি ও রাজনীতি ॥ ১০৫

লায়লা ফেরদৌস ॥ বাংলা নাটকে সংগীতের প্রয়োগ প্রসঙ্গ : আদি ও মধ্যযুগ ॥ ১২১

মো. রাফাত আলম মিশু ॥ *সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি* কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ ॥ ১২৭

মোঃ রিফাত-উর-রহমান ॥ হাটিকুমরুল শিব মন্দিরের পোড়ামাটির চিত্রফলকে সাংস্কৃতিক শিল্পবোধ ॥ ১৩৭

মোঃ আরিফুল ইসলাম ॥ *সংশপ্তক* উপন্যাসে বিপ্লবী চেতনার স্বরূপ ॥ ১৪৯

জাবেদ ইকবাল ॥ আফ্রিকার ছোটগল্প : উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, দাসব্যবসা ও আফ্রিকী জীবন ॥ ১৬১

Shipra Sarkar ॥ Folk-Traditions of Dhaka : Pottery ॥ ২০৩

Ayrin Chowdhury ॥ Some aspects of problems and prospects of Tourism Sector in Bangladesh : A critical review of relevant studies ॥ ২১৯

Muslima Jannat Mou ॥ Factors behind EFL Learner's Low Proficiency Level : Tertiary-Level EFL Lerarners' Perception ॥ ২২৩

Sabiha Sarwar ॥ The present Scenario of Agro-Forestry Practices and its Conservation in Jashore District in Bangladesh ॥ ২৩৩

নান্দনিক ও অ-নান্দনিক মনোভাব

এম. মতিউর রহমান*

[সারসংক্ষেপ : প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে, নন্দনতত্ত্বকে সৌন্দর্যদর্শন বা সৌন্দর্যবিজ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু, নন্দনতত্ত্ব জ্ঞানার্জনের এমন একটি সর্বাত্মক শাখার নির্দেশ দান করে, অভিরুচির সকল দিকই যার অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে নন্দনতত্ত্বের পরিধি যেমন গভীর, তেমনি ব্যাপক। সুন্দরের অঙ্গারাজ্যে অসুন্দরও বরণীয়, নন্দনতত্ত্ব একথা কবুল করে নেয়। তাই নন্দনতত্ত্ব কেবল নান্দনিক মনোভাব নিয়েই আলোচনা করে না, অ-নান্দনিক মনোবৃত্তির ওপরও সমানভাবে আদ্যতা প্রদান করে। প্রতীচ্যের কয়েকজন খ্যাতনামা সমকালীন নন্দনতত্ত্ববিদ ও শিল্পরসিকের যুক্তির নিকষ-পাষাণে প্রস্তাবিত বিষয়ে একটি রূপরেখা উপন্যস্ত হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।]

আকৃতি, রং, ধ্বনি, শব্দ, বিষয়বস্তু, বস্তু সমন্বয়, এমনকি শিল্পকর্ম সম্বন্ধে অনেক অবধারণের ক্ষেত্রে যদি প্রস্তাব করা হতো যে, ওইরূপ অবধারণ গঠনে নান্দনিক সংবেদনশীলতা, প্রত্যক্ষযোগ্যতা বা অভিরুচি প্রকাশিত হয়, তাহলে তা হাস্যকর হতো। অনুরূপভাবে, এটাও হাস্যকর হতো যদি প্রস্তাব করা হতো যে, নান্দনিক সংবেদনশীলতার জন্য কোনো কিছুকে দেখা, লক্ষ করা বা প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন যে সেটি হলো বড়ো, সবুজ, ধীর ও একমাত্রিক। এগুলিকে আমরা বলবো অ-নান্দনিক অবধারণ, গুণ, বর্ণনা ও প্রত্যয়। বিপরীত দিকে, এমন কতকগুলি অবধারণ আছে যাদের ক্ষেত্রে নান্দনিক সংবেদনশীলতা ও প্রত্যক্ষযোগ্যতা প্রকাশিত হওয়ার কথা বলা যায়। অনুরূপভাবে এ কথা বলা স্বাভাবিক যে, নান্দনিক সংবেদনশীলতার জন্য কোনো কিছু দেখা, প্রত্যক্ষ করা, লক্ষ করা প্রয়োজন যে, সেটি হলো মাধুর্যপূর্ণ, সুস্বাদু, মনোরম অথবা এটি এমন একটি শিল্পকর্ম যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, গতিশীল ও শক্তিশালী। কাজেই, এখানে আমরা নান্দনিক অবধারণ, গুণ, বর্ণনা ও প্রত্যয়ের কথা বলছি (Sibley, 1959 : 421-450)।

বিভাজনের ভিত্তি

কতকগুলি অবধারণ, গুণ ও প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে আমরা এই বিভাজনটি নির্ধারণ করেছি। এই বিভাজনের সপক্ষে কোনো যুক্তি দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আমরা বিশ্বাস করি যে, এর ব্যাখ্যায় একটি দৃষ্টান্ত দিলেই প্রায় সবাই অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলি শনাক্ত করতে সক্ষম হবে; অবশ্যই কিছু দ্ব্যর্থক ও প্রান্তিক দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে বিতর্ক থেকে যাবে। এই বিভাজনকে অস্বীকার করা মানে নন্দনতত্ত্বের প্রায় সমস্ত প্রশ্নের আলোচনাকে বর্জন করা, ঠিক যেমন কিছু প্রত্যয়কে নৈতিক ও কিছু প্রত্যয়কে অ-নৈতিক হিসেবে গ্রহণ না করে কোনো নৈতিক আলোচনা শুরুই হতে পারে না (Wollheim, 1980 : 260)। এর বিষয়বস্তুর দৃষ্টান্তগুলিকে শনাক্ত করতে অবশ্যই আমাদের সক্ষম হতে হবে। যারা তাদের তত্ত্বচিন্তার মুহূর্তে ওইরূপ বিভাজনকে অস্বীকার করেন, তারাও কার্যক্ষেত্রে ওই বিভাজনকে মেনে নেন।

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কিছু নান্দনিক অবধারণে নান্দনিক পদের প্রয়োগ হয়ে থাকে (যেমন, 'মাধুর্যপূর্ণ', 'সামঞ্জস্যপূর্ণ', 'জাঁকালো'), কিন্তু অন্যান্য অবধারণে ওইরূপ প্রয়োগ থাকে না (যেমন, 'এটি যথেষ্ট বিবর্ণ', 'এর বহু চরিত্র রয়েছে')। এখানে উভয় প্রকার নান্দনিক অবধারণ আমাদের বিচার্য। কিন্তু, সর্বাধিক আলোচিত তৃতীয় এক প্রকার অবধারণ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আমরা কিছু বলবো না। এগুলি হলো বিশুদ্ধ মূল্যায়নমূলক অবধারণ। কোনো কিছু ভালো না মন্দ, উৎকৃষ্ট না নিকৃষ্ট, সেটাই এই প্রকার অবধারণের বিষয়। এই অবধারণগুলিকে আমরা বলবো নির্ণায়ক অবধারণ বা 'verdicts'। মূল্যায়ন সম্বন্ধে আমরা এখানে আর কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করিনি; যেমন কীভাবে নির্ণায়ক অবধারণগুলি গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা আমরা যেসব অবধারণগুলি বিবেচনা করেছি তাতে কোনো মূল্যায়নমূলক তাৎপর্য আছে কি না ইত্যাদি।

আমরা আলোচ্য বিষয় হিসেবে যেসব অবধারণকে বিবেচনা করেছি তা হলো সর্বাধিক সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ নান্দনিক অবধারণ। এই অবধারণগুলি গঠন করার জন্য, প্রতিষ্ঠা করার জন্য ও ব্যাখ্যা করার জন্য সমালোচকের অধিক সময় অতিবাহিত হয়। আমরা প্রতিনিয়তই বিভিন্ন দৃশ্য, সূর্যাস্ত, পশুপাখি, মুখ ও মানুষ সম্বন্ধে এই রকম অবধারণ গঠন করি, যেখানে ভালো-মন্দ, যথার্থ-অযথার্থ নির্ণায়ক অবধারণ কদাচিৎ গঠন করা হয়ে থাকে। যেহেতু নন্দনতত্ত্বের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে নান্দনিক অবধারণের স্বরূপ এবং তার সপক্ষ যুক্তি, সেহেতু এগুলি বিচার-বিশ্লেষণযোগ্য। তবে, নির্ণায়ক অবধারণগুলি ও তাদের যুক্তিযুক্ততা প্রায়শই মনোযোগ আকর্ষণ করলেও, এগুলি প্রসঙ্গক্রমেই বিবেচিত হয়ে থাকে। কাজেই, নান্দনিক অবধারণ সম্বন্ধে এমন অনেক প্রশ্ন ওঠে যা নির্ণায়ক অবধারণ সম্বন্ধে ওঠে না এবং এই প্রশ্নগুলি খুব কম ক্ষেত্রেই স্পষ্টভাবে উত্থাপন করা হয়েছে। কাজেই, কীভাবে আমরা ওই অবধারণগুলি গঠন করবো এবং কীভাবেই বা সেগুলির যুক্তিযুক্ততা ও ব্যাখ্যা প্রদান করবো, তা আমাদের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। নান্দনিক গুণধর্ম ও প্রত্যয়গুলিকেও বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। এই কাজটি করার জন্য বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধ বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে, কারণ যদিও এটি স্পষ্ট যে, নান্দনিক ও অ-নান্দনিক ধর্ম ও অবধারণের মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে, কিন্তু এই সম্বন্ধের ওপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়নি।

নান্দনিক প্রত্যক্ষ

বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য আমরা এখানে নান্দনিক ও অনান্দনিক গুণধর্ম, প্রত্যয় ও অবধারণের সম্বন্ধসংক্রান্ত প্রশ্নকে নান্দনিক প্রত্যক্ষ ও অবধারণসংক্রান্ত প্রশ্ন থেকে পৃথক করবো। অর্থাৎ, অহেতুক বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা এড়ানোর জন্য এখানে আমরা নান্দনিক গুণধর্ম ও অ-নান্দনিক গুণধর্ম, নান্দনিক প্রত্যয় ও অ-নান্দনিক প্রত্যয়, নান্দনিক অবধারণ ও অ-নান্দনিক অবধারণ এবং নান্দনিক প্রত্যক্ষ ও অ-নান্দনিক প্রত্যক্ষের মধ্যে প্রথমেই বিভাজন রেখা অঙ্কন করে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হবো। এতে অহেতুক দ্ব্যর্থকতা থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

প্রথমেই লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে এক বিশেষ প্রকার প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ত। মানুষকে একটি কর্মের সামঞ্জস্য ও মাধুর্য দেখতে হয়, একটি গানের কোমল সুর বা উত্তাল ধ্বনি শুনতে হয়, একটি উপন্যাসের শক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি ও অনিশ্চয়তা অনুভব করতে হয়। তারা কোনো একসময় এই গুণাবলির দ্বারা অভিভূত হতে পারে, অনেকবার দেখা, শোনা ও

পড়ার পর সমালোচকের সাহায্য নিয়ে এগুলিকে প্রত্যক্ষ করতে হতে পারে। কিন্তু, যদি তারা সেগুলিকে এদের জন্যই প্রত্যক্ষ না করে, তাহলে নান্দনিক উপলব্ধি, উপভোগ ও অবধারণ তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে। কেবল অন্যের কাছে, বা বিশিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে, শিখে বা জেনে কোনো গানকে নির্মল কোমল, কোনো নাটককে গতিশীল ও একটি ছবিকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে উপলব্ধি করার কোনো নান্দনিক মূল্য নেই। গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি হলো দেখা, শোনা ও অনুভব করা। নান্দনিক প্রত্যক্ষ ছাড়াই কেউ কোনো সূত্র অনুসারে নান্দনিক অবধারণ গঠন করতে পারে বলে ধরে নেওয়া মানে নান্দনিক অবধারণের স্বরূপকে ভুল বোঝা।

কাজেই, এভাবেই আমরা 'নান্দনিক অবধারণ' পদটির প্রয়োগ করবো। যেখানে নান্দনিক প্রত্যক্ষের প্রশ্ন ওঠে না, সেখানে আমরা ভিন্ন কোনো বাক্যরীতি প্রয়োগ করবো, যেমন 'নান্দনিক গুণাবলির আরোপণ' অথবা 'নান্দনিক বিবৃতি'। কারণ, একজন বর্ণান্ধ ব্যক্তি না দেখেই অনুমান করতে পারেন যে কোনো কিছু সবুজ, কেউ কোনো হাস্যকর ঘটনা না দেখেই কোনো কিছুকে মজাদার বলতে পারেন অপরের হাসি দেখে, অনুরূপভাবে কেউ কোনো চিত্রকর্ম সম্বন্ধে নিজস্ব অবধারণ গঠন না করেই, চিত্রকর্মটিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রশান্তিময় অথবা বিবর্ণ বলে মন্তব্য করতে পারেন (Sibley, 2001b : 135-141)।

নির্ভরতার সম্বন্ধ

এখন নান্দনিক ও অ-নান্দনিক ধর্মের সম্বন্ধসংক্রান্ত বিবৃতির বিবেচনা করা যাক। এগুলি বিভিন্ন প্রকারের হয়। প্রথম দুই প্রকার সম্বন্ধ অত্যন্ত সাধারণ, যা গুণধর্মের প্রকারের মধ্যকার সম্বন্ধকে বিবৃত করে। কেবল উল্লেখ করা ছাড়া এগুলি সম্বন্ধে আমরা এখানে আর কিছুই বলবো না। আলোচনার বিষয় হিসেবে যে সম্বন্ধ বিষয়ক বিবৃতিগুলি আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো এমন একটি সম্বন্ধ যা নির্দিষ্ট কিছু গুণধর্মের মধ্যে খাটে। নিচে উল্লেখ্য (৩) ও (৪)-এর ক্ষেত্রে আমরা দুই প্রকার সম্বন্ধের বিবেচনা করেছি, যেগুলি বিশেষ কোনো দৃষ্টান্তে নির্দিষ্ট গুণাবলির মধ্যে প্রযোজ্য হয়। পরবর্তী সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদে বিভিন্ন প্রকার সাধারণ সম্বন্ধে বিবেচনা করেছি যা নির্দিষ্ট গুণধর্মের ক্ষেত্রে খাটে (Sibley, 2001a : 176-189)।

১. নান্দনিক গুণধর্ম তাদের অস্তিত্বের জন্য অ-নান্দনিক গুণধর্মের ওপর নির্ভরশীল। গুণাবলির সাদৃশ্য ছাড়া যেমন মুখমণ্ডলের সাদৃশ্য থাকার প্রশ্ন ওঠে না, মুখ ছাড়া যেমন হাসির প্রশ্ন ওঠে না, তেমনই অ-নান্দনিক গুণধর্ম ছাড়া নান্দনিক গুণধর্ম অস্তিত্বশীল হতে পারে না।

২. কোনো কিছুর অ-নান্দনিক গুণধর্মের দ্বারা ওই বস্তুর নান্দনিক গুণধর্ম নির্ধারিত হয়। কোনো কিছুর নান্দনিক বৈশিষ্ট্য তার অ-নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল এবং অ-নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের কোনোরূপ পরিবর্তনে নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও পরিবর্তন সাধিত হয়। নান্দনিক গুণধর্ম হলো উন্মেষমূলক ধর্ম। (১)-থেকে (২) প্রসক্ত হয় এবং দুটি সূত্রই সাধারণভাবে নান্দনিক গুণধর্মের স্বরূপসংক্রান্ত সূত্র।

৩. নান্দনিক গুণধর্ম অ-নান্দনিক গুণধর্মের ওপর নির্ভরশীল ও অ-নান্দনিক গুণধর্মের ফলাফল, এই সাধারণ দাবির সঙ্গে আমরা বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ সত্যের দাবি করতে পারি। যেমন : বলতে পারি যে, এই বস্তুর এই বিশেষ অ-নান্দনিক ধর্মটি বস্তুটির এই নান্দনিক ধর্ম প্রদান করে

থাকে, যথা মাধুর্য ও ভারসাম্য। যাইহোক এখানে দুটি সম্বন্ধ রয়েছে, যাদের মধ্যে পার্থক্য করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রথমত, কোনো কিছুর বিশেষ একটি নান্দনিক ধর্মকে বস্তুটির সমস্ত প্রাসঙ্গিক অ-নান্দনিক গুণধর্মের সমষ্টির ফলাফল বলা যেতে পারে। এটি সর্বদাই চিন্তনীয় যে, একটি ছবির রং ও রেখার, একটি গানের স্বরলিপির অথবা একটি কবিতার একটি শব্দের ন্যূনতম পরিবর্তনে তাদের নান্দনিক গুণাবলির পরিবর্তন ঘটতে পারে, অথবা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। ন্যূনতম ভিন্ন সমষ্টির কারণে নান্দনিক পার্থক্যের সূচনা হতে পারে। যে ধর্মকে কদাচিৎ কোনো বস্তুর নান্দনিক ধর্মের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়, যথা পটভূমির রং, সামান্যতম তুলির আঁচড় ইত্যাদি, সেটাও নান্দনিক ধর্মের পরিবর্তনের কারণ হতে পারে। কারণ ওই ধর্মের উপস্থিতিতে একটি বস্তুর নান্দনিক বৈশিষ্ট্য যেমন হয়, ওই ধর্মের অনুপস্থিতিতে তা পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। কেউ বলতে পারেন যে, সেটা হয়, যেহেতু একটি বস্তু যেমন হয় সেটাই তার সবকিছু। কাজেই, এই তৃতীয় সম্বন্ধটিকে কেউ যথাযথভাবেই *সর্বমোট নির্দিষ্ট নির্ভরতার সম্বন্ধ* বলে উল্লেখ করতে পারেন।

৪. এখন চতুর্থ সম্বন্ধটির বিবেচনা করা যাক। একজন সমালোচক খুব স্বাভাবিকভাবেই বলতে পারেন কেন একটি ছবি ভারসাম্যহীন হয়, একটি জটিল শিল্পকর্ম কীভাবে মাধুর্যপূর্ণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও কোমল হয়। কিন্তু তা বলার ক্ষেত্রে তিনি এই সাধারণ সত্যকে স্বীকার করতে প্রস্তুত নন যে, ওই শিল্পকর্মের অ-নান্দনিক বৈশিষ্ট্য তাকে ওইরূপে উপস্থাপন করেছে। এমনকি সাধারণভাবে তিনি উল্লেখ্য সম্বন্ধগুলিকেও বিবৃত করার চেষ্টা করছেন না; অর্থাৎ তিনি এ কথা বলার চেষ্টা করছেন না যে, এই সমস্ত রং রেখার সমষ্টি তা ওইরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি সাধারণত আরও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যায় আগ্রহী। তিনি নির্দিষ্ট কিছু অনন্য ও সূক্ষ্ম গুণধর্ম নির্বাচন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি উল্লেখ করতে পারেন যে, নান্দনিক বৈশিষ্ট্য রং থেকে নয়, একটি সংগঠন থেকে উৎপন্ন হয়, নোটগুলির ঐক্যতান থেকে নয়, বরং এ-গুলির পরিবর্তন থেকে। সংক্ষেপে, সমালোচক একটি শিল্পকর্ম থেকে এমন কিছু গুণধর্মকে নির্বাচন করার চেষ্টা করছেন, যা লক্ষণীয়ভাবে ও বিশেষভাবে ওই শিল্পকর্মের জন্য দায়ী। কারণ, একটি শিল্পকর্মের এমন কিছু ধর্ম আছে যা তাদের সর্বাধিক অসামান্য অবদানের জন্য আমরা অভিভূত হই; এই সমস্ত ধর্মের ন্যূনতম পরিবর্তনে একটি শিল্পকর্মের নান্দনিক চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে পারে। কাজেই, এই চতুর্থ সম্বন্ধকে *লক্ষণীয় নির্দিষ্ট নির্ভরতার সম্বন্ধ* বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। এইরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট বিবৃতির ক্ষেত্রেই সর্বাধিক আপত্তি উত্থাপন করা হয়ে থাকে।

কাজেই, কেউ কোনো স্ববিরোধিতা না করেই বলতে পারেন যে, কোনো বস্তুর সমস্ত ধর্ম একত্রে তার নান্দনিক ধর্মের জন্য দায়ী এবং একটি বিশেষ ধর্ম তার নান্দনিক ধর্মের জন্য দায়ী। সাধারণত এই দ্বিতীয় প্রকার মন্তব্যে আমাদের আগ্রহ; কিন্তু তা হলেও এটি মনে করা উচিত হবে না যে, অন্যান্য মন্তব্যগুলি সর্বদাই স্বতঃসিদ্ধ, তুচ্ছ বা অর্থহীন। যখন আমরা কোনো বস্তুর নির্দিষ্ট একটি ধর্মকে লক্ষণীয়ভাবে দায়ী হিসেবে শনাক্ত করি, যে ধর্ম আমাদের উদ্দীপিত করে, তখন এটি উল্লেখ করা কারও কাছে অর্থপূর্ণ হতে পারে যে, এই বিশেষভাবে লক্ষণীয় ধর্মটি তার কার্যকারিতা অর্জন করেছে কেবল অন্যান্য উপাদানের কারণে, যা নিজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। এই ধরনের মন্তব্য কোনো সময় বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হতে

পারে, যেহেতু কিছু শিল্পকর্ম এমনভাবে গঠিত যে ন্যূনতম পরিবর্তনে তার সমস্ত কার্যকারিতা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। একজন সমালোচক মন্তব্য করেন যে, যা কিছু এই শিল্পকর্মের স্বরূপের জন্য দায়ী তাদের সবগুলি একত্রে মিলে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলতে পারে যে, এখানে ওই ধরনের একটি শিল্পকর্ম আছে। সম্ভাব্য যা কিছু প্রাসঙ্গিক হতে পারে তা নিরীক্ষণ করলে তাকে এতই যথার্থ বলে মনে হবে যে, সেটি ওই শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে একটি মুখ্য ভূমিকা নির্বাহ করে (Burke, 1958:167)।

আমরা এই পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছি 'নির্ভরতার সম্বন্ধ' এই বিষয়ে জোর দেওয়ার জন্য যে, প্রত্যক্ষমূলক নান্দনিক গুণধর্ম হলো নির্ভরশীল ও উন্মেষমূলক ধর্ম। অন্যান্য গুণধর্মের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। কাজেই, এই ধর্মগুলি স্পষ্টতই লাল ও সবুজ ইত্যাদি প্রত্যক্ষমূলক অন্যান্য ধর্মের বিপরীত, যারা তাদের অস্তিত্বের জন্য বস্তুর অপরাপর প্রত্যক্ষমূলক গুণধর্মের ওপর নির্ভরশীল নয়।

বিচারমূলক কর্মকাণ্ড

আমরা এই মাত্র যে সম্বন্ধটির বর্ণনা করলাম, তা বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপলব্ধি নিরপেক্ষভাবে গুণধর্মের মধ্যে খাটে। নির্দিষ্ট একটি আকৃতি রাখার কারণে একটি ছবির লক্ষণীয় ভারসাম্যের অভাব কেউ দেখুক বা না দেখুক, কোনোভাবেই তা এই ব্যাপারটির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয় যে, ওই আকৃতির জন্য ছবিটি ভারসাম্যহীন হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ সম্বন্ধটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে, আমরা সমালোচকের প্রধান একটি কর্মকাণ্ডের উল্লেখ এড়িয়ে যেতে পারি না; তা হলো ব্যাখ্যা। এক্ষেত্রে দেখানো হয় যে, যা কিছু লক্ষণীয়ভাবে দায়ী তাকে বিচ্ছিন্ন করে এবং শনাক্ত করে একটি শিল্পকর্ম কীভাবে তার নান্দনিক অবস্থা অর্জন করে। এমনকি যখন আমরা কোনো কিছুর মাধুর্য, ঐক্য ও কদর্যতাকে অবলোকন করি, হতে পারে তখনও আমরা বলতে সক্ষম নই যে কেন বস্তুটির ওই সমস্ত গুণাবলি থাকে। কিন্তু, একজন অভিজ্ঞ সমালোচক সে কথা বলতে সক্ষম হবেন। এই ব্যাখ্যা বস্তুর নান্দনিক গুণধর্ম সম্বন্ধে আমাদের একটি আগ্রহ ও কৌতূহল নিবারণে সাহায্য করে। কিন্তু তা এর চেয়েও বেশি কিছু করে। যখন আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখি কীভাবে ও কেন একটি কর্ম ওই গুণধর্মের অধিকারী হয়, তখন আমরা আমাদের প্রাথমিক অবধারণের সবলতা লক্ষ করি এবং একে আরও জোরালোভাবে বিশ্বাস করি। তাছাড়া, যখন আমরা উপলব্ধি করি যে, কত স্পষ্টভাবে ও সূক্ষ্মভাবে, কোন ধরনের দক্ষতা, উপাদান ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে সেটি ওই ধর্ম অর্জন করেছে, কত সযত্নে প্রত্যেকটি বিবরণের বিচার করা হয়েছে, তখন আমাদের উপলব্ধি আরও গভীর, সমৃদ্ধশালী ও বুদ্ধিগম্য হয়ে ওঠে।

এই ধরনের ব্যাখ্যায় বস্তুর অ-নান্দনিক গুণধর্মের উল্লেখ করা হয়ে থাকে (যেমন, রং, রেখা, গঠন ইত্যাদি)। এমনকি এক্ষেত্রে নান্দনিক গুণধর্মেরও উল্লেখ থাকে। কিন্তু, উভয় ক্ষেত্রে আমরা নিরপেক্ষ সম্বন্ধের আলোচনা থেকে পেছন দিকে নান্দনিক সংবেদনশীলতা ও অবধারণ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের দিকে ফিরে গেছি। কারণ, যে সমালোচক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং যিনি তার ব্যাখ্যা অনুসরণ করেছেন উভয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি লক্ষ করার জন্য ওই সংবেদনশীলতার প্রয়োজন যে, ওই সমস্ত আকৃতি ও রং ছবিটিকে ভারসাম্যহীন করে তুলেছে অথবা এই শব্দক্রমটি কবিতাটিকে গতিশীল করে তুলেছে। এই প্রয়োজন কোনো অংশেই প্রাথমিকভাবে শিল্পকর্মটিতে নান্দনিক গুণাবলি পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজনের চেয়ে কম নয়। অনুরূপভাবে, একটি ছবির অন্তর্গত কোনো

একটি মূর্তি একেবারে বাম দিকে রয়েছে তা অবলোকন করার ক্ষেত্রে যদিও নান্দনিক সংবেদনশীলতা থাকে না, কিন্তু একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামো গঠন করার পক্ষে মূর্তিটির অবস্থান যে অত্যন্ত বাম দিকে রয়েছে তা দেখার ক্ষেত্রে নান্দনিক সংবেদনশীলতা থাকে। একটি শিল্পকর্মের নান্দনিক গুণধর্ম কেন থাকে তার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য নান্দনিক প্রভেদের প্রয়োজন, এমনকি যেখানে যুক্তি হিসেবে কেবল অ-নান্দনিক ধর্মের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও।

২. আমরা এখন যে দ্বিতীয় কর্মকাণ্ডটির উল্লেখ করবো, তা কারও দ্বারা প্রত্যক্ষিত নান্দনিক গুণধর্মের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অনেক কম সীমিত। একটি বস্তুর নান্দনিক ধর্ম যে রয়েছে তা এর জন্যই একে দেখতে ও অবধারণ করতে এই কর্মকাণ্ড সাহায্য করে। আমরা শুরুতেই উল্লেখ করেছি যে, নান্দনিক প্রত্যক্ষ যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু সমালোচকের প্রধান কাজ হলো লোককে এটাই দেখানো যে বস্তু স্বরূপত নান্দনিকভাবে যেমন হয় এবং কেন ওইরূপ হয়। (কিন্তু এটি অন্যান্য কর্মকাণ্ডকে বর্জন করে না, যেমন পুনর্ভাষ্য দেওয়া, লোককে নতুন ও ভিন্ন গুণধর্ম দেখতে সাহায্য করা ইত্যাদি)। সমসাময়িক দার্শনিকেরা যথাযথভাবেই এই কর্মকাণ্ডের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একজন সমালোচক সফল হবেন যদি তার পর্যবেক্ষণ বস্তুর নান্দনিক ধর্ম না দেখেই শুরু করেন এবং কেবল এর জন্যই একে দেখে শেষ করেন। কোনো কোনো সময় যখন একজন সমালোচক নান্দনিক গুণধর্মকে দেখতে আমাদের সাহায্য করেন, তখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও দামি অ-নান্দনিক গুণধর্মকে লক্ষ না করে, অথবা সেগুলির সম্বন্ধকে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে, আমরা তাঁদের ভুল বুঝি। যে গুণধর্মের কারণে একটি নৃত্য মাধুর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, তা অন্তত অল্পবিস্তর লক্ষ না করে কেউ ওই নৃত্যের মাধুর্যকে দেখার প্রত্যাশা করতে পারে না। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে তা লক্ষ করা গেলেও, প্রত্যাশিত নান্দনিক ধর্মটি লক্ষ্যের বাইরে থেকে গেছে। অনুরূপভাবে, খুঁটিয়ে দেখার পরও একটি চিত্র-ধাঁধার গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক কেউ লক্ষ করতে ব্যর্থ হতে পারে; হয়তো বা সে ছবিটিতে একজনের মুখ দেখেছে, কিন্তু সেই মুখের ক্লান্তিভাব লক্ষ করেনি; অথবা দুজনের মুখ দেখেছে, কিন্তু মুখ দুটির সাদৃশ্য লক্ষ করতে সক্ষম হয়নি।

যেসব গুণধর্মকে লক্ষ করতে লোকেরা ব্যর্থ হয়েছে তা লোককে দেখানোর জন্য সমালোচকেরা যা বলেছেন ও করেছেন, তা লেখকদের প্রহেলিকার মধ্যে ফেলেছে। কিন্তু রহস্যপূর্ণ করে তোলার সপক্ষে কোনো যথার্থ কারণ নেই। একটি ছবির সামনে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর অথবা একটি গান বারবার শোনার পর, আমরা কেবল নিজের সাহায্যে যেভাবে একটি গুণধর্মকে প্রত্যক্ষ করি, যা আমরা পূর্বে কখনও দেখিনি, সেটা কাউকে প্রহেলিকার মধ্যে ফেলতে পারে (Holloway, 1949:169–184)। এখানে মূলত যা প্রয়োজন তা হল, সমালোচক কোনো কিছু সম্বন্ধে যা বলেছেন ও করেছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। কারণ কোনো কিছু যদি করা হয়, তাহলে সেটাই অনুবর্তী হবে।

এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান জিনিসটি হলো সেই ধর্মের ওপর মনোযোগ আকর্ষণ করা যা লক্ষণীয়ভাবে এমন একটি কার্যফলের জন্য দায়ী যা সমালোচক তাঁর পর্যবেক্ষণে দেখাতে চান। কিন্তু সাফল্য আনতে পারার মতো এটাই একমাত্র জিনিস নয়। সমালোচক উপমা খুঁজতে পারেন, তুলনা করতে পারেন, যথাযথ রূপকের সাহায্যে শিল্পকর্মের বর্ণনা করতে পারেন, সুসংগত অঙ্গাভঙ্গি করতে পারেন ইত্যাদি। তিনি শাব্দিক বা অ-শাব্দিক যা কিছু করতে পারেন তার অধিকাংশই কোনো ক্ষেত্রে সফল হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। কীভাবে এই পদ্ধতি সফল হতে পারে তা জিজ্ঞাসা করা মানে কীভাবে লোকেরা

নান্দনিক ধর্মকে দেখার জন্য আকৃষ্ট হতে পারে তার অনুসন্ধান শুরু করা। যদি তাঁরা তা পারেন, তাহলে সেটি এর চেয়ে বেশি বা কম কিছু হবে না যে, বিভিন্ন উপায়ে মানুষ অন্যান্য জিনিস করার জন্য এগিয়ে আসতে পারে, যেমন বিভিন্ন রঙের মধ্যে পার্থক্য করা, মুখের মিল লক্ষ করা বা তুলনা করা প্রভৃতি। আমরা এই কাজগুলি করি; এবং সমালোচক যা করতে পারেন বা বলতে পারেন, তা হলো সেই ধরনের জিনিস যা আমাদের আলোচনায় উল্লেখ্য কোনো একটি কাজ করতে সাহায্য করে (Hoffman, 1961 : 308–322)।

এই কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল, এটি নান্দনিক অবধারণের ন্যায্যতা বা যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করার উপায় হয় কি না। কোনো কোনো নন্দনতাত্ত্বিক মনে করেন যে, এটাই হলো একটি নান্দনিক অবধারণের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করার একমাত্র উপায় এবং এটাই হলো বিচারমূলক কর্মকাণ্ডের একমাত্র দিক। এই দাবি অনেক কিছুকেই এড়িয়ে যায়, কিন্তু কেন একে একটি নান্দনিক অবধারণের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করার বা প্রমাণ করার উপায় বলা যাবে না তার সপক্ষে কোনো যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। যদি আমরা বলি আপেল টক এবং যদি কেউ আমার কথায় সংশয় প্রকাশ করে, তাহলে আমরা তাকে আপেল খেয়ে দেখতে বলতে পারি। আরও জটিল ও সূক্ষ্ম কোনো কিছু দিয়ে আমরা তাকে যথাযথভাবে সাহায্য করতে পারি। যদি আমরা বলি যে, কোনো একটি আকৃতি সিঁড়ি হিসেবে অথবা কার্নিশ হিসেবে দৃষ্ট হতে পারে, একটি মেঘের টুকরো জিরাফের মতো দেখতে, দুজন মানুষ দেখতে কিছুটা একই রকম, ব্র্যান্ডি হলো নরম ও মখমলে, এবং যদি সে আমার কথায় প্রশ্ন তোলে, তাহলে তাকে কেবল দেখার জন্য বা পান করতে বলার জন্য আমন্ত্রণ জানানোই কি যথেষ্ট নয়?

ওই জিনিসগুলির দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করার প্রয়োজন পড়তে পারে, তাই আমরা তাকে নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলি দেখার বা পান করার প্রস্তাব করতে পারি। এটি কেবল একটি গান বারবার শোনার মতো নয় অথবা কোনো ছবিকে ভালো আলোতে তুলে ধরা নয়; আমরা নির্দেশ দিতে পারি, তাকে দূরে সরে যাওয়ার কথা বলতে পারি, নির্দিষ্ট কিছু গুণাবলির দিকে মনোযোগ দিতে বলতে পারি, এক সঙ্গে সমগ্র বস্তুটির দিকে তাকাতে বলতে পারি; আমরা একে অন্য কোনো জিনিসের সঙ্গে তুলনা করতে পারি, রূপকের সাহায্যে বর্ণনা করতে পারি, ইত্যাদি অনেক কিছু। যদি সে আমার সঙ্গে সহমত পোষণ করে, তাহলে আমি আমার দাবির ন্যায্যতা সম্ভাব্য সবচেয়ে ভালো কোনো উপায়ে প্রতিপাদন করেছি। আমি আমার প্রকৃত অবধারণের যুক্তিযুক্ততা বা ন্যায্যতা প্রমাণ করিনি এ কথা বলার সপক্ষে কোনো যুক্তি নেই। সুতরাং, এই কর্মকাণ্ডকে কেউ *প্রত্যক্ষমূলক প্রমাণ* হিসেবে নির্দেশ করতে পারে। আমরা যে ব্যাখ্যামূলক কর্মকাণ্ডের উল্লেখ পূর্বে করেছি তার সঙ্গে এই কর্মকাণ্ডকে গুলিয়ে ফেলার কোনো কারণ নেই। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে নান্দনিক কার্যফলের জন্য দায়ী গুণধর্মের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করার প্রক্রিয়াটি রয়েছে। কিন্তু তাদের লক্ষ্য ভিন্ন একটি বস্তুর নান্দনিক গুণধর্মের দিকে আরও দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য উপমা, তুলনা, পুনরাবৃত্তি, অঙ্গাভঙ্গি ইত্যাদি যেকোনো উপায়ের দ্বারা সবচেয়ে বেশি যা করা ও বলা যায়, তাকে এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা বলা যায় না যে, কেন বস্তুটির ওই সমস্ত গুণাবলি আছে।

অধিকন্তু, যদি আমরা একটি নান্দনিক অবধারণের ওইরূপ যুক্তিযুক্ততাকে বেছে নিই, তাহলে আমাদের অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে যে, সেটি কোন ধরনের যুক্তিযুক্ততা ও কোন ধরনের নয়। যেখানে একজন ব্যক্তি একটি অবধারণের সমর্থনে বৌদ্ধিক উপায় বা যুক্তিপ্রক্রিয়ার দ্বারা অন্যকে

সহমত পোষণের চেষ্টা করছেন, সেখানে তিনি এমন কিছু বিবৃতির প্রস্তাব করছেন, যা সত্য হলে, এটি ধরে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে যে, তার অবধারণটি ছিল সঠিক। যে ব্যক্তির কাছে যুক্তিগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে, তিনি তা বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত করতে পারেন যে, বিচার্য অবধারণটি সঠিক। বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য তার কাছে কিছু যুক্তির উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বিচার্য অবধারণটি গ্রহণ করে তা শেষ হয়েছে। কিন্তু, একে সমালোচকের সেই কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য ও ফলাফল কোনোটাই বলা যায় না। সেই কর্মকাণ্ডকে আমরা বর্ণনা করেছি এমন একটি যুক্তি উপস্থাপন করার জন্য যার ভিত্তিতে সমালোচকের পর্যবেক্ষণ যুক্তিসংগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, তার অবধারণটি ছিল সঠিক।

এমনকি শিল্পকর্মটির অনুপস্থিতিতে তিনি তা জানতে পারেন কতজন বিশ্বাসযোগ্য ও বিশিষ্ট সমালোচক স্বতন্ত্রভাবে ওই একই অবধারণ গঠন করেছিল সে কথা বলে। সমালোচকের লক্ষ্য ছিল তাঁর পর্যবেক্ষকদের তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণে উদ্দীপিত করা, কারণ তারা যা প্রত্যক্ষ করেছেন সেগুলির জন্যই তা প্রত্যক্ষ করেছেন; এবং যদি তা সফল হয়, তাহলে এটাই সেই জিনিস যা তিনি অর্জন করেছেন। কিন্তু, যে কর্মকাণ্ডের সফল ফলাফল হলো দেখা বা শোনা, তা কখনও যুক্তি হতে পারে না। কোনো কিছুকে মাধুর্যপূর্ণ বলে মনে করার সপক্ষে আমাদের যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু এই যুক্তি বস্তুটি যেমন হয় তাকে দেখার যুক্তি নয়। তবে, আমরা বলেছি, নান্দনিক প্রত্যক্ষের জন্য নান্দনিক অবধারণ অপরিহার্য। সুতরাং, কেউ কোনো নান্দনিক অবধারণকে নিছক যুক্তি বিবেচনার ফলাফল হিসেবে গঠন করতে পারে না, তাতে যুক্তিটি যতই ভালো হোক না কেন। এটি একটি বিজাতীয় কর্মকাণ্ডের বিভ্রান্তি এটি ধরে নেওয়ার জন্য যে, ওই অর্থে একটি নান্দনিক অবধারণ গঠনের জন্য কারও কাছে 'বৌদ্ধিক যুক্তিযুক্ততা' থাকতে পারে। কাজেই, আমাদের আলোচ্য নান্দনিক অবধারণের বৌদ্ধিক ভিত্তি উপস্থিত ও অনুপস্থিত কোনোটাই থাকে না যেহেতু তা ভালো ও মন্দ যুক্তির ফলাফল হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেভাবে প্রত্যক্ষ সমর্থিত হয় অথবা আদৌ তা হয় না।

যুক্তি প্রদর্শন

'প্রত্যক্ষমূলক প্রমাণ' যুক্তি দেওয়ার বিষয় না হলেও এবং নান্দনিক অবধারণের পক্ষে যুক্তি বিবেচনার ফলাফল হওয়াটা অসম্ভব হলেও, একটি প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে যে, আমাদের আলোচ্য নান্দনিক অবধারণ অন্য কোনো উপায়ে যুক্তির দ্বারা সমর্থিত বা যুক্তিযুক্ত হতে পারে কি না। অনেক লেখক দাবি করেন যে, বিশেষ এক ধরনের বৌদ্ধিক যুক্তিযুক্ততা অবশ্যই সম্ভব। সাম্প্রতিক সময়ের একজন লেখক বলেন, 'সমালোচনা যদি আদৌ একটি নির্ভরযোগ্য কর্মকাণ্ড হয়, এবং যদি এ কথা বলা সঠিক হয় যে সমালোচক তার অবধারণের সপক্ষে যুক্তি দিয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের পক্ষে কোনো যুক্তিকে একটি যুক্তি হিসেবে দেখা অবশ্যই সম্ভব। ... যে যুক্তিযুক্ততার প্রস্তাব করা হয়েছে তাকে যুক্তিযুক্ততা হিসেবে দেখার উপায়টি অবশ্যই একটি সমালোচনার পর্যাপ্ত ব্যাখ্যায় উপস্থিত থাকা উচিত' (Schwyzer, 1963:70–79)।

নিম্নলিখিত প্রশ্নটি বিবেচনা করা যাক। ধরা যাক কেউ একটি নান্দনিক অবধারণ গঠন করলো যে কোনো কিছু মাধুর্যপূর্ণ। এখন প্রশ্ন হলো : বস্তুটিকে ওইরূপ দেখানোর জন্য সে আমাকে সাহায্য করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করুক বা না করুক, এমনকি যদি আমি ওই বস্তুটি আদৌ কখনও না দেখে থাকি তাহলে, একটি যুক্তির উপস্থাপন করে আমার পক্ষে কি তার দাবির সত্যতাকে সমর্থন করা

সম্ভব এবং এই কারণে কি আমার পক্ষে তার অবধারণের জন্য যৌক্তিক সমর্থন প্রদান করা সম্ভব? এই বৃহৎ প্রশ্নের উত্তরে সে সমস্ত প্রকার সমর্থন প্রদানকারী যুক্তির উপস্থাপন করতে পারে। যেমন, 'আমার অবধারণ সঠিক হতে পারে, কারণ আমি ওই বিষয়ে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য' অথবা 'অনেক সমালোচক স্বতন্ত্রভাবে সেই রকমই ভাবেন' ইত্যাদি। যে প্রশ্নটি আমরা উত্থাপন করতে চাইছি তা অনেকটা সংকীর্ণ।

প্রশ্নটি হলো : একটি বস্তুর অ-নান্দনিক গুণধর্ম সম্বন্ধে যেকোনো বিবৃতি, অর্থাৎ নান্দনিক সংবেদনশীলতার প্রয়োজন নেই এমন অবধারণ, এমনভাবে গঠন করা যায় কি না, যেক্ষেত্রে যদি কেউ ওই বস্তুটি নাও দেখে থাকে এবং বস্তুটির গুণাবলি নাও উপলব্ধি করে থাকে, তাহলেও তাকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, যদি ওই বিবৃতি সত্য হয়, তাহলে ওই বস্তু সম্বন্ধে সমালোচক যা দাবি করেছেন, বস্তুটি অনিবার্যভাবে বা সম্ভাব্যরূপে ঠিক তেমনই হবে। কোনো একটি বস্তুর অ-নান্দনিক ধর্মসংক্রান্ত যেকোনো বিবৃতি কি এই সিদ্ধান্তের যুক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে যে, বস্তুটির নির্দিষ্ট একটি নান্দনিক ধর্ম আছে? যদি তা হতো, তাহলে এই যুক্তির ভিত্তিতে কাউকে বস্তুটির মাধুর্য দেখানো সম্ভব হতো না; তাই বস্তুটি সম্বন্ধে কোনো নান্দনিক অবধারণও কেউ গঠন করতো না। এটি কেবল এই রকম হতো যে, সে বস্তুটির ওপর নির্দিষ্ট কিছু নান্দনিক ধর্ম আরোপ করতে পারতো কিছু যুক্তিযুক্ততা সহ। প্রস্তাব করা যায় যে, যদিও ওইরূপ যুক্তিযুক্ততা সম্ভব, কিন্তু বাস্তবত তা হতো তাৎপর্যপূর্ণহীন ও নান্দনিকভাবে মূল্যহীন। কিন্তু, ওইরূপ যুক্তিযুক্ততা সম্ভব হতো কি না তার অনুসন্ধান নন্দনতত্ত্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই অনুসন্ধানের বিষয়টি এই প্রবন্ধের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আমরা কিছুক্ষণের জন্য একে পরে আলোচনা করবো। কারণ, এমনকি যদি নান্দনিক অবধারণের সমর্থনে ওই ধরনের যুক্তিযুক্ততা সম্ভবও হয়, তাহলেও তা এই সাধারণ দাবির ব্যাখ্যা হতো না যে, সমালোচকের অবধারণের সমর্থনে তাঁর যুক্তি থাকা উচিত। যারা এই দাবি করেন তারা বলতে চান যে, কোনো এক অর্থে, একজন সমালোচক একটি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য অবধারণ গঠন করবেন কেবল যদি ওই অবধারণের সপক্ষে তাঁর যুক্তি থাকে, অর্থাৎ যদি তার ওই সমস্ত যুক্তি থাকতো তাহলে তিনি ওইরূপ অবধারণ গঠন করে থাকতেন। সুতরাং, এটি এমন একটি যুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত যা সমালোচকের অবধারণের ভিত্তি। কিন্তু, আগের অনুচ্ছেদে আমরা যে কর্মকাণ্ডের রূপরেখা প্রস্তাব করেছি তা হতো অত্যন্ত ভিন্ন। এটি একটি যুক্তিযুক্ত মতামত দেওয়ার এবং বস্তুটির সম্মুখীন হয়ে সমালোচক যে অবধারণ গঠন করেছেন তাকে যুক্তির দ্বারা সমর্থিত করার সাহায্যকারী কর্মকাণ্ড হতো। কীভাবে এবং কোন অর্থে একটি অবধারণ যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যদি অবধারণ কোনো যুক্তির ফলাফল না হতে পারে? সম্ভবত, এটি 'যুক্তি' শব্দটির দুটি প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য করার বিষয়।

অ-নান্দনিক গুণধর্মের ভূমিকা

পূর্বে চারটি সম্বন্ধ আলোচনার ক্ষেত্রে, আমরা দেখেছি যে, এমন কিছু অ-নান্দনিক গুণধর্ম অবশ্যই রয়েছে, যা কোনো নান্দনিক গুণধর্মের জন্য দায়ী। ভিন্নভাবে বললে, বস্তুর কেন ওইরূপ গুণধর্ম থাকে, তার জন্য সর্বদাই একটি যুক্তি থাকবে। আমরা এটাও দেখেছি যে, কেন একটি শিল্পকর্ম মাধুর্যপূর্ণ বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তার অনুসন্ধানে সমালোচকেরা নিজেকে অধিকাংশ সময় নিয়োজিত রাখেন; যারা বস্তুটিকে মাধুর্যপূর্ণ দেখেছেন, তারা অন্তত কিছু মাত্রায় ওই দায়ী গুণধর্মগুলিকে লক্ষ করেছেন। একজন ভালো সমালোচক ওই যুক্তিগুলিকে দেখাতে

অবশ্যই সক্ষম হবেন। কিন্তু, এগুলি হলো কেন একটি শিল্পকর্ম মাধুর্যপূর্ণ হয় তার যুক্তি এবং এগুলিকে সেই যুক্তি থেকে আলাদা করা প্রয়োজন, যার ভিত্তিতে কেউ অনুমান করেন যে শিল্পকর্মটি মাধুর্যপূর্ণ।

যদি একটি শিল্পকর্ম মাধুর্যপূর্ণ হয়, তাহলে তার একটি যুক্তি থাকবে কেন তা ওই রকম হয়, তাতে কেউ তা জানুক বা না জানুক, চিন্তা করুক বা না করুক অথবা ওই চিন্তার সমর্থনে তার কোনো যুক্তি থাক বা না থাক। সমুদ্র তীরভূমিতে কোনো নুড়িকণা লক্ষ না করার যুক্তি একজনের থেকে অন্যজনের আলাদা হতে পারে, যেমন হতে পারে যে, একজনের ক্ষেত্রে নুড়িকণাটি ছিল সমতল, অন্যজনের ক্ষেত্রে তা ছিল বাঁকানো। এই যুক্তি সম্বন্ধে কোনো বিবৃতি হলো এমন একটি বিবৃতি যেখানে বলা হয় যে বস্তু বাস্তবত যেমন হয়ে থাকে তা তেমনই হয়। একজন ব্যক্তি লক্ষ করতে পারেন যে কোনো কিছু মাধুর্যপূর্ণ, অথবা দুটি নুড়িকণা একে অপরের সঙ্গে খাপ খায় না; কিন্তু কেন তা হয় তা না জেনেই, কোনো যুক্তি ছাড়াই তিনি তা লক্ষ করতে পারেন। কিন্তু, 'যুক্তি' শব্দটি দিয়ে সর্বদাই সত্য বিবৃতিকে বোঝানো হয়, যার জ্ঞানের ভিত্তিতে যুক্তিসংগতভাবে কোনো কিছু সম্বন্ধে কোনো কিছুকে অনুমান করা হয়ে থাকে।

এই অর্থে কোনো যুক্তিকে নান্দনিক অবধারণের ভিত্তি বলা যে অদ্ভুত তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। একটি নির্ভরযোগ্য বিচারমূলক অবধারণ যে অর্থে যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং যে অর্থে একজন সমালোচক তার অবধারণের সপক্ষে যুক্তি দিতে পারেন, তা 'যুক্তি' শব্দটির অপর একটি প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল। তার অবধারণের সপক্ষে যুক্তি থাকার জন্য তাকে অবশ্যই সযত্নে মনোযোগ দিতে হবে যখন তিনি একটি শিল্পকর্ম দেখছেন, শুনছেন বা পড়ছেন, অর্থাৎ তিনি অবশ্যই কিছু পরিমাণে শিল্পকর্মটির সেই সমস্ত গুণধর্মকে লক্ষ করবেন যা তাকে গতিশীল, মাধুর্যপূর্ণ বা ভারসাম্যহীন করে তুলেছে, এবং তার অবধারণকে অবশ্যই এর ফলাফল জনিত হতে হবে। তাছাড়া, যদি তিনি প্রশ্নের মুখে পড়েন কেন তিনি ওইরূপ মনে করেছেন, তাহলে তিনি ওই সমস্ত গুণধর্ম তুলে ধরতে সক্ষম হবেন এবং তার কিছু বাস্তব বিবরণসহ উত্তর দিতে সক্ষম হবেন। কাজেই, সাধারণভাবে, আমরা মনে করি যে, দুটি জিনিসের মধ্যে প্রায়শই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে। লোকেরা দাবি করে যে, অবরোহী অর্থে সমর্থনপ্রদানকারী যুক্তির ভিত্তিতে নান্দনিক অবধারণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত; কিন্তু তারা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে দাবি করেন যে, কেন বস্তুটি মাধুর্যপূর্ণ অথবা তা নয়, তা উপলব্ধি করে সমালোচককে বলতে সক্ষম হতে হবে যে কেন বস্তুটি সেই রকম।

উক্ত দুটি বিষয়ের পার্থক্যটি মনে রাখলে তাতে বিভ্রান্তি হওয়ার কথা নয়। অন্য একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। 'এই প্যাকেটের তাস সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণ হলো চিড়িতনের টেক্কাটি এতে নেই', 'তার ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো তুমি তার অনুরোধ রাখোনি', 'শব্দটি গুরুগম্ভীর শোনাচ্ছে কারণ এর স্বর অত্যন্ত দীর্ঘ'। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একটি যুক্তি দেখানো হয়েছে যে সেটি সেই রকম হয়েছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কেউ হয়তো কোনো হেতু বা যুক্তিকে না জেনেই, অথবা কেন তা সেই রকমটি হয় তা বলতে সক্ষম না হয়েই, লক্ষ করেছে বা জেনেছে যে সেটি সেই রকমই হয়। অপরদিকে, কেউ অপর একটি ব্যাপারকে প্রথমে ও নিরপেক্ষভাবে জানতে বা লক্ষ করতে পারে যে চিড়িতনের টেক্কাটি নেই, তুমি তার অনুরোধ অস্বীকার করেছো। কাজেই, এই ব্যাপারগুলি বা যুক্তিগুলির ভিত্তিতে, কেউ অনুমান করতে পারেন যে, প্যাকটেটি অসম্পূর্ণ, সে সম্ভবত ক্রুদ্ধ ইত্যাদি। এই দুটি কর্মকাণ্ডের পার্থক্যকে একাকার করে দেওয়া

কারও পক্ষে কঠিন হতে পারে; কিন্তু আমরা মনে করি যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোকেরা তা করে, কারণ একই শব্দের দ্বারা কেন একটি বস্তু সেই রকম হয় তার হেতু বা যুক্তি যেমন প্রকাশিত হতে পারে, তেমনই সেটা যে সেই রকম হয় তা চিন্তা করা বা সিদ্ধান্ত করার কার্যকরী পর্যাপ্ত হেতু বা যুক্তিকেও প্রকাশ করতে পারে।

কাজেই, একটি প্যাকেট অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণ যদি এই হয় তাতে কেবল তিনটি টেক্কা রয়েছে, তাহলে অবশ্যই এটি সত্য হবে যে, যদি কেউ জানে প্যাকেটটিতে কেবল তিনটি টেক্কা আছে, তাহলে তার কাছে কার্যকরী হেতু বা যুক্তি থাকবে এই দাবির সপক্ষে যে প্যাকেটটি অসম্পূর্ণ। অনুরূপভাবে যদি তার ক্রুদ্ধ হওয়ার হেতু এই হয় যে, তুমি তার অনুরোধ অস্বীকার করছো, তাহলে এটি অবশ্যই সত্য হতে পারে যে, যদি আমি জানি যে তুমি তার অনুরোধ অস্বীকার করেছো, তাহলে আমার কাছে ভালো যুক্তি থাকতে পারে এটি মনে করার সপক্ষে যে সে ক্রুদ্ধ হয়েছে, যদিও এই সময়টি কার্যকরী নয়।

কিন্তু, যদিও এক ও অভিন্ন বাক্যরীতির দ্বারা কেন কোনো কিছু সেই রকম হয় তার যুক্তি যেমন কখনও প্রকাশিত হতে পারে, তেমনই সেটি যে সেই রকমই হয় তা বিশ্বাস করার ভালো যুক্তিও কখনও প্রকাশিত হতে পারে, কিন্তু সর্বদাই এই কথা সত্য নয়। একটি গান করুণ মনে হওয়ার সত্যিকারের কারণ হতে পারে যে, গানটি খুব মন্থর গতিতে কোমল সুরে গাওয়া হচ্ছে। একজন মানুষের মুখ দেখে বিষণ্ন মনে হওয়ার কারণ হতে পারে যে, তিনি গালে হাত দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। কিন্তু, গানটি যে খুব মন্থর গতিতে কোমল সুরে গাওয়া হচ্ছে তার জ্ঞানকে, তিনি যে গালে হাত দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন তার জ্ঞানকে কদাচিৎ এই বিশ্বাসের সবল যুক্তি বা হেতু বলা যায় যে, গানটি অবশ্যই করুণ হবে, মানুষটির মুখ অবশ্যই বিষণ্ন দেখাবে।

বস্তুত গানটি হতে পারে প্রশান্তিময় অথবা গুরুগম্ভীর, আবেগপ্রবণ অথবা মাধুর্যহীন; মানুষটির মুখ দেখতে ক্রুদ্ধ অথবা চিন্তাশীল মনে হতে পারে। কাজেই, এটি একটি অযুক্তিযুক্ত প্রাকস্বীকৃতি যে কেন একটি বস্তুর নির্দিষ্ট একটি নান্দনিক গুণ থাকে তার হেতু বা কারণ যদি একজন সমালোচক আবিষ্কার করে থাকেন, এবং একে এই অর্থে তার অবধারণের সমর্থনে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেন, তাহলে তার কাছে এমন একটি হেতু বা যুক্তি থাকবে যার উপস্থাপনে তার অবধারণটি বৌদ্ধিক সমর্থন লাভ করবে এবং তার যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করবে। কেন কোনো কিছু খ হয়, বাস্তবত তার কারণ হতে পারে ক, কিন্তু তা হলেও বস্তুটির ক হওয়া সংক্রান্ত তার জ্ঞান এই বিশ্বাসের হেতু বা যুক্তি নাও হতে পারে যে বস্তুটি হলো খ।

যদি তাই হয়, তাহলে সমালোচকেরা যেহেতু তাঁদের অবধারণের সমর্থনে যুক্তি দেন, সেহেতু তাঁদের পক্ষে ভালো যুক্তি দেওয়া অবশ্যই সম্ভব। এই প্রাকস্বীকৃতিটিকে আরও বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মোনরো বিয়ার্ডসলি বিচারমূলক সংশয়বাদীদের বিরুদ্ধে বলেন যে, যে সমালোচকের কাছে যুক্তি রয়েছে তিনি হলেন 'যুক্তিপ্রদাতা' এবং যখন তিনি যুক্তি দেন, তখন তিনি যা করেন তাকে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করেন, এবং কীভাবে ওই যুক্তিগুলি কাজ করে তার দার্শনিক ব্যাখ্যার দিকে ফিরে যান। অধিকাংশ লেখকের মতো বিয়ার্ডসলি (Beardsley, 1962:477–488) এখানে বিশেষভাবে নির্ণায়ক অবধারণ বা মূল্যায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত; এটি এমন একটি অঞ্চল যেখানে আলোচ্য প্রসঙ্গ একই হতে পারে না এবং সে যা বলে তা সঠিক হতে পারে। যেহেতু

আমাদের বর্তমান মনোযোগের বিষয় ভিন্ন, সেহেতু আমরা এখানে তাঁর বক্তব্য আলোচনা করবো না। এখানে আমাদের আগ্রহের বিষয় হল, একটি অবধারণের সপক্ষে সমালোচক কেন যুক্তি দিয়ে থাকেন সেই বিষয়ে বিয়ার্ডসলির ব্যাখ্যা, যেহেতু তিনি নির্ণায়ক অবধারণের সমর্থনে যুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে এর সীমা সম্বন্ধে কিছুই বলেননি।

বিয়ার্ডসলি বলেন, একটি যুক্তি হলো এমন কিছু বচন যা কোনো বস্তু বা শিল্পকর্মের কিছু ধর্মকে উপস্থাপন করে এবং 'যদি কোনো বচন অপর একটি বচনের যুক্তি হয় তাকে সমর্থন দেওয়ার অর্থে, তাহলে তা অবশ্যই কোনো বিমূর্ত উপায়ে সাধারণ প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে। তাছাড়া, তিনি বলেন, 'যৌক্তিক অর্থে সাধারণত্বকে যুক্তির জন্য আবশ্যিক বলে মনে হয়'। এবং, কোনো কোনো প্রকার সাধারণত্ব যুক্তি-প্রদানের জন্য অপরিহার্য। কাজেই, তিনি সেই সমস্ত 'বিচারমূলক সংশয়বাদী'দের আক্রমণ করেন যাঁরা মনে করেন যে আমরা বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যই যুক্তি দেওয়ার কথা বলতে পারি, যেখানে আমরা কোনো সাধারণ সূত্রের ওপর নির্ভর করি না। কাজেই, এখানে আমরা নান্দনিক অবধারণের সমর্থনে যুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কী কী থাকে সেই বিষয়ে একটি মত পাচ্ছি, এবং এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে আমাদের আলোচ্য অবধারণের ক্ষেত্রে ওই মত কার্যকরী হবে কি না।

আমরা পূর্বেই যুক্তি দিয়েছি যে, ওই অবধারণগুলির কোনো একটির সমর্থনে যুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে, সমালোচক এমন কিছু বিষয়ের প্রস্তাব করতে পারেন, যেগুলি সামান্যীকরণকে অনুমোদন করে না এবং কোনো অনুমানের ভিত্তিতে অবধারণটির সত্যতার সপক্ষে সমর্থন প্রদান করে না। তাই, আমরা বিশ্বাস করি যে, যেহেতু সমালোচক ওই সমস্ত অবধারণের সমর্থনে যুক্তি দিয়ে থাকেন কোনো অ-নান্দনিক ধর্মের উপস্থাপন করে, সেহেতু তাঁরা বিয়ার্ডসলির অর্থে কোনো যুক্তি প্রদান করেন না, যে অর্থে যুক্তি হলো একটি বচন এবং এই বচনের সঙ্গে তাদের দ্বারা সমর্থিত অবধারণের একটি যৌক্তিক সম্বন্ধ থাকে, এমনকি তাঁরা 'কোনো বিমূর্ত উপায়ে' সাধারণ প্রত্যয়ের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত করেন না। ফলস্বরূপ, যখন সমালোচকেরা ওইরূপ যুক্তি দেন, তখন তাঁরা এমন একটি কর্মকাণ্ডের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন যেখানে আমরা নির্দিষ্ট কোনো দিক থেকে বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে যুক্তি দেওয়ার কথা বলতে পারি কোনো সাধারণ সূত্রের ওপর নির্ভর না করেই।

আমাদের আলোচ্য নান্দনিক অবধারণের সমর্থনে যুক্তি দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ উপায়ের অস্তিত্ব আছে, যা বস্তুর গুণধর্মকে এমন বচনের দ্বারা উপস্থাপন করার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, যা সমালোচকের অবধারণের সত্যতাকে যৌক্তিকভাবে সমর্থিত করে। কাজেই, আমাদের অবশ্যই এই ভ্রান্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত হবে না যে, অনুমানের ভিত্তি-স্বরূপ যে যুক্তি এবং কোনো কিছুতে কোনো একটি ধর্ম থাকার ভিত্তি-স্বরূপ যে যুক্তি, উভয়কেই আমরা সাধারণত একই শব্দ দিয়ে নির্দেশ করি। 'কেন দুটি পাথর একে অপরের সঙ্গে খাপ খায় না?' এই প্রশ্নের উত্তর দুটি ক্ষেত্রেই একই হতে পারে। 'আমরা মনে করি, পাথর দুটি খাপ খায় না, কারণ এদের একটি হলো বাঁকা'। কিন্তু এটি এই রকম প্রশ্ন করা এবং এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হতে পারে যে, 'কেন তুমি অনুমান করলে যে তারা খাপ খায় না?' অথবা 'কেন তারা খাপ খায় না সেই প্রসঙ্গে তোমার ব্যাখ্যা কী?'। এই শেষোক্ত অর্থে আমরা সমালোচককে সাধারণত জিজ্ঞাসা করি কেন তিনি কোনো কিছুকে মাধুর্যপূর্ণ বলে মনে করেন, এবং এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে যুক্তি দেন তাকে আরোহী বা অবরোহী হওয়ার প্রয়োজন নেই। এই অর্থে এই কথা

যথার্থ নয় যে, সমালোচকের উচিত তাঁর যুক্তির ভিত্তিতে তাঁর দাবির বৌদ্ধিক সমর্থন প্রদান করা। যদিও এটি অস্বীকার করা যায় না যে, একজন সমালোচকের কিছু যুক্তি অপ্রাসঙ্গিক, অনুপযুক্ত ও অদ্ভুত হতে পারে। এখানেই নান্দনিক ও অ-নান্দনিক কার্যফল নিয়ে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

নান্দনিক ও অ-নান্দনিক কার্যফল

এখন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পার্থক্য করা যাক, যা প্রায়শই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। ১. নান্দনিক কার্যফলের ব্যাখ্যা, ২. প্রত্যক্ষমূলক প্রমাণের দ্বারা একটি অবধারণের সমর্থন, ৩. যুক্তি থেকে নিষ্কাশনের মাধ্যমে নান্দনিক অবধারণ গঠন করার অসম্ভবতা, ৪. সমালোচকের দাবি অনুযায়ী কেন একটি শিল্পকর্মের নান্দনিক ধর্ম থাকে তার ব্যাখ্যা দিতে সমালোচক যে অর্থে সক্ষম হন অথবা হওয়া উচিত, ৫. অ-নান্দনিক ধর্মসংক্রান্ত বিবৃতির ভিত্তিতে, কেউ নান্দনিক গুণধর্ম আরোপ করার ক্ষেত্রে অথবা ওই আরোপণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত হতে পারে কি না, এই প্রশ্নটি। এই প্রশ্নটি এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়; প্রশ্নটির বিচার-বিশ্লেষণের জন্য নির্দিষ্ট কিছু অন্যান্য সম্বন্ধ আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

এই প্রশ্নটিকে বিচার-বিশ্লেষণের জন্য মনোনীত করার বহু কারণ রয়েছে। নান্দনিক গুণধর্ম অ-নান্দনিক গুণধর্মের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত এবং বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল। কাজেই, নান্দনিক গুণধর্ম বিশিষ্ট বিবৃতিকে, এবং সাধারণভাবে নান্দনিক অবধারণকে, সত্য বলেই মনে হয়, কারণ অ-নান্দনিক গুণধর্ম বিশিষ্ট নির্দিষ্ট কিছু বিবৃতি সত্য হয় এবং যদি তা সত্য না হতো, তাহলে নান্দনিক গুণধর্ম সংক্রান্ত বিবৃতিও সত্য হতো না। যদি দুই প্রকার বিবৃতির মধ্যে ওইরূপ সম্বন্ধ থাকে, তাহলে তা থেকে কি প্রতিপাদিত হয় যে, দ্বিতীয় প্রকারের বিবৃতির সত্যতা প্রথম প্রকার বিবৃতির সত্যতার সমর্থন, নিশ্চয়তা ও সম্ভাব্যতা প্রদান করে অথবা বাতিল করে দেয়?

যদি তা হতো, তাহলে অন্য কিছু ঘটা সম্ভব হতে পারতো, যদিও একজন সমালোচক তাঁর নান্দনিক দাবিকে ওইভাবে সমর্থন প্রদান করতেন না। যার নান্দনিক প্রভেদ-সামর্থ্য নেই কিন্তু নিজেই একটি বস্তুর অ-নান্দনিক গুণধর্ম প্রত্যক্ষ করতে পারে, সে যুক্তিযুক্তভাবে সিদ্ধান্ত করতে পারে যে, বস্তুটি মাধুর্যপূর্ণ এবং এর সপক্ষে সে যুক্তি দিতে পারে, কিছু কার্যকরী যুক্তি উপস্থাপন করে একে প্রমাণ করতে পারে। যে বস্তু সে কোনো দিন দেখেনি, সেই বস্তু সম্বন্ধে অপরিহার্য কিছু তথ্যের ভিত্তিতে সে যুক্তিযুক্ত বিশ্বাসে, এমনকি সত্য বিশ্বাসে, উপনীত হতে পারে। যে ব্যক্তি কোনো ভাস্কর্যকে মাধুর্যপূর্ণ, কোনো কবিতাকে গতিশীল বলে অবধারণ করেছে, কিন্তু তার অবধারণ সম্বন্ধে সে অনিশ্চয়তা বোধ করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চিত হতে পারে যে, ওই শিল্পকর্মগুলি ঠিক ওই রকমই, এবং সে তার নিজের প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষভাবেই নিশ্চিত হতে পারে অথবা সেই রকম চিন্তা করার সপক্ষে আরও যুক্তি খুঁজে পেতে পারে। কাজেই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নান্দনিক অবধারণকে যাচাই করে দেখার উপায় আছে এবং নান্দনিক পদকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করার বিকল্প উপায়ও আছে। কীভাবে সম্ভব তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের কিছু উত্তর বহু গতানুগতিক ও সমসাময়িক তত্ত্বের সত্যতার ওপর নির্ভরশীল; তত্ত্বগুলির উচিত নান্দনিক ও অ-নান্দনিক ধারণার মধ্যে আরও কিছু সম্বন্ধকে স্পষ্ট করা এবং নান্দনিক পদ ও অবধারণের স্বরূপকে ব্যাখ্যা করা। প্রথমেই প্রত্যয়মূলক সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রত্যয়মূলক সম্বন্ধ

নান্দনিক ও অ-নান্দনিক গুণধর্মের মধ্যে যে একটি সাধারণ সম্বন্ধ ও অনুষঙ্গ রয়েছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। যদিও নান্দনিক ও অ-নান্দনিক পার্থক্যের ওপর সাধারণত মনোযোগ দেওয়া হয়নি, বরং ব্যাপক একটি ধর্মের ধারণার ওপর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে (বুনিয়াদি ধর্ম, নির্ভরশীল, উন্মেষমূলক, গেস্টাল্ট ধর্ম ইত্যাদি), তবুও তাদের সম্বন্ধের অস্তিত্ব এবং তাদের বর্ণনা করার সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ, বিশেষভাবে তাঁদের কাছে যাঁরা পরীক্ষণমূলক গবেষণার সঙ্গে যুক্ত।

সংগীত ও কবিতার ক্ষেত্রে, নিস্তব্ধতা ও মন্থরতার সঙ্গে দুঃখবোধ ও গাম্ভীর্যবোধের নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে, এবং দ্রুততার সঙ্গে ফূর্তি ও উচ্ছ্বাসের সম্বন্ধ নিবিড়; উজ্জ্বল রং কিছু পরিমাণে জাঁকজমকপূর্ণ ও চমকপ্রদ হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত; বক্ররেখা মাধুর্যপূর্ণতার সঙ্গে সম্পর্কিত ইত্যাদি। আমাদের মতে, তারা জাতিগতভাবে বা স্বভাবগতভাবে অনুষঙ্গবদ্ধ। অবশ্য এর সাধারণ বিপক্ষও রয়েছে। মলিনতা ও জাঁকজমকপূর্ণতা, কৌণিক ও সৌষ্ঠব, দ্রুত-গতি ও গাম্ভীর্য। এদের সম্বন্ধ অনেক ক্ষেত্রেই ঘোলাটে। সাধারণ মত অনুযায়ী, এদের সম্বন্ধ মূলত আপতিক ও অভিজ্ঞতামূলক (Beardsley, 1970:219–237)। এদের মধ্যে প্রত্যয়মূলক সম্বন্ধ যে থাকতে পারে তা লক্ষ করা হয়নি। নন্দনতত্ত্বে যৌক্তিক ও প্রত্যয়মূলক সম্বন্ধকে সাধারণত আপতিক হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে আমরা কিছু প্রত্যয়মূলক সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করবো।

এক. এখন এমন কিছু সম্বন্ধের বিবেচনা করা যাক যা আলোচ্য প্রসঙ্গে খাটে না। যদিও একটি বস্তুর নান্দনিক ধর্ম অ-নান্দনিক ধর্মের ওপর নির্ভরশীল, তবুও অ-নান্দনিক গুণধর্মের এমন কোনো সমষ্টি নেই যা নির্দিষ্ট কোনো নান্দনিক ধর্মে থাকার জন্য পর্যাপ্ত। অর্থাৎ আমরা এখানে অনেক সম্ভাবনা বাতিল করে দিতে চাইছি। যৌক্তিকভাবে পর্যাপ্ত শর্তের এমন কোনো সমষ্টি, সেট বা গোষ্ঠী নেই, এমন কোনো 'বাতিলযোগ্য' সমষ্টি নেই এবং এমন কোনো সম্পূর্ণভাবে অ-নান্দনিক বর্ণনা নেই, যা যৌক্তিকভাবে কোনো নান্দনিক ধর্মকে প্রসক্ত করে অথবা যার ভিত্তিতে ওইরূপ কোনো ধর্মকে অস্বীকার করলে তা হতো ভাষাগত ভ্রম। একটি বস্তুর কিছু গুণধর্ম বস্তুটিকে মাধুর্যপূর্ণ করে তোলার জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে, কিন্তু একে যৌক্তিক পর্যাপ্ততার দৃষ্টান্ত বলা যাবে না। কোনো নান্দনিক পদের প্রয়োগের জন্য কোনো অ-নান্দনিক শর্ত বা বর্ণনার যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা নেই, যদিও তা বলার জন্য প্রয়োজন হতে পারে (Sibley, 1959:421–450)।

এখন পর্যন্ত আমরা অ-নান্দনিক পদ ও অবধারণের সঙ্গে নান্দনিক পদ ও অবধারণের সম্বন্ধের আলোচনায় সীমিত ছিলাম। এটা হতে পারে যে, নান্দনিক পদ বিশিষ্ট কিছু বর্ণনা অন্য একটি নান্দনিক পদ প্রয়োগ করার যৌক্তিকভাবে পর্যাপ্ত শর্ত, কিন্তু যদি সেই রকম সম্বন্ধ থাকে, তাহলে তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় (Grice, 1964:378–391)। কখনও বলা হয় যে, আমরা যে পদকে নান্দনিক বলছি, তা একটি অনির্দিষ্ট পদ। যতদূর সম্ভব এ কথা মিথ্যা, তবে যদি আমরা সঠিক হই, তাহলে সেগুলিকে কোনো একটি নির্দিষ্ট উপায়ে কেবল অ-নান্দনিক পদের সাহায্যে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না। কিন্তু এই দাবি করতে হলে, প্রথমে আমাদের দ্বিবিভাজনকে মেনে নিতে হবে। যারা পদগুলিকে সংজ্ঞায়িত করার যোগ্য নয় বলে আপত্তি তোলেন তারা ওই বিভাজন করেন না। আবার, অন্য প্রত্যয়গুলি নিয়ে কোনো সংশয় নেই,

যেগুলির আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্তের অভাব আছে। কাজেই, আমরা দাবি করছি না যে, এই দিক থেকে নান্দনিক প্রত্যয় অন্যান্য সমস্ত প্রত্যয় থেকে ভিন্ন।

এটি লক্ষণীয় যে, আমরা যে দুই প্রকার প্রত্যয়ের উল্লেখ করেছি, তাদের সম্বন্ধ আলোচনা করার জন্য, দুই প্রকার প্রত্যয়কে অবশ্যই ওই সম্বন্ধ নিরপেক্ষভাবে শনাক্ত করতে হবে। কেউ নান্দনিক প্রত্যয়কে অন্যান্য প্রত্যয় থেকে এই কারণে পৃথক করতে পারে না যে, সেগুলির সঙ্গে অন্যান্য প্রত্যয়গুলির কোনো একটি সম্বন্ধ নেই। আমাদের নিজস্ব দৃষ্টান্তগুলির দ্বারা এবং সংবেদনশীলতা ও অভিরুচি সম্বন্ধে আমরা যা বলেছি তার দ্বারা, পর্যাপ্তভাবে ওই দুই প্রকার প্রত্যয় সূচিত হয়। আমরা আর তাদের পার্থক্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করিনি। যেহেতু এই প্রবন্ধের যুক্তি অনুযায়ী একে প্রদত্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, তাইজন্য তারা ওই পার্থক্যের ব্যাখ্যার ও নান্দনিক সংবেদনশীলতার স্বরূপের ব্যাখ্যার সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না (Carritt, 1947 : 20-21)।

আমরা মনে করি, যদি এটি নান্দনিক অবধারণের অপরিহার্য ধর্ম হয় যে, তাদের সত্যতা কোনো অ-নান্দনিক অবধারণের সত্যতার দ্বারা যৌক্তিকভাবে সমর্থিত হয় না, তাহলে এর স্পষ্ট একটি ফলাফল থাকবে। এক্ষেত্রে, আলোচ্য অর্থে কেবল অ-নান্দনিক গুণধর্মের ওপর নির্ভর করে কোনো ব্যক্তির পক্ষে যাচাই করা এবং অনুমান করা অসম্ভব হবে যে একটি বস্তুর নির্দিষ্ট কোনো নান্দনিক ধর্ম আছে।

দুই. এই নেতিবাচক দাবির ক্ষেত্রে আমরা বলছি না যে, নান্দনিক প্রত্যয় কোনো যৌক্তিক প্রত্যয়ের অধীন নয়। বস্তুত, এদের সম্বন্ধ অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথমত, কিছু নান্দনিক গুণধর্মের জন্য কিছু অ-নান্দনিক গুণধর্ম যৌক্তিকভাবে আবশ্যিক। জাঁকজমকপূর্ণ ও চমকপ্রদ হওয়ার গুণ দুটির বিবেচনা করা যাক। এই দুটি গুণের অস্তিত্বই থাকতো না যদি অতি উজ্জ্বল রঙের দৃষ্টান্ত না থাকতো এবং কেবল মলিন ও বিবর্ণ রঙের দৃষ্টান্ত থাকতো; সেক্ষেত্রে ওইরূপ গুণের প্রত্যয় আদৌ থাকতো কি না অথবা কেউ তা জানতো কি না তা সংশয়জনক। অনুরূপভাবে, যদি কেবল উজ্জ্বল ও চকচকে রং থাকতো, তাহলে চমকপ্রদ বলে নান্দনিকভাবে বর্ণনা করার মতো কিছু থাকতো না। যদি সমস্ত রেখাই সরল বা কৌণিক হতো, বক্ররেখা বলে কিছু না থাকতো, তাহলে 'সৌষ্ঠব' বা 'মাধুর্য' বলে গুণবাচক পদের প্রয়োগ থাকতো না। যেহেতু এই সম্বন্ধ আপতিক, সেহেতু এটি চিন্তনীয় যে আমরা কখনও কখনও সোজা রেখার মধ্যে মাধুর্য লক্ষ করতে পারবো এবং মলিন রঙের মধ্যে জাঁকালো হওয়ার গুণটি।

দ্বিতীয়ত, কিছু অ-নান্দনিক গুণধর্মকে নান্দনিক গুণধর্মের দ্বারা 'যৌক্তিকভাবে প্রাকস্বীকৃত' গুণ হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। একটি বিন্দু, একটি ঝলক অথবা একটি রঙিন কোনো স্থান সম্বন্ধে এ কথা বলা অসম্ভব যে, সেটি গভীরভাবে গতিশীল বা গতিশীল নয়, অথবা তার মাধুর্য, ঐক্য ও ভারসাম্য আছে বা নেই। যার রেখা আছে, কেবল সেটাই স্থিতিশীল ও গতিশীল হতে পারে, তার অবভাস মাধুর্যপূর্ণ ও মাধুর্যহীন হতে পারে; যার অংশ আছে, কেবল সেটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে (Butler, 1362:143)।

তৃতীয়ত, এমন কিছু সম্বন্ধ থাকতে পারে যেগুলি যৌক্তিক অনিবার্যতা ও প্রাকস্বীকৃতির চেয়ে অনেক কম কঠোর। যেমন সংগীতের ক্ষেত্রে 'করুণ' শব্দটির প্রয়োগ বিবেচনা করা যাক। এক্ষেত্রে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য মনে উদয় হওয়ার কথা তা হল, মন্থরতা, নিস্তব্ধতা, প্রশান্তি, নিম্নস্বর, বিরাম ইত্যাদি। অনুরূপভাবে, উল্লাস ও হর্ষের সঙ্গে দ্রুততা, নাতিদীর্ঘ স্বরের ঘন

পুনরাবৃত্তি প্রভৃতি অনুষঙ্গাবদ্ধ থাকে। এখন, এই সম্বন্ধগুলির অন্তর্গত কিছু সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে প্রত্যয়মূলক ও আপতিক না হলেও, অন্যান্য সম্বন্ধগুলি প্রত্যয়মূলক হয়। তবে, এগুলি যৌক্তিকভাবে পর্যাপ্ত হওয়ার চেয়ে বেশি যৌক্তিকভাবে আবশ্যিক নয়। কোনো সংগীতের দ্রুত স্বর থাকা সত্ত্বেও সেটি করুণ হয়; কোনো নির্দিষ্ট এক ধরনের কৌণিকতা না থাকা সত্ত্বেও, কোনো নৃত্যের একটি মুহূর্ত মাধুর্যপূর্ণ হতে পারে। কেউ এমন সংগীতের চিন্তা করতে পারে যা কোমল ও মন্থর সুরের নয়, যেমন কেউ এমন একটি মাধুর্যপূর্ণ রেখার চিন্তা করতে পারে না, যা একেবারে সোজা বা সরল রেখা।

এই রকম শিথিল উপায়ে যেকোনো বিশেষ পদের সঙ্গে যৌক্তিকভাবে অনুষঙ্গাবদ্ধ ধর্মগুলির মধ্যে কিছু ধর্ম অন্যান্য ধর্মগুলি অপেক্ষা বেশি আবশ্যিক হওয়ার নিকটবর্তী বাস্তবত সেই রকম হওয়া ছাড়াই। অ-নান্দনিক প্রসঙ্গে ব্যবহৃত একই পদের ক্ষেত্রে অনুরূপ কথা সত্য : গালে হাত দিয়ে মুখ নিচু করে বসে থাকা অপেক্ষা ব্যস্ততা ছাড়াই মন্থর গতিতে যাওয়ার একটি প্রবণতা লোকের দুঃখবোধের জন্য বেশি আবশ্যক। যখন এর উপস্থিতি একটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়, তখন এর অনুপস্থিতি হতে পারে অত্যন্ত ব্যতিক্রমী, যেখানে গালে হাত দিয়ে মুখ নিচু করে বসে থাকা স্বভাবগত প্রবণতা কিন্তু তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষে আমরা বলেছিলাম যে, একজন সমালোচকের যুক্তি অনুপযুক্ত অথবা অদ্ভুত হতে পারে; এই যুক্তি যৌক্তিক স্বীকৃতি ও বিরোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত যা আমরা এই মাত্র আলোচনা করেছি। একটি রেখা ঋজু হওয়ার কারণে তাকে সাবলীল বা মাধুর্যপূর্ণ বলা, এবং একটি সংগীত মন্থর হওয়ার কারণে একে উল্লসিত বলা মানে অদ্ভুত কিছু বলা যা যৌক্তিকভাবে বিরূপ। সপ্তম পরিচ্ছেদের (১)-এ আমরা অস্বীকার করেছি যে, নান্দনিক প্রত্যয় পর্যাপ্ত শর্তের অধীন; এখন আমরা এমন কিছু উপায়ের রূপরেখা অঙ্কন করবো যেখানে সেগুলি অন্যান্য প্রত্যয়ের সঙ্গে যৌক্তিকভাবে সম্পর্কিত হতে পারে। তাই, যদি একটি বস্তুর নান্দনিক ধর্ম ক থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট কিছু অ-নান্দনিক ধর্ম খ১, খ২, খ৩..., থাকা সর্বাধিকভাবে সম্ভব হতে পারে, এমনকি আবশ্যিকভাবেও। খ১ খ২ ইত্যাদি ধর্ম হলো এমন ধর্ম যা ক-এর সঙ্গে প্রত্যয়গতভাবে যুক্ত। কিন্তু, খ১ খ২ ইত্যাদি ধর্মগুলির উপস্থিতি ক-এর নিশ্চয়তা প্রদান করে না। যৌক্তিক সম্বন্ধ যেহেতু রয়েছে, সেহেতু কেউ যা বলতে পারে তা হলো যে, এটির কম ধর্ম থাকা সম্ভব।

আপতিক সম্বন্ধ

আমরা সবশেষে দুই ধরনের গুণাবলির মধ্যে সাধারণ আপতিক সম্বন্ধের বিবেচনা করবো এবং এর সঙ্গে বিবেচিত হবে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতামূলক সামান্যীকরণের সম্ভাবনা। অনেক কারণে কোন ধরনের সংগতিপূর্ণ সামান্যীকরণ করা যায় এবং কোন ধরনের তা করা যায় না, তা দেখা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে এগুলির সঙ্গে দ্বিতীয় ও সপ্তম পরিচ্ছেদে আলোচিত অভিজ্ঞতামূলক ও যৌক্তিক সম্বন্ধ বিষয়ক বিবৃতিগুলি একাকার হয়ে না যায়।

এটি করার জন্য অভিজ্ঞতামূলক সামান্যীকরণ আলোচনা করার ক্ষেত্রে বিয়ার্ডসলি যা বলেছেন আমরা তা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে বিবেচনা করবো। তিনি বিস্তৃতভাবে নান্দনিক ও অ-নান্দনিক গুণধর্মের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করেননি, কারণ তিনি ওইরূপ পার্থক্য করেননি; পরিবর্তে তিনি স্থানীয় গুণধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষমূলক শর্তের পার্থক্য করেন। কাজেই তাঁর আলোচনার পরিধি অনেক বড়ো, যেহেতু নান্দনিক ধর্মের মতোই কিছু অ-নান্দনিক গুণধর্ম (যেমন বর্গাকার হওয়া বা

ভেংচি কাটা হাসি) হলো স্থানীয় গুণধর্মের দৃষ্টান্ত। কিন্তু এটি কোনো সমস্যা নয়, কারণ আমাদের নান্দনিক গুণধর্ম হলো এদের স্থানীয় গুণধর্মের উপশ্রেণি।

আমরা বিয়ার্ডসলির অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করবো তাঁর মতের একটি সাধারণ ব্যাখ্যা হিসেবে। দৃষ্টান্ত হল, সংগীতের ক্ষেত্রে মন্থরতা ও দুঃখবোধের সম্বন্ধ। তিনি যে ধরনের অভিজ্ঞতামূলক সামান্যীকরণের প্রস্তাব করেছেন, তা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যখন বস্তুর কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্ম থাকে, তখন ফলাফল হিসেবে অন্য একটি ধর্ম থাকারও প্রবণতা থাকবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'সংগীতের অমুক অমুক ধর্ম থাকলে তার করুণ হওয়ারও প্রবণতা থাকবে; নির্দিষ্ট কিছু গুণ সংগীতকে করুণ করে তোলে; এগুলি হলো দুঃখ-উৎপাদক ধর্ম' (Beardsley, 1962:477–488)।

এখন 'প্রবণতা' শব্দটির বিভিন্ন প্রয়োগ অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যাখ্যা থাকতে পারে, যা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এর অর্থ হতে পারে যে, মন্থর সুরের সংগীত করুণ হয়ে উঠবে যদি উপস্থিত অন্যান্য ধর্ম এমন কোনো অসংগতিপূর্ণ ধর্ম উপস্থাপন না করে, যা সুরের মন্থরতাকে খর্ব করে দেয়। প্রবণতার শক্তি কেবল এই যে, গতিবেগ মাত্রা বা লয়ের প্রভাব ছাপিয়ে যেতে পারে। আমাদের মতে, এটাই ছিল বিয়ার্ডসলির অর্থ এবং যেহেতু তিনি আর অন্য কিছু উল্লেখ করেননি, সেহেতু এটাই তিনি অন্যান্য দৃষ্টান্তে অনুসরণ করেছেন, যথা উজ্জ্বল ও চমকপ্রদ। এখন এটি সত্য যে, তিনি দৃষ্টান্ত হিসেবে যে বিশেষ সামান্যীকরণ প্রয়োগ করেছেন তার সত্যতার দাবিকে তিনি অস্বীকার করেন। তবে মনে হয় তিনি ধরে নিয়েছেন যে, এই ধরনের অনেক সামান্যীকরণ সত্য হতে পারে এবং তার সামান্যীকরণগুলিও সম্ভবত সত্য হতে পারে। কিন্তু এগুলি এবং এর মতো অনেক সামান্যীকরণ স্পষ্টতই মিথ্যা বলে মনে হয়, যেমন মন্থর লয় নিবিড়ভাবে অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে যুক্ত, যেমন নিস্তব্ধতা, বিষণ্নতা, প্রশান্তিময়তা ও দুঃখিত হওয়া। এমনকি যদি কেউ এই প্রবণতামূলক বিবৃতির ব্যাখ্যা দেয় অন্য কোনো উপায়ে, (যেমন মন্থর সংগীত সাধারণত করুণ হয় অথবা এটি সর্বদাই করুণ হয়), তাহলেও তা মিথ্যা হবে। অনেক মন্থর লয়ের সংগীত নিস্তব্ধ, গম্ভীর ও প্রশান্তিময় হলেও করুণ হয় না, এবং এমন অনেক মন্থর লয়ের সংগীত রয়েছে যা আদৌ বিশেষ কোনো মর্যাদার হয় না (Berleant, 1993)।

অভিজ্ঞতামূলকভাবে এমন অনেক সামান্যীকরণ কেউ করতে পারে যা নান্দনিক ও অ-নান্দনিক ধর্মকে যুক্ত করে। এদের অনেককে সত্য বলে মনে হলেও, সেগুলি বিয়ার্ডসলির সামান্যীকরণের মতো নয় এবং তুলনামূলকভাবে অনেক দুর্বল; যেমন, মন্থর সংগীত কখনও করুণ হয় এবং যখন তা করুণ হয়, তখন তা তার লয়ের কারণে হয়। অন্যান্য বিবৃতি, যেমন 'করুণ সংগীত সাধারণত মন্থর হয়', সত্য হতে পারে। আবার অনেক বিবৃতি, যেমন 'মন্থর লয় সংগীতকে করুণ করে তোলার প্রবণতা রাখে', 'মন্থর লয় হল এমন ধর্ম যা সংগীতকে করুণ করে তুলতে পারে', স্পষ্টভাবে অভিজ্ঞতামূলক নয় বলেই মনে হয়।

আমরা এখানে অস্বীকার করছি না যে, আমরা সযত্নে আরও শক্তিশালী সামান্যীকরণ গঠন করতে পারি যেখানে আরও বিস্তৃতভাবে বলা হবে যে, বহু ধর্ম বিশিষ্ট শিল্পকর্মের সর্বদাই নির্দিষ্ট কোনো নান্দনিক ধর্ম থাকে বা থাকবে। আমরা যা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি তা হলো যে, প্রস্তাবিত হয়েছে এমন কিছু প্রবণতাশীল সামান্যীকরণ সংশয়জনক। আমাদের প্রস্তাব হল, অংশত সেগুলির প্রস্তাব করা যায়, কারণ এমন বহু সম্বন্ধ আছে যা স্পষ্টভাবে পৃথক করা

হয়নি। লক্ষ করা যায় যে, একটি সাধারণ অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ মন্থর লয় ও দুঃখবোধের মধ্যে খাটে; লয়ের মন্থরতা দুঃখ-উৎপাদক ধর্ম। এই সম্বন্ধের প্রত্যয়মূলক ধর্ম উপেক্ষিত হয়েছে, কারণ কোনো শিল্পকর্মের মন্থর লয় একে করুণ করে তোলে এই বিশেষ দাবি স্পষ্টতই আপতিক। এবং যেহেতু এই নির্দিষ্ট দাবি প্রায়শই সত্য হয়, সেহেতু ধরে নেওয়া হয় যে একটি খাঁটি সবল সামান্যীকরণ তা থেকে গঠন করা যেতে পারে, যেমন 'মন্থরতা হল দুঃখ-উৎপাদক গুণ এই অর্থে যে, সংগীতের মন্থরতা একে করুণ করে তোলার প্রবণতা রাখে' (Davies, 1994:141)।

নান্দনিকতা ও মনোভাব

নান্দনিকতা ও অ-নান্দনিকতা নিয়ে এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা উপন্যস্ত করেছি তাতে এ দু'য়ের মধ্যকার পার্থক্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। কিন্তু, প্রশ্ন হলো, আমরা যখন কোনো অ-নান্দনিক বস্তু থেকে কোনো নান্দনিক বস্তুর পার্থক্য নির্ণয়ে অগ্রসর হই তখন এই পার্থক্যকরণে আমাদের বিশেষ কোনো মনোভাব বা মনোবৃত্তি কাজ করে কী? বস্তুত, আঠারো শতক থেকে এখনও পর্যন্ত প্রশ্নটি নন্দনতত্ত্ববিদ ও শিল্প-রসিকদের নানাভাবে ভাবিয়ে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে, যথাযথ নান্দনিক অবধারণ ও তার মূল্যায়ন এবং অ-নান্দনিক বস্তু থেকে নান্দনিক বস্তুর পার্থক্যকরণে শুরু থেকেই এক বিশেষ মনোভাবকে আবশ্যিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে আসছে। তবে, বর্তমানে মনোযোগ পরিবর্তিত হয়ে নান্দনিক অভিজ্ঞতা উৎপন্ন হওয়ার জন্য প্রকৃতপক্ষে কী কী বিষয় আবশ্যিক তার অনুসন্ধানে মানবমন অগ্রসর হতে শুরু করেছে। নন্দনতত্ত্ববিদ এবং শিল্পরসিকেরা শুরু থেকেই অনাসক্তি (disinterest)-কে নান্দনিক মনোভাবের আবশ্যিক লক্ষণ হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। এটি হলো ব্যবহারিক স্বার্থের প্রতি আসক্তিহীনতা, উপেক্ষা বা বিরাগ। এ ধারণাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। নন্দনতত্ত্বের বাইরে এর সাধারণ অর্থ, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংস্কার বর্জন, পক্ষপাতশূন্য প্রবণতা, অথবা বিতর্কের মধ্যস্থতাকারী হওয়া। কিন্তু, নান্দনিক অবধারণ এবং নান্দনিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ওই সাধারণ অর্থের প্রয়োগ কদাচিৎ হয়ে থাকে। নন্দনতত্ত্বে এর সাধারণ বাচ্যার্থ (common denotation) হলো নান্দনিক বস্তুর ব্যবহারিক স্বার্থের প্রতি অনাসক্তি। নান্দনিক বস্তুতে মনোনিবেশ করতে হয় কেবল অনুধ্যান বা উপলব্ধি (contemplation)-র বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে। কেবল প্রত্যক্ষ করার জন্যই এর প্রাতিভাসিক গুণধর্ম (phenomenal properties)-এর দিকে মনোনিবেশ করতে হয়। প্রত্যক্ষমূলক অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করতে হবে প্রত্যক্ষমূলক অভিজ্ঞতার জন্যই, অন্য কোনো ব্যবহারিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নয়।

অনাসক্তির ধারণাটিকে কান্ট অনুধাবন করেছেন এভাবে যে, নান্দনিক অবধারণের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে আমরা বস্তুর অস্তিত্বের ব্যাপারে আগ্রহী নই, বরং আমাদের আগ্রহ তার অবভাসের দিকে (Kant, 1987 : 138)। বস্তু যেভাবে আমাদের দিকে প্রতিভাত হয় তার বিপরীতে স্বরূপত বস্তুর প্রতি আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। যদিও এটি কান্টের বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হবে, তাহলেও বলতে হয় যে, উপলব্ধি বা অনুধ্যানের ধারণার মধ্যে ব্যক্তির দিক থেকে একটি নিষ্ক্রিয়তার মনোভাব অন্তর্নিহিত থাকতে পারে। অর্থাৎ, বস্তু যেভাবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়, যদি সেভাবেই বস্তুকে আমরা গ্রহণ করি, তাহলে তা একটি নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে সূচিত করতে পারে। কিন্তু, নান্দনিক উপলব্ধি যে একটি অত্যন্ত সক্রিয় প্রত্যক্ষ তা ওই ধারণার মধ্যে যথার্থরূপে প্রতিফলিত হয়। সংগীতের মানোন্নয়ন, দৃশ্যমান চিত্রকলা (visual art)-র আকারগত নকশা,

সাহিত্য-সংলাপের কাঠামো ইত্যাদির অভিজ্ঞতার মধ্যে যে পুনর্নির্মাণ ও অতীত অভিজ্ঞতার সক্রিয় ভূমিকা থাকে তা অস্বীকার করা যায় না।

কুড়ি শতকে জেরোমি স্টোলনিজ নান্দনিক মনোভাবের সক্রিয় দিকটির ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন (Stolnitz, 1960:37)। তাঁর মতে, কারও মনোভাব তার উদ্দেশ্য অনুসারে সর্বদাই তার প্রত্যক্ষকে সক্রিয়ভাবে পরিচালিত করে। আমাদের সচরাচর ব্যবহারিক মনোভাবের ক্ষেত্রে, আমরা সেটাই প্রত্যক্ষ করি যা আমাদের উদ্দেশ্য সাপেক্ষে প্রাসঙ্গিক এবং স্বরূপত ওই প্রত্যক্ষের বাইরের বস্তু। অন্যদিকে, নান্দনিক প্রত্যক্ষ আরও বেশি আসক্তিহীন। এর লক্ষ্য স্বরূপত অভিজ্ঞতার উপভোগ; অর্থাৎ অন্যান্য বস্তুকে উপেক্ষা করে অভিজ্ঞতার বিষয়কে অনুধাবন করা। এ প্রসঙ্গে এডওয়ার্ড বুলাফ আসক্তিহীনতার ধারণার সঙ্গে আবেগহীনতার ধারণাকে যুক্ত করেন। একটি করুণ নাটক যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে, নাটকের দৃশ্য দেখে আবেগে আপ্লুত হলে চলবে না। সমুদ্রতটের ঝড়ো হাওয়া নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপভোগ করতে হলে, হাওয়ার ঝাপটায় ভয় পেলে চলে না (Bullough, 1912:87–98)।

নান্দনিক মনোভাব সম্বন্ধে বুলাফ-এর বিশ্লেষণকে খুব সহজেই আক্রমণ করা যায়। যখন আমরা করুণ নাটক দেখে কেঁদে ফেলি, আতঙ্কজনক চলচ্চিত্র দেখে ভয়ে লাফিয়ে উঠি, একটি উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে নিজেকে হারিয়ে ফেলি, তখন বলা যায় না যে আমরা আবেগহীন, যদিও ওইসব শিল্পকর্মের নান্দনিক গুণধর্মকে আমরা সম্পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করতে পারি। আবেগহীনতা কখনও এর যুক্তি হতে পারে না যে, আমরা করুণ নাটকের ঘটনাপ্রবাহে আদৌ আদ্যতা দিই না। কুয়াশা বা ঝড়ের বিপদ সম্পর্কে ভীত হওয়ার পরেও, আমরা তাদের নান্দনিক গুণধর্ম উপলব্ধি করতে পারি, যদিও এটি সত্য যে, বিপদের ভয় আমাদের ওই উপলব্ধি থেকে ভিন্ন অভিমুখে চালিত করে।

ডিকি ও জিম্যাক আসক্তিশূন্যতার ধারণার ওপর আরও অধিক সংশয় পোষণ করেন। জিম্যাক-এর মতে, বস্তুর প্রতি নান্দনিক আগ্রহ অন্যান্য সম্ভাব্য আগ্রহের অন্যতম একটি আগ্রহ। এটি বস্তুর প্রতি একটি আত্মকেন্দ্রিক আগ্রহ, যার লক্ষ্য ব্যক্তির নিজের উপভোগ (Zemach, 1997:69)। কিন্তু, একে সম্পূর্ণ আসক্তিহীন আগ্রহ বললে ভুল করা হবে। কান্ট-এর বিপরীতে তিনি বলেন যে, আমরা বস্তুর বাস্তব অস্তিত্বের প্রতি আগ্রহী, যখন আমরা তা নান্দনিকভাবে প্রত্যক্ষ করি। একটি অপেরা সংগীতকে আমরা সেইভাবে উপভোগ করবো না, যদি আমরা জানি যে গায়ক কেবলমাত্র ঠোঁট মেলাচ্ছেন, আর গানটি বাজছে সিডি প্লেয়ারে। একটি আসল চিত্র যেভাবে আমাদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করে, চিত্রটির পুনর্মুদ্রণ সেভাবে আমাদের আকৃষ্ট করে না, যদিও আমাদের কাছে তাদের প্রতিভাস অভেদযোগ্য, অর্থাৎ একই রকম মনে হয়।

ডিকি-র মতে, অনাসক্তির ধারণা থেকে দুটি বিষয় প্রতিফলিত হয়। এক. প্রত্যক্ষের অনুপ্রেরণা বা উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষের ভঙ্গিকে একাকার করে দেওয়ার বিভ্রান্তি, এবং দুই. কেবল নান্দনিক বস্তুর দিকে মনোযোগ দেওয়ার বাহুল্য দাবি (Dickie, 1964:56–66)। যে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ কোনো বস্তুর দিকে তাকায়, সেই স্বার্থ এই ব্যাপারে অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে যে, ওই বস্তুকে সে কীভাবে প্রত্যক্ষ করে। একটি চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখা এবং বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করা কারও মূল উদ্দেশ্য হলেও, তিনি চলচ্চিত্রটির নান্দনিক গুণাবলির দিকে নিবিড় মনোযোগ দিতে পারেন ওই উদ্দেশ্যের জন্যই। যে মনোভাবকে তাত্ত্বিকেরা আসক্তিহীন প্রত্যক্ষ বলেন, তা প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন কোনো

মনোভাব নয়, ভিন্ন কোনো প্রত্যক্ষ ভঙ্গি বা মনোযোগ নয়, বরং তা হলো ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ, ভয়ভীতি, অর্থ উপার্জনের তাগিদ, দিবাস্বপ্ন (daydreams) প্রভৃতির দ্বারা উৎপন্ন চিত্তবিক্ষেপ থেকে মুক্তি।

স্টোলনিজ-এর দাবি ছিল, নান্দনিক প্রত্যক্ষের লক্ষ্য হবে অন্যান্য জিনিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল নান্দনিক বস্তুর দিকে ধাবিত হওয়া। এই দাবি প্রসঙ্গে কেন্ডেল ওয়াল্টন ও আর্থার দান্ত স্পষ্টভাবে বলেন যে, কীভাবে এই শিল্পকর্মের শ্রেণিকরণ করতে পারে, যেখানে তা শিল্পকলার ঐতিহাসিক আখ্যানের সঙ্গে মানিয়ে যায়, কেউ যেসব নান্দনিক গুণধর্মের প্রত্যক্ষ করে তা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। যা কোনো শৈলীতে দুর্দমনীয় ও দুঃসাহসিক অথবা মাধুর্যপূর্ণ, তা অন্য শৈলীতে নাও থাকতে পারে। একটি শিল্পকর্মের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ সংক্রান্ত জ্ঞানের জন্য ও তার যথাযথ শ্রেণিকরণের জন্য, ওই শিল্পকর্মের নান্দনিক গুণধর্ম সম্বন্ধে যথাযথ উপলব্ধি থাকা আবশ্যক। এমনকি ব্যবহারিক ঘটনাবলির প্রসঙ্গ থেকে যদি নির্দিষ্ট একটি শিল্পকর্মকে উৎপাটন করা হয়, তাহলে তাদের যথাযথ নান্দনিক উপলব্ধি বাধাগ্রস্ত হবে। সমসাময়িক শিল্পকলার অধিকাংশ থেকে প্রতিফলিত হয় প্রযুক্তির রূপরেখা ও কৌশল, জনসুখ উৎপাদনশীলতা, জড়বাদী অবলাদের যুগ এবং এই সময়ের জীবন যাপনের জাগতিক বা ব্যবহারিক দিকসমূহ। ব্যবহারিক জীবনের প্রসঙ্গকে উপেক্ষা করলে ওইসব শিল্পকর্মের তাৎপর্যই হারিয়ে যাবে। প্রাচীন শিল্পকলাকেও সম্পূর্ণ ব্যবহারিক ও মূর্ত প্রসঙ্গগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভালো উপলব্ধি করা যেতে পারে (Danto, 1981:101)। তখন শিল্পকলা ধর্মীয় অনুশীলনের অংশ হওয়ায় ওই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ক্যাথিড্রাল (Cathedral) নির্মাণ করা হয়, যা ওই নির্মাণের নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে ভিন্ন অভিমুখে চালিত না করে বরং তাকে সমৃদ্ধ করতে পারে (Fenner, 1996:80)।

উপরিউক্ত আপত্তি সত্ত্বেও নান্দনিক মনোভাবের চিরাচরিত ব্যাখ্যার আংশিক সত্যতা অবশ্যই আমাদের কবুল করতে হবে। আমাদের সচরাচর প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য চরিতার্থে কাজ করে ও অভিযোজিত হয়, যা সাধারণত আমাদের মনোযোগকে কেবল বস্তুর সেই সব দিকের প্রতি আকৃষ্ট করে, যা তাদের নান্দনিক উপলব্ধির জন্য অপর্যাপ্ত। বস্তুর নান্দনিক উপলব্ধিতে যা কিছু থাকে তার জন্য কেবল তাদের প্রতি নিবিড় মনোযোগ দেওয়াটাই সব কিছু নয়। বিজ্ঞানীরা তাঁদের পরীক্ষণমূলক উপাত্তের দিকে নিবিড় মনোযোগ দিয়ে থাকেন, বিনিয়োগকারী শেয়ারবাজারের ওঠানামার দিকে মনোযোগ দিয়ে থাকেন, বেসবল খেলোয়াড় এসেই মাঠের দিকে মনোযোগ দিয়ে থাকেন। কিন্তু, এসব প্রসঙ্গের কোনোটির ক্ষেত্রেই নান্দনিক উপলব্ধি অন্তর্ভুক্ত থাকে না। যেমন: আমরা পূর্বে দেখেছি, নান্দনিক গুণধর্ম, যার প্রতি কেউ মনোযোগ প্রদান করে, কোনো শিল্পকর্ম বা বস্তুর বস্তুগত ধর্ম নয়, একটি সম্বন্ধমূলক ধর্ম যা অংশত উপলব্ধিকারীর প্রতিক্রিয়ার দ্বারা গঠিত। সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধিতে নিযুক্ত থাকার অর্থ কেবল এই নয় যে, বস্তু কাঠামোর সব ধরনের জটিল অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আকারগত ধর্মের দিকে নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষমূলক মনোযোগ দেওয়া, এর সঙ্গে সেই সব ঐতিহাসিক ও বহিরাগত সম্বন্ধের জ্ঞানীয় অবধারণও অন্তর্ভুক্ত থাকে যা নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে তথ্য প্রদান করে, এবং যার সঙ্গে অভিব্যক্তিপূর্ণ গুণধর্মকে গ্রহণ করার সামর্থ্যও অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর ওই গুণধর্ম ওই ধরনের মিথস্ক্রিয়া থেকেই উন্মোচিত হয়। একটি শিল্পকর্মের অভিজ্ঞতাকে তথ্য প্রদান করতে পারে যে জ্ঞান, তাতে শিল্পীর অভিপ্রায়, কৌশল, মনোভাব, সমস্যা অতিক্রম ইত্যাদি আরও অনেক কিছুই

অন্তর্ভুক্ত থাকে। ওই ধরনের জ্ঞান নান্দনিকভাবে প্রাসঙ্গিক হবে কেবল তখন, যখন তা কারও শিল্পকর্মের অভিজ্ঞতাকে তথ্য প্রদান করে।

সাধারণত ওইভাবে নিযুক্ত থাকা অংশত ঐচ্ছিক। এটাই হলো সেই সত্য, যা নান্দনিক মনোভাব বিষয়ক তত্ত্বগত দাবিটির মূলে রয়েছে। ওই ধরনের মনোভাবকে আমরা গ্রহণ করতে পারি, অথবা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হতে পারি, এবং তা আমরা গ্রহণ করতে পারলাম কি না তার দ্বারা আমাদের বস্তুর অভিজ্ঞতা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। তবে, সব বস্তুই নান্দনিক উপলব্ধির প্রচেষ্টাকে আমন্ত্রিত করে না, বা সমৃদ্ধ করে তোলে না। এভাবে একটি নান্দনিক মনোভাবকে গ্রহণ করার প্রচেষ্টা, অথবা একটি বস্তুর উপলব্ধিতে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকার আকাঙ্ক্ষা, তাদের সাফল্যের নিশ্চয়তার জন্য আদৌ পর্যাপ্ত নয়। এমনকি তা আবশ্যিকও নয়। কেননা কোনো শিল্পকর্ম বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের দ্বারা আমরা আকস্মিকভাবে অভিভূত হয়ে পড়তে পারি, যদিও নিযুক্ত হওয়া একটি মাত্রাগত ব্যাপার এবং শিল্পকলার সম্পূর্ণ উপলব্ধি ওইভাবে অভিভূত হওয়ার চেয়ে আরও বেশি জ্ঞানীয় প্রস্তুতির দাবি রাখে।

যখন শিল্পকর্মের উপলব্ধিতে আমরা সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত হই, তখন অন্য একটি জগতে প্রবেশ করার মতো ভ্রান্তবীক্ষণ আমাদের হয়। আমরা নান্দনিক অভিজ্ঞতায় নিজেদের হারিয়ে ফেলি। এ যেন একটি শিল্পের জগৎ। এটাই হলো এই দাবির সত্যতা যে, নান্দনিক মনোভাব আমাদের ব্যবহারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আমরা নান্দনিক বস্তুর উপলব্ধির ক্ষেত্রে ওই বস্তু থেকে যে বিচ্ছিন্ন হই তা নয়, বরং এর বিপরীতটাই সত্য। আমরা যে তার অস্তিত্ব ও অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার সম্বন্ধের ব্যাপারে আগ্রহী হই তা-ও নয়, যেহেতু ওই সম্বন্ধগুলি বস্তুর অবভাস অথবা বস্তুটি সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে। কিন্তু আমাদের সাধারণ ব্যবহারিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বলতে একটি বিশেষ অনন্য কারণকে বোঝায়, যেমন : অন্ধকার নাট্যশালা, মিউজিয়াম, পাঠাগার ইত্যাদি এবং একই সঙ্গে তা নান্দনিক অভিজ্ঞতায় একটি বিশেষ অনন্য কার্যকে বোঝায়। অন্তত কিছু সময়ের জন্য এবং রূপকার্থে, ব্যবহারিক অনুষঙ্গ থেকে পালিয়ে অন্য একটি জগতে প্রবেশ করা আমাদের কাছে তার মূল্যের একটি বড়ো অংশ। প্রত্যক্ষমূলক ও জ্ঞানীয় কর্মকাণ্ডকে এবং নান্দনিক অভিজ্ঞতাজনিত আবেগাত্মক অনুভূতি গ্রহীতাকে বিশেষ একটি মনোভাব হিসেবে গ্রহণ করবো, কী করবো না, তা একটি শাব্দিক ঘটনামাত্র। কাজেই, অ-নান্দনিক বস্তু থেকে নান্দনিক বস্তুর পৃথকীকরণের কাজে মনোভাব বা মনোবৃত্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সাধারণ মন্তব্য

নান্দনিক ও অ-নান্দনিক পরিমণ্ডলের মধ্যে যৌক্তিক, আংশিকভাবে যৌক্তিক ও আপতিক কিছু সম্বন্ধ বিচার-বিশ্লেষণের পর আমরা সেই প্রশ্নতে ফিরে যাবো যে, বস্তুর অ-নান্দনিক গুণধর্ম বিষয়ক বিবৃতি থেকে কখনও এমন যুক্তি সংগতিপূর্ণভাবে দেখা যায় কি না যে নির্দিষ্ট কিছু নান্দনিক অবধারণ অবশ্যই, অথবা সম্ভাব্যরূপে, সত্য (Hepburn, 1966)।

আমরা পূর্বেই প্রস্তাব করেছি যে, অ-নান্দনিক গুণধর্ম বিষয়ক কোনো বিবৃতি একা-একাই যৌক্তিকভাবে একটি নান্দনিক বিবৃতির সত্যতার নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে না, যদিও এদের মধ্যে কিছু বিবৃতি তাদের মিথ্যাত্বের নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। এই দিক থেকে নান্দনিক অবধারণ বৌদ্ধিক বা যৌক্তিক সমর্থনের বিষয় নয়। যে প্রশ্নটি বাকি থাকে তা

হল, কিছু অ-নান্দনিক অবধারণ একা-একাই একটি নান্দনিক অবধারণের সত্যতার জন্য উপযুক্ত মাত্রায় আরোহী সমর্থন প্রদান করতে পারে কি না (Peacocke, 1993:37)। কোনো কোনো লেখক মনে করেন যে, নান্দনিক অবধারণকে ওইভাবে বৌদ্ধিক সমর্থন প্রদান করা যায় পর্যাপ্তরূপে; বস্তুতপক্ষে, ওইভাবে কোনো সমালোচনার বৌদ্ধিক ভিত্তি প্রদান করা যেতে পারে।

প্রক্রিয়াটি মূলত এইভাবে অগ্রসর হয়ে থাকে। যদি কেউ একটি নান্দনিক অবধারণের সমর্থনে যুক্তি দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করে, অথবা কোনো কিছুতে নান্দনিক গুণধর্ম আরোপণের সমর্থনে যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে সে উল্লেখ করতে পারে যে, শিল্পকর্মটির এমন এক প্রকার অ-নান্দনিক ধর্ম রয়েছে, যা সর্বদাই শিল্পকর্মটিকে করুণ, মাধুর্যপূর্ণ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে, তাই 'এই শিল্পকর্মটি ওই রকম' এই দাবি একটি বৌদ্ধিক দাবি (Ross, 1998 : 169-70)। এখন, যদিও আমরা অষ্টম পরিচ্ছেদে যে সামান্যীকরণগুলি বিশ্লেষণ করেছি, সেগুলিকে মিথ্যা অথবা কার্যকারিতার দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল বলা যায়, কিন্তু আরও সযত্নে লক্ষ করলে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, আমরা সম্ভবত এমন বিশ্বাসযোগ্য সামান্যীকরণ গঠন করতে পারি যা একই সঙ্গে সরল ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হবে। যেহেতু অধিকাংশ নান্দনিক অবধারণ জটিল এবং যেহেতু ন্যূনতম পার্থক্য প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, সেহেতু একে সর্বাধিক সংশয়জনক বলে মনে হয়। কিন্তু, যদি আমরা তা পারি, তাহলে অন্তত এটি চিন্তনীয় যে, ভবিষ্যতে লোকেরা যুক্তিযুক্তভাবে অ-নান্দনিক ধর্ম থেকে অনুমিত নান্দনিক ধর্মকে পৃথক করতে পারবে। তারা এই অনুমানকে অবশ্য খাঁটি নিরপেক্ষভাবে গঠিত নান্দনিক অবধারণের সমর্থনে প্রয়োগ করতে পারে, এবং তা করে, ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তাদের অবধারণ বৌদ্ধিকভাবে সমর্থিত (Rolston, 1998 : 157–166)।

কিন্তু এটি একটি সীমিত আগ্রহের বিষয়। অভিজ্ঞতামূলক গবেষণার দ্বারা যতদূর সম্ভব লোকেরা দেখে থাকবে যে, সাধারণভাবে নান্দনিক অবধারণের সমর্থনে বৌদ্ধিক যুক্তিযুক্ততা প্রদান করা এবং এই যুক্তিযুক্ততা ছাড়া কোনো সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয় বলে দাবি করা মানে আশাহত হওয়া। এই ভাবে সাধারণ ভিত্তি নির্মাণের যে কোনো প্রচেষ্টা ভ্রান্ত। কারণ, যখন কেউ তার সামান্যীকরণকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে, তখন অন্তত যেসব নান্দনিক অবধারণ থেকে অনুসন্ধান শুরু হবে, সেগুলি ওইরূপ যুক্তিযুক্ততার জন্য সুবিধাজনক হবে না, অথচ সেগুলিকে মুখ্য উপাত্ত হিসেবেই গ্রহণ করা হবে। সেগুলি ছাড়া, প্রত্যক্ষমূলক শর্তের কোনো অনুসন্ধান শুরুই করা যায় না। সুতরাং, সামান্যীকরণের দ্বারা নান্দনিক অবধারণের এই ধরনের যুক্তিযুক্ততা ওই ধরনের সমস্ত অবধারণের সমর্থনে প্রদান করা যায় না (Walton, 1980 : 139)।

আমরা আবারও বলতে চাইছি যে, আমরা কেবল বিশেষ এক প্রকারের নান্দনিক অবধারণের বিবেচনা করেছি। কীভাবে সেগুলি যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তা বিবেচনা করার ক্ষেত্রে, আমরা নিজেকে সেই সমস্ত যুক্তির মধ্যে সীমিত রেখেছি যেগুলি বস্তুর অ-নান্দনিক ধর্মের দ্বারা উপস্থাপিত। প্রায়শই বলা হয়ে থাকে যে, প্রত্যেকটি শিল্পকর্মই হলো অনন্য, তাই প্রত্যেকটি শিল্পকর্মের মূল্যায়ন করা উচিত তার নিজস্ব মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে। এই দাবি অপ্রাসঙ্গিক নয়। তাছাড়া, এই দাবি যে বিচিত্র বিতর্কের ইঙ্গিত দেয়, তাকে কদাচিৎ অস্বীকার করা যায়। আমরা এমন কোনো যুক্তি দিইনি যে, নান্দনিক প্রত্যক্ষ ছাড়া নান্দনিক অবধারণকে কৌশলগতভাবে বা নিয়মবদ্ধরূপে গঠন করা যায় না। আমরা একে স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছি। কিন্তু, অবরোহী ও আরোহী সমর্থন সম্বন্ধে আমরা যা বলেছি, তা

যদি সত্য হয়, তাহলে একটি সমগ্র হিসেবে এই শ্রেণির অবধারণের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এই দাঁড়াবে যে, তাদের সত্যতা কখনও কৌশলগতভাবে বা নিয়মবদ্ধরূপে যাচাইকৃত, সমর্থিত বা যুক্তিযুক্ত হতে পারবে না। নান্দনিক ও অ-নান্দনিক মনোভাব নিয়ে আলোচনা করার সময় এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করলে অনেক অপ্রত্যাশিত ভুল বোঝাবুঝির হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে।

সহায়কপঞ্জি

Arnold Berleant (1993). 'The Aesthetic of Art and Nature', in Salim Kemal and Ivan Gaskell (eds.), *Landscape, Natural Beauty and the Arts*, Cambridge University Press, Cambridge.

Arthur Danto (1981). *The Transfiguration of the Commonplace*. Mass : Harvard University Press, Cambridge.

Christopher Peacocke (1993). *A Study of Concepts*. Cambridge University Press, Cambridge.

D. Fenner (1996). *The Aesthetic Attitude*. NJ : Humanities Press, Atlantic Highlands.

E. Bullough (1912). 'Psychical Distance as a Factor in Art as an Aesthetic Principle', *British Journal of Psychology*, vol. 5.

E. F. Carritt (1947). *An Introduction to Aesthetics*. Routledge and Kegan Paul, London.

E. Zemach (1997). *Real Beauty*. Pennsylvania State University Press, University Park.

Edmund Burke (1958). *A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful*, ed. J. T. Boulton. Routledge and Kegan Paul, London.

Frank Sibley (2001a). 'Aesthetic Judgements' in his *Approach to Aesthetics : Collected Papers and Philosophical Aesthetics.* Calrendon Press, Oxford.

—(1959). 'Aesthetic Concepts'. *Philosophical Review*, vol. 68.

—(2001b). 'Arts or the Aesthetic–Which Comes First?' in his *Approach to Aesthetics : Collected Papers and Philosophical Aesthetics.* Clarendon Press, Oxford.

George Dickie (1964). 'The Myth of the Aesthetic Attitude'. *American Philosophical Quarterly*, vol. 01.

H. P. Grice (1964). 'Some Remarks about the Senses'. *Journal of Philosophy*, vol. 6.

H. R. G. Schwyzer (1963). 'Sibley's Aesthetic Concepts'. *Philosophical Review*, vol. 72.

Holmes Rolston (1998). 'Aesthetic Experience in Forest'. *Journal of Aesthetic and Art-Criticism*, vol. 56, Issue–2.

Immanuel Kant (1987). *Critique of Judgment*, trans. W.S. Pluhar, Hackett, Indianapolis.

J. Stolnitz (1960). *Aesthetics and Philosophy of Art–Criticism*. Houghton Mifflin, New York.

John Holloway (1949). 'What are the Distinctive Features of Arguments used in Criticism of the Arts?'. *Proceedings of the Aristotelian Society*, Supp. vol. 23.

Kendall Walton (1970). 'Categories of Art'. *Philosophical Review*, vol. 79.

Monroe C. Beardsley (1970). 'The Aesthetic Point of View', in Howard Kiefer and Milton Munitz (eds.), *Perspective in Education, Religion, and the Arts*, SUNY Press, Albany. Report. in Beardley's *The Aesthetic Point of View*, Ithaca and Cornell University Press, London, 1982.

— (1962) 'On the Generality of Critical Reason', *Journal of Philosophy*, vol. 59.

R. J. Butler (1962). *Analytical Philosophy*. Oxford University Press, Oxford.

Richard Wollheim (1980). *Art and its Objects*. Cambridge University Press, Cambridge.

Robert Hoffman (1961). 'Aesthetic Argument : Interpretative and Evaluative'. *The Philosophical Quarterly*, vol. II, No. 45.

Ronald Hepburn (1966). 'Contemporary Aesthetics and the Neglect of Natural Beauty' in B. Williams and A. Montefiori (eds.), *British Analytical Philosophy*, Routledge and Kegan Paul, London.

Stephanie Ross (1998). *What Garden Mean*. University of Chicago Press, London and Chicago.

Stephen Davies (1994). *Musical Meaning and Expression*. Cornell University Press, Ithaca and London.

লিপির উৎপত্তি : প্রসঙ্গকথা

জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ*

[সারসংক্ষেপ : লিপি ছাড়া মানব সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। লিপিহীন যুগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলে। লিপি আবিষ্কারের পূর্বে ইশারা, ইঙ্গিত ও শ্রুতির উপরই মানুষ নির্ভর করতো। লিপি সৃষ্টি মানুষের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন। চিত্রলিপি থেকে ভাবলিপি ও পরবর্তীকালে শব্দলিপির উদ্ভব ঘটে। একটি বিশেষ ভাষার প্রতিটি শব্দের জন্য বিশেষ চিহ্নের ব্যবহার করা হতো। এই চিহ্নই পরবর্তীপর্যায়ে লিপি নির্দেশক চিহ্নে পরিণত হয়েছে। লিপির উৎপত্তির ক্ষেত্রে হায়রোগ্লিফিক, কিউনিফর্ম, ক্রিটান, ফিনিশিয়ান এবং আরো অনেক লিপি একেক সময় প্রথম লিপি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি লিপিধৃত হওয়ায় মানব সভ্যতা বিকশিত হয়েছে।]

মানুষের জীবনযাপনের রূপ ও প্রকৃতি বিচিত্র। সভ্যতার আদিকাল থেকে এই বিচিত্র-রূপী জীবন উপভোগের জন্য মানুষ নানাবিধ সৃষ্টিশীলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। আত্মপ্রকাশ-আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিন্তার জগতকে সমৃদ্ধ করেছে এবং তাকে স্রষ্টার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। আদি মানব পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের জন্য প্রথম যে ধ্বনি উচ্চারণ করেছিল, তাই সভ্যতার আদি শিল্প। মানুষ তার আবেগ, অনুভূতি, ভাবনা, চিন্তা, কল্পনা, জীবন-বাস্তবতা ইত্যাদি বিষয়াবলী প্রকাশ করতে চায়। সভ্যতার উষালগ্নে ভাষা প্রচলনের পূর্বে মানুষের ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যম ছিল বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি।

লিপি আবিষ্কারের পূর্বে শ্রুতি বা শোনার উপরই মানুষ নির্ভর করতো। বংশ পরম্পরায় তারা পূর্ব-পুরুষদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জীবন নির্বাহ করতো। লিপি সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। লিপি শব্দের আভিধানিক অর্থ–চিঠি, লিখন, লেখা, অক্ষর, বর্ণমালা; alphabet। উৎপত্তি শব্দের আভিধানিক অর্থ–উদ্ভব, জন্ম, আবির্ভাব, অভ্যুদয়। অর্থাৎ, লিপির উৎপত্তি বলতে, বর্ণমালার জন্ম বা অভ্যুদয় বলা যেতে পারে। মানুষের মনোভাব প্রকাশের জন্য লিখিত, খোদিত বা অঙ্কিত যেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকেই লিপি বলা হয়। লিপি শব্দের উদ্ভব হয়েছে, লিপ্ ধাতুর সঙ্গে -ই প্রত্যয় যোগ করে (লিপ+ই= লিপি)। ভারতীয় ব্যাকরণবিদগণের মতে, 'লেপন করা' থেকে 'লিপি' শব্দের উদ্ভব হয়েছে। অবশ্য, ভাষাতাত্ত্বিকরা মনে করেন, 'দিপি' শব্দ থেকে 'লিপি' শব্দের উদ্ভব হয়েছে। 'দিপি' শব্দের অর্থ, ছেদন, খণ্ডন। খরোষ্ঠী অক্ষরে 'দিপি' শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। এছাড়াও, লিপি শব্দের সমার্থক শব্দ যেমন, লিবি, লিপি, লিবী, লিপিকা, লেখা, অক্ষরসংস্থান, অক্ষরবিন্যাস, অক্ষর-রচনা প্রভৃতির ব্যবহার রয়েছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে লিপি শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে লিবি, লেখনী, মসি, বর্ণ, অক্ষর, যবনানী (যবনাদের লিপি) প্রভৃতির ব্যবহার রয়েছে (কল্পনা, ১৯৯২ : ১)।

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

লিপির উৎপত্তি নিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বিস্তর গবেষণা করেছেন। বাঙালিদের মধ্যে R.D. Banerji, *The Origin of Bengali Script* (1919) এবং, S.K. Chatterji, *The Origin and Development of the Bengali Language* (1926) গ্রন্থে বাংলা লিপির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা, *প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা* (সমাজদার, অনু. ১৯৮৯), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস* (২০১২), প্রমুখ লিপির উৎপত্তি নিয়ে কাজ করেছেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষকালে লিপির উৎপত্তি নিয়ে আগ্রহ ও গবেষণা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। লিপি সৃষ্টির সাথে মানব সভ্যতা ও বিজ্ঞানের বিষয় জড়িত। বর্তমানকালের নব নব আবিষ্কার লিপির ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। লিপির উদ্ভব, লিখন প্রণালী ইত্যাদি বিষয়াবলী মানব মনন-বিকাশের সাথে সম্পর্কিত। লিপি নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও লিপির ইতিহাস নিয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। এ প্রবন্ধে, লিপির উৎপত্তি অনুসন্ধান করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

২.

মানব সভ্যতার ইতিহাসে লিপি আবিষ্কার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। লিপির উদ্ভব একদিনে হয়নি। হাজার হাজার বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে মানুষ লিপি আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ গুহার দেয়ালে বা প্রস্তর ফলকে কোনো বস্তু বা ঘটনা দেখলে তার ছবি এঁকে রাখত (কাইউম, ২০০০ : ১৫১)। মানুষ বাগ্‌যন্ত্র নিয়ে পৃথিবীতে এলেও এর সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে বহুকাল সময় লেগেছিল। প্রাথমিকভাবে অঙ্গভঙ্গি, আকার-ইঙ্গিতই ছিল মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম। বহুকালের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে মানুষ ধ্বনি উচ্চারণ করতে পেরেছে। তারপর সেই ধ্বনিকে বিভিন্ন বস্তু ও ভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে, ভাষা ও লিপি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে (মুজাম্মিল, ২০০০ : ১৪৩)। লিপি হলো ভাষা ধরে রাখার প্রতীক, চিহ্ন, আধার বা পাত্র। বাগ্‌যন্ত্র সৃষ্ট ধ্বনি দেখা যায় না, শোনা যায়। তেমনিভাবে মানব মনের অব্যক্ত ভাব দেখা যায় না; অব্যক্ত ভাব ধ্বনির মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। প্রকাশিত ভাব ধরে রাখার জন্য, লিপির প্রয়োজন হয়।

ভাষা মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করেছে। অর্থপূর্ণ ভাষা ছাড়া মানব সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। মানুষের যত সৃষ্টি, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো, ভাষা ও লিপি সৃষ্টি। পৃথিবীতে যখন মানুষ ছিল না, তখন ভাষা কিংবা লিপি কিছুই ছিল না। ভূ-তাত্ত্বিক সময়কালের পঞ্চম বিভাগ (era) সিনোযোয়িক (Cenozoic, Greek. kajnos 'নতুন'+zoe 'জীবন') যুগের প্রায় ৭০ মিলিয়ন বছর পূর্বে প্যালিওসিন উপযুগে বৃক্ষবাসী (arboreal) প্রাচীন প্রসিমিয়ান (Prosimian) প্রাইমেট থেকে ধীরে ধীরে ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাণের বিবর্তন হতে থাকে। ইউসিন যুগ (৫৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে) ও অলিগোসিন (৪৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে) উপযুগের মধ্যবর্তীকালে প্রসিমিয়ান থেকে মানব ও হোমিনয়েড প্রাণীর বিকাশ ঘটে এবং এই হোমিনয়েড থেকে পরবর্তীসময়ে মায়োসিন উপযুগে পর্যায়ক্রমে অলিগোপিথেকাস, ড্রায়োপিথেকাস ও হোমিনিড প্রজাতির রামাপিথেকাস, এবং অস্ট্রেলোপিথেকাস নামক প্রাণীর বিকাশ ঘটে। যদিও অস্ট্রেলোপিথেকাস প্রাণীকে বিজ্ঞানীরা আধা-মানব এবং আধা-পঞ্জিডি বলে মনে করেন। অস্ট্রেলোপিথেকাস থেকে হোমো ইরেক্টাসের উদ্ভব ঘটে। প্রায় ৭০ হাজার বছর পূর্বে হোমো ইরেক্টাস থেকে নিয়াণ্ডারথাল-এর

বিকাশ ঘটে, এবং আনুমানিক ৩৫ হাজার বছর আগে হোমো ইরেক্টাস থেকে আধুনিক হোমো স্যাপিয়েন্সের (Homo Sapiens) উদ্ভব ঘটে, যাদের মগজের পরিমাণ প্রায় ১২০০-১৬০০ সিসি এবং অন্যান্য প্রাণী থেকে গুণগতভাবে উন্নততর। তাদের স্বাধীন হস্তচালন ও দ্বি-পদচারণ ক্ষমতা এবং কণ্ঠনালিতে ফেরিন্‌জিয়েল গহবরের (Pharyngeal Cavity) উপস্থিতি আছে, যা অন্য কোনো প্রাণীর ছিল না। শ্বাসনালি ও খাদ্যনালির সংযুক্তির কারণে মানুষ বিভিন্ন রকমের স্বর উচ্চারণ ও উৎসরণে সক্ষমতা রাখে (আলা উদ্দিন, শায়লা, ২০১৬ : ৬২–৬৩)। মোটকথা, বাগ্‌যন্ত্র থাকার জন্যই মানুষ কথা বলতে পারে। পাশাপাশি মানুষের চিন্তা শক্তি আছে, যা অন্যান্য প্রাণী থেকে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের মনে নানারূপ ভাবের উদয় হলেও প্রকাশ করার ক্ষমতা ছিল না। মানুষের মনের ভাব ব্যক্ত করার আগ্রহের কারণেই বাগ্‌যন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল। বাগ্‌যন্ত্র উচ্চারিত ধ্বনির সাহায্যে মানুষ কাছাকাছি বা দূরের ব্যক্তির নিকটও মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা করেছে।

৩.

প্রত্যেক শব্দের সাথে প্রকাশ্যভাবেই থাকুক বা অপ্রকাশ্যভাবেই থাকুক বাক্য জড়িত থাকে (নলিনী, ১৯৮৫ : ৬২০–২১)। মানুষ শুধুমাত্র জৈবিক তৃষ্ণা মেটানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, প্রকৃতির উপর ভাগ্যকে সমর্পণ না করে, মেধা ও মনন কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কারের চেষ্টা করেছে। এই আবিষ্কার তৃষ্ণা তাকে স্রষ্টার আসনে ঠাঁই দিয়েছে। যে কোনো সৃষ্টির বিষয়গুলো মানুষ চিত্র চিহ্ন, প্রতীক বা লিপি ফলকের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। প্রাচীনকালে কখন কোথায় কীভাবে প্রথম লিপির উদ্ভব হয়েছিল, তা বলা না গেলেও, প্রায় দশ হাজার বছরেরও পূর্বে মানুষ প্রস্তর ফলক ও গুহার গায়ে নানা চিত্র অঙ্কিত বা খোদিত করে রাখতো।



(চিত্র-১)

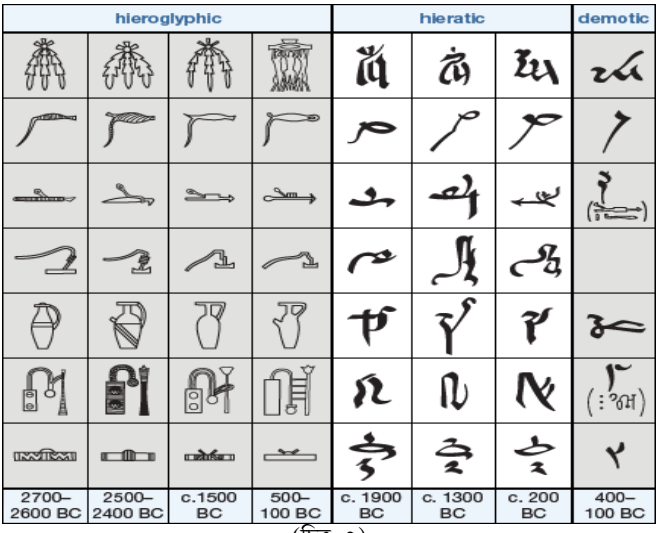
উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসী এবং প্রাচীন মিশরবাসীদের মধ্যে চিত্র লিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল। বর্ণের ব্যবহার যুক্ত আধুনিক লিখন প্রণালী তখনও আবিষ্কৃত না হওয়ায় ধ্বনি-

বিশ্লেষণের বিষয়টিও অনুপস্থিত ছিল। চিত্রলিপি পদ্ধতিতে প্রতিটি চিত্র কোনো বস্তুর প্রতীকরূপে অংকিত হতো। পরপর অংকিত কতকগুলি বস্তুর চিত্রের সাহায্যে একটি বক্তব্য বা ভাব প্রকাশিত হতো। মানুষ তার কাজের বৃত্তান্তকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য গুহাচিত্র অঙ্কন করেছে। গুহাচিত্রগুলোর বেশিরভাগই পশু বা পশু শিকার সংক্রান্ত (চিত্র-১)। গুহাচিত্রগুলো আদিম মানুষের মনের কথারই দৃশ্যরূপ হয়ে বিরাজ করছে। ফ্রান্স, স্পেন, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, সাইবেরিয়া এবং ভারতে গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।



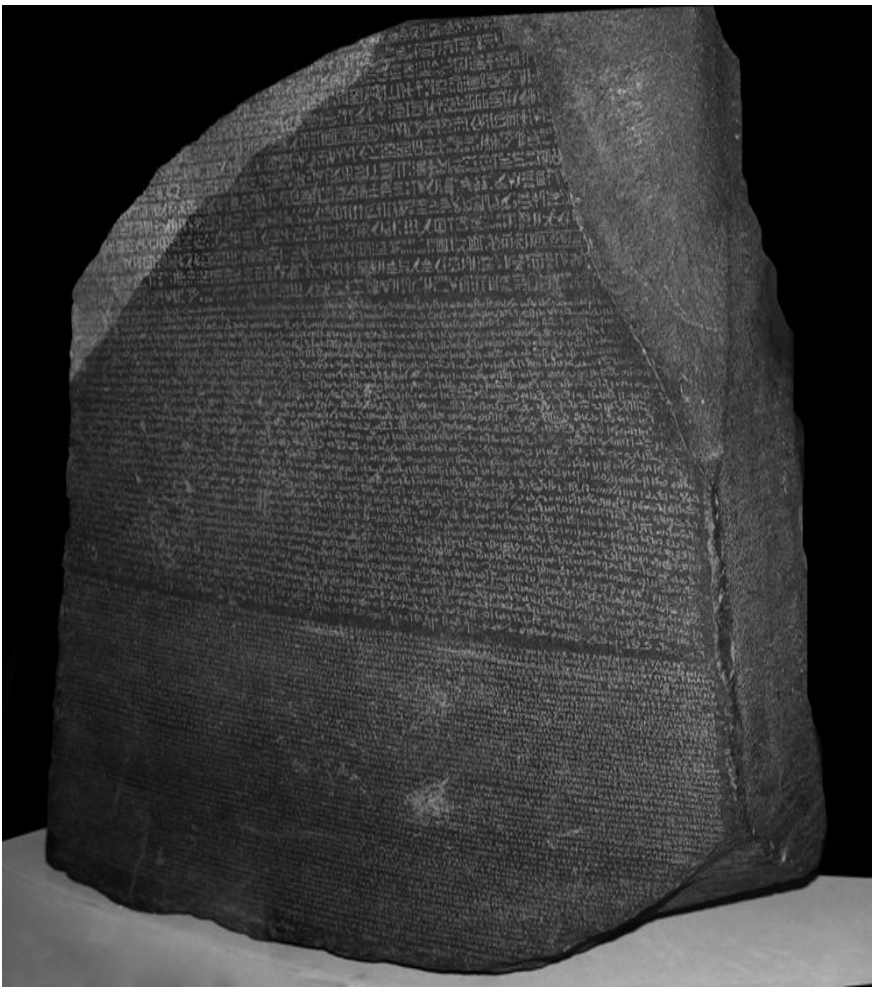
(চিত্র-২)

চিত্র-২ একটি আবেদনপত্র। চিত্রটি বহুকালের পুরাতন নয়। কয়েকশ বছর পূর্বে আমেরিকার সাতটি রেড ইন্ডিয়ান উপজাতি একমত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে আবেদনপত্রটি পাঠায়। চিত্রে প্রতিটি উপজাতির নিজ নিজ টোটেম-প্রতীক এঁকে চোখ ও অন্তরের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। উপজাতীয়দের মুখপাত্র হিসেবে সারস পাখি অঙ্কিত টোটেম জাতিকে দেখানো হয়েছে। আবেদনপত্রে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে বিশেষ এক এলাকায় মাছ ধরার অধিকারের বিষয় বর্ণিত হয়েছে (মোর্তাজা, ২০০৩ : ৩৫)। চিত্র-৩ এ প্রাচীন মিশরীয় হায়রোগ্লিফিক, হিয়েরেটিক ও ডিমোটিক লিপি দেখানো হয়েছে।



(চিত্র–৩)

মিশরীয় হায়রোগ্লিফিক বা চিত্রলিপির ব্যবহার মিশরীয় ধর্মযাজকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রিক ভাষা-ভাষীরা এর নাম দেন হায়রোগ্লিফিক বা পবিত্র ভাষা বা দেব ভাষা। হায়রোগ্লিফিক থেকে পরবর্তীকালে হিয়েরেটিক লিপির উদ্ভব হয় এবং পরবর্তীপর্যায়ে সর্বসাধারণের ব্যবহার উপযোগী ডিমোটিক লিপির উদ্ভব হয়। উল্লেখ্য, ডিমোটিক পর্যায়ে চিত্রলিপি চিহ্নলিপিতে রূপান্তরিত হয় (মোর্তাজা, ২০০৩ : ৫৬)। ১৯৫ খ্রিষ্টাব্দে রোজেটা পাথরে (চিত্র-৪) লেখা গ্রিসের রাজা পঞ্চম টলেমির প্রশস্তি রচনা উদ্ধার করা হয়েছে।



(চিত্র-৪)

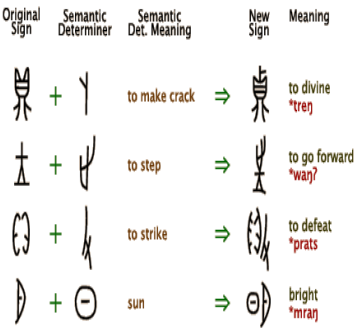
উপরে হায়রোগ্লিফিক, মাঝে ডিমোটিক ও নিচে গ্রিক প্রশস্তি রচনার কারণ হলো, মিশরীয় হায়রোগ্লিফিক তখন ছিল দেবাক্ষর; প্রশস্তিপত্র দেবাক্ষরে লিখে পুরোহিতরা শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। শাসকবৃন্দ গ্রিক হওয়ায় গ্রিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে এবং তৎকালীন সাধারণ

মিশরীয়দের জন্য ডিমোটিক লিপি ব্যবহৃত হয়েছে (লুৎফর, ২০০৫ : ৩৯)। 'রোজেটা' নামক স্থানে শিলা ফলকটি আবিষ্কৃত হয় বলে Rosetta stone নামে শিলা ফলকটি আখ্যায়িত। ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি বীর নেপোলিয়ান মিশর জয়ের পরে শিলাফলকটি আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীপর্যায়ে, মিশর ইংরেজ শাকদের অধীন হয়। বর্তমানে শিলাফলকটি বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে (মোর্তাজা, ২০০৩ : ৬৬)। ভাষাবিজ্ঞানি ফ্রাঁসোয়া শ্যাম্পোলিয়া মিসরের হায়রোগ্লিফিক লিপির পাঠোদ্ধার করেছিলেন। গ্রিক লিপির পাশাপাশি হায়রোগ্লিফিক লিপি থাকায়, গ্রিক লিপির সাথে মিলিয়ে চিহ্ন থেকে রানী ক্লিওপেট্রার নাম পড়তে পেরেছিলেন এবং 'রোজেটা' পাথরের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছিল।

৪.

দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের হিসাব, রাজার নির্দেশ, ঘটনার বিবরণ, কর্তব্য নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ের জন্য প্রাচীন চীন ও পেরু দেশে গ্রন্থিলিপির (Knot Writing) প্রচলন হয়। দড়িতে গিঁট দিয়ে গ্রন্থিলিপি তৈরি করা হতো। দড়ির রকম ও রং, গিঁটের ধরন ও সংখ্যা দেখে কর্তার মনোভাব বুঝতে হতো। যেমন, লাল বর্ণ হলে যুদ্ধ বা স্বর্ণ নির্দেশ করতো, সাদা হলে শান্তি বা রৌপ্য নির্দেশ করতো। পেরুতে গ্রন্থিলিপির নাম কুই পাস বা কুইপু (Quipu বা Quipu Writing) (মুজাম্মিল, ২০০০ : ১৪৪)। উল্লেখযোগ্য, চীনবাসীরা গ্রন্থিলিপি ত্যাগ করে পূর্ববর্তী চিত্রলিপি গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে, ইউফ্রেটিস উপত্যকার আদি বাণমুখ লিখন প্রণালী বা মেক্সিকোর পূর্বপ্রান্তের আদি অধিবাসী এজ্‌টেক্‌দের লিখন প্রণালীতে এক একটি বাক্যের জন্য এক একটি চিত্র অঙ্কিত না হয়ে, একটি শব্দের জন্য এক একটি চিত্রের ব্যবহার হতো। প্রাথমিক অবস্থায় বস্তুগুলির যথার্থ প্রকৃতি অঙ্কন করা হলেও, পরবর্তীকালে চিত্রগুলি পরিবর্তিত হয়ে সংকেতে রূপ নেয়ায় তা শিক্ষা সাপেক্ষ হয়।

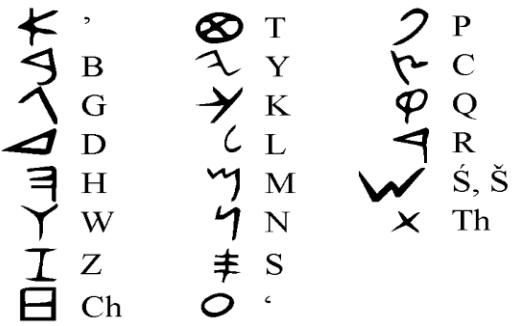
খ্রিষ্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দের শেষার্ধে, শাং যুগে চীনে প্রাচীনতম লেখনীর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় একই সময়ে সিমাইট জাতি মিশরবাসীদের কাছ থেকে লিপি-বিদ্যা গ্রহণ করে। চীনা শব্দগুলি এখনও ধ্বনিতে বিশ্লিষ্ট হয়নি। চীনাদের প্রত্যেক শব্দই একাক্ষরিক (Monosyllabic)। তাদের লিখন প্রণালীতে প্রতিটি একাক্ষরিক শব্দের জন্য এক একটি পৃথক পৃথক সংকেত ব্যবহৃত হয়। কোনো শব্দের আকৃতি দেখলে প্রথমটির যে অর্থ প্রকাশ পায় তা অক্ষুন্ন রেখে, পরবর্তী বিভিন্ন অর্থ বোঝানোর জন্য সেই সংকেতের সাথে খাড়া, বাঁকা, সমতল, সোজা, তির্যক নানা প্রকারের রেখা সংযুক্ত করা হয়। চিত্র-৫ এ চীনা লিপির উদাহরণ দেখানো হয়েছে।





(চিত্র-৫)

চীনে নানা ভাষা প্রচলিত থাকলেও এক ধরনের লিপি দ্বারা সব ভাষাই লিখিত হয়। সংকেতগুলি কোনো নির্দিষ্ট ধ্বনিসমূহের প্রতিনিধি নয়। সংকেতগুলি চীন দেশের নানা ভাষার ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সাধারণ প্রতিরূপ। যেমন, বিড়াল বাচক চিহ্ন দেখলে বাংলায় বিড়াল, হিন্দি ও উর্দুতে বিল্লি, মারাঠীতে মাঞ্জার, গুজরাতিতে বিলাড়ি, সংস্কৃতে মার্জার, ফারসিতে গুর্বা, ইংরেজিতে ক্যাট, ল্যাটিনে ফেলিস্ ইত্যাদি। অর্থাৎ, এই লিপি বক্তার মনোভাবের চিত্র, ভাষার প্রতিনিধি নয়। বৃটেন, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল ও ইটালীতে রোমান সংখ্যাবাচক একই অক্ষর ব্যবহৃত হলেও প্রত্যেক ভাষাতে ভিন্ন ভিন্ন নাম লক্ষণীয়। চীনা লিপি ভাষা-নিরপেক্ষ হওয়ায় বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য। একে ভাবলিপি (Ideograph) বলা যেতে পারে। চিত্র লিখন হতে বা চিত্র হতে উৎপন্ন সাংকেতিক প্রণালী হতে একাক্ষরিক লিখন প্রণালী এবং একাক্ষরিক লিখন প্রণালী হতে বর্ণমূলক লিখন প্রণালীর উৎপত্তি (নলিনী, ১৯৮৫ : ৬২২-২৩)। বর্ণলিপিতে পৌঁছাতে অনেকগুলো স্তর পার হতে হয়েছে। যেমন, গুহাগাত্র ও প্রস্তর ফলক লিপি, চিত্রলিপি, ভাবলিপি, স্বরলিপি ইত্যাদি (কল্পনা, ১৯৯২ : ৩)। এভাবেই লিপি সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ফিনিসীয় ২২টি বর্ণ (চিত্র-৬) হতে প্রায় সমস্ত লিপিই উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে করা হয়।



(চিত্র-৬)

ফিনিসীয় ২২টি লিপি হতে আরবি, গ্রিক, ল্যাটিন, সিরিলিক ও রুনিক লিপির উদ্ভবের বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে :

Sl.	Reconstruction	IPA	Phoenician	Hebrew	Arabic	Greek	Latin	Cyrillic	Runic
1	*ʾalpu* "ox"	/ʔ/	*ʾālep*	א *ʾāleph*	ا *ʾalif*	A alpha	A	A azŭ	ᚨ *ansuz
2	*baytu* "house"	/b/	*bēt*	ב *bēṯ*	ب *bāʾ*	B bēta	B	В vědě, Б buky	ᛒ *berkanan
3	*gamlu* "throwstick"	/g/	*gīmel*	ג *gīmel*	ج *jīm*	Γ gamma	C, G	Г glagoli	ᚲ *kaunan
4	*daltu* "door" / *diggu* "fish"	/d/, /ð/	*dāleṯ*	ד *dāleṯ*	د *dāl*, ذ *ḏāl*	Δ delta	D	Д dobro	
5	*haw* "window" / *hallu* "jubilation"	/h/	*hē*	ה *hē*	ه *hāʾ*	E epsilon	E	E ye, Є estĭ	

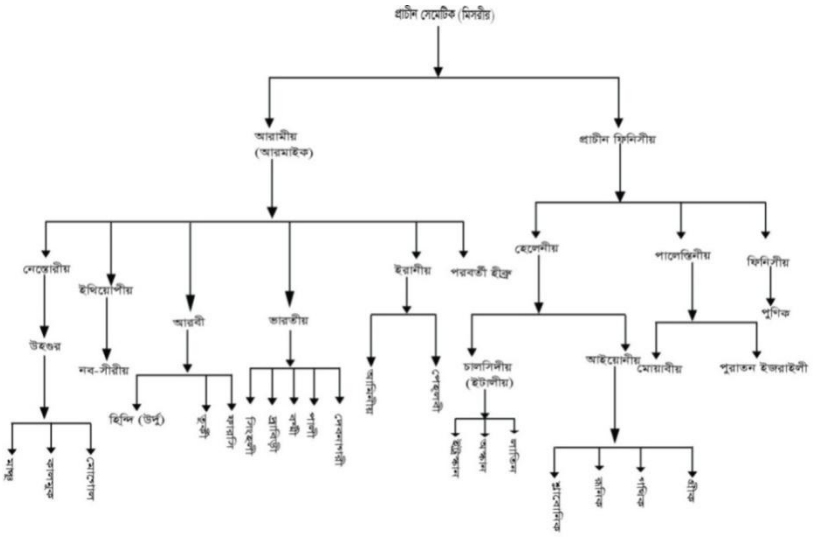
6	*wāwu* "hook"	/β/ or /w/	*wāw*	*vāv*	*wāw*	F digamma, Y upsilon	F, V, Y	Oy / ukŭ → У	Ꙋ *ûruz / *ûram
7	*zaynu* "weapon" / *ziqqu* "manacle"	/z/	*zayin*	*zayin*	*zayn or zāy*	Z zēta	Z	/ З zemlya	
8	*ḥaytu* "thread" / "fence"?	/ħ/, /x/	*ḥēt*	*ḥēṯ*	*ḥā', ḫā'*	H ēta	H	И iže	Ꙉ *haglaz
9	*ṭaytu* "wheel"	/tˢ/, /θˢ/	*ṭēt*	*ṭēṯ*	*ṭā', ẓā'*	Θ thēta		Ѳ fita	
10	*yadu* "arm"	/j/	*yōd*	*yōḏ*	*yā'*	I iota	I	I ižei	І *isaz
11	*kapu* "hand"	/k/	*kap*	*kāf*	*kāf*	K kappa	K	К kako	
12	*lamdu* "goad"	/l/	*lāmed*	*lāmeḏ*	*lām*	Λ lambda	L	Л lyudiye	ᛚ *laguz / *laukaz
13	*mayim* "waters"	/m/	*mēm*	*mēm*	*mīm*	M mu	M	М myslite	
14	*naḥšu* "snake" / *nunu* "fish"	/n/	*nun*	*nun*	*nūn*	N nu	N	Н naší	
15	*samku* "support" / "fish" ?	/s/	*sāmek*	*sāmeḵ*		Ξ ksi, (X ksi)	(X)	Ѯ ksi, (X xěrŭ)	
16	*ʿaynu* "eye"	/ʕ/, /ɣ/	*ʿayin*	*ʿayin*	*ʿayn, ġayn*	O omikron	O	О onŭ	
17	*pu* "mouth" / *piʾtu* "corner"	/p/	*pē*	*pē*	*fā'*	Π pi	P	П pokoi	
18	*ṣadu* "plant"	/sˢ/, /tˢ/	ṣādē	*ṣāḏi*	*ṣād, ḍād*	Ϻ san, (Ϡ sampi)		Ц tsi, Ч črvĭ	
19	*qupu* "Copper"?	/kˢ/ or /q/	*qōp*	*qōf*	*qāf*	Ϙ koppa	Q	Ҁ koppa	
20	*raʾsu* "head"	/r/ or /ɾ/	*rēš*	*rēš*	*rā'*	P rho	R	Р rĭtsi	ᚱ *raidô
21	*šinnu* "tooth" / *šimš* "sun"	/ʃ/, /ɬ/	*šin*	*šin/śin*	*sīn, šīn*	Σ sigma, ς stigma	S	С slovo, Ш ša, Щ šta, / S dzělo	ᛊ *sowilô
22	*tawu* "mark"	/t/, /θ/	*tāw*	*tāv*	*tā', ṯā'*	T tau	T	Т tvrdo	ᛏ *tîwaz

(চিত্র-৭)

চিত্র-৭ এর তৃতীয় কলামে IPA লিপির ব্যবহার করা হয়েছে। IPA হলো আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিমালা (International phonetic Alphabet)। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি ধ্বনিতাত্ত্বিক পল প্যাসীর নেতৃত্বে কয়েকজন ব্রিটিশ ও ফরাসি ধ্বনিতাত্ত্বিক আন্তর্জাতিক ধ্বনিমালা সংঘ

(International Phonetic Alphabet Association) গঠন করেন। মূলত, গ্রিক ও ল্যাটিন বর্ণমালার সহায়তা নিয়ে আন্তর্জাতিক ধ্বনিলিপিমালা নির্ধারণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো, পৃথিবীর সব ভাষা একই লিপিমালার অধীনে নিয়ে আসা। তার ফলে, পৃথিবীর যে কোনো ভাষা যে কোনো ভাষাভাষীর মানুষ পড়তে ও বুঝতে পারবেন। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমালায় একটি ধ্বনির জন্য একটি মাত্র চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। কোনো যুক্ত চিহ্ন নেই। ব্যঞ্জনধ্বনি ও স্বরধ্বনির জন্য মোট বর্ণসংখ্যা আছে ১০৭টি, জ্ঞাপকচিহ্ন (Ciacritics) আছে ৩১টি এবং অতিরিক্ত ধ্বনিমূল বোঝানোর জন্য ১৯টি অতিরিক্ত চিহ্ন আছে। এগুলো দিয়ে দৈর্ঘ্য, প্রস্বর, জোর ও স্বরভঙ্গি জ্ঞাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক ধ্বনিবর্ণমালার গুরুত্ব ও প্রভাব বিশেষ কোনো ভাষার জন্য উল্লেখযোগ্য না হলেও, কেতাবি অর্থে এ লিপির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

বর্ণমালার উদ্ভব সম্পর্কে বর্তমানকাল পর্যন্ত যা জানা যায় তা হলো, খ্রিস্টের জন্মের সহস্র বৎসরেরও পূর্বে ফিনিসীয় বর্ণমালা হতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাষার বর্ণমালার উৎপত্তি হয়। লিপির বংশ তালিকা (চিত্র-৮) উল্লেখ করা হলো :



(চিত্র-৮)

ইউরোপীয় পণ্ডিতরা প্রতীচ্য ও প্রাচ্য বর্ণমালার মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য উল্লেখ করেছেন :

- প্রতীচ্য বর্ণমালায় অর্থাৎ, গ্রিক, ইটালীয় ইত্যাদি বর্ণমালায়, ব্যঞ্জনধ্বনি ও স্বরধ্বনির প্রতিনিধি স্বরূপ যে যে লিপি থাকে, তা গোটা গোটা আকারের হয় এবং ব্যঞ্জন বর্ণের সম্পূর্ণ অবয়ব থাকে।
- প্রাচ্য বর্ণমালায় অর্থাৎ, হিব্রু, আরবি, নাগরী ইত্যাদি বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণগুলি সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয় এবং স্বরের চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। উল্লেখযোগ্য, কখনও কখনও স্বরের চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। যেমন– বাংলা 'সাবিক', লিখতে 'স' 'ব' 'ক' এই

ব্যঞ্জনবর্ণগুলি সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয়; কিন্তু 'আ', 'ই' স্বরবর্ণের চিহ্ন লিখিত হয় এবং 'বল' লিখতে 'ব' 'ল' ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পূর্ণ লিখিত হয়; স্বরবর্ণের চিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি। এটি সেমেটিক লিখনের অনুকরণ।

বর্ণমূলক লিপিসমূহ আবিষ্কৃত হওয়ার ক্রম নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যায় :

ভাব প্রকাশক লিপি

- একটি ঘটনার সমগ্র ভাবের চিত্র; যেমন, আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।
- পৃথক বস্তু হতে উৎপন্ন ভাবের চিত্র (Ideograph); যেমন– মেক্সিকো এবং মিসরের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

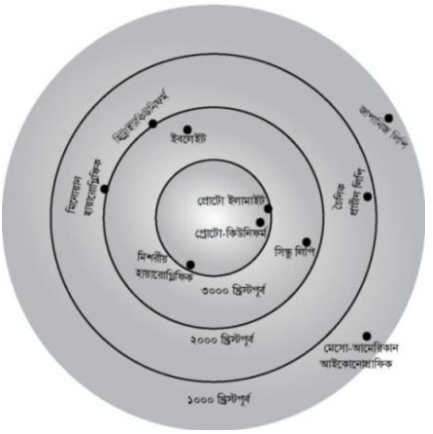
ধ্বনি-প্রকাশক লিপি

- শব্দলিপি (Phonograph) অর্থাৎ, একই চিত্র দ্বারা বহু সমোচ্চারণ শব্দের লিখন; যেমন– চীনের আধুনিক লিপি ও প্রাচীন মিসরের লিপি।
- একটি পদ বা পদাংশের (Syllable-এর) সংকেত দ্বারা লিখনের প্রণালি; যেমন– জাপানী ও সেমেটিক বাণমুখ লিখন প্রণালি।
- বর্ণমূলক লিপির, একটি পদ বা পদাংশের ধ্বনির সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ হয় না, কেবল একটি পদের প্রথম ব্যঞ্জন প্রকাশিত হয়; স্বরের কোনো বিশিষ্ট অবয়ব নেই; যেমন– সেমেটিক লিপি।
- বিশুদ্ধ বর্ণমালামূলক লিখন প্রণালি, যাতে প্রত্যেক ধ্বনি প্রকাশের জন্য পৃথক পৃথক চিহ্ন আছে; যেমন– গ্রিক বর্ণমালায়, ইটালীয় বর্ণমালায়, প্রাচীনকালের মিসরীয় বর্ণমালায় এবং পারস্যদেশের বাণমুখ লিখন প্রণালীতে (নলিনী, ১৯৮৫ : ৬২৫–২৬)।

৫.

একটি ভাষা একটি জনপদে হাজার হাজার বৎসর শুধু মুখের ভাষা হিসেবে প্রচলিত থাকতে পারে। এই হাজার হাজার বৎসরে ভাষা শৃঙ্খলায় নানাবিধ পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। কোনো কোনো ভাষা মুখের ভাষা হিসেবে বহুকাল প্রচলিত থাকার পর, কোনো এক সময়ে, ভাষাভাষীর সংখ্যার অভাবের কারণে ধীরে ধীরে মৃত ভাষায় পরিণত হতে পারে। আবার কোনো ভাষা লিপিধৃত হলে, সে ভাষা জীবন্ত থাকতে পারে। যেমন, হিব্রু মৃত ভাষা। ইহুদী রাষ্ট্রের প্রভাব ও ইহুদী ধর্মের কারণে হিব্রুর পুনর্জন্ম ঘটেছে। ভাষা মানব সমাজের সাথে সংজ্ঞাপনের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম এবং একই সাথে সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাহন। মানব ইতিহাসের অতীতকে বর্তমান, আর বর্তমানকে ভবিষ্যতে উপস্থাপন করবার একমাত্র ও উন্নততম মাধ্যম ভাষা (আলা উদ্দিন, শায়লা, ২০১৫ : ৭৩)। লিপির মাধ্যমে ভাষাকে ধরে রাখতে না পারলে, ভাষা তার বৈজ্ঞানিক গ্রহণযোগ্যতা হারাতো। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিকশিত মৌখিক ভাষার স্বতন্ত্র বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও জনপদে লিখন পদ্ধতি গড়ে ওঠা সত্ত্বেও, লিখন পদ্ধতির ক্রমবিকাশ যথেষ্ট নমনীয় ও স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এর ফলে, বিভিন্ন ভাষার লিখন পদ্ধতি স্বতন্ত্র ও

নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। লিখন-পদ্ধতির ক্রম নিম্নলিখিভাবে বর্ণনা করা যায় :

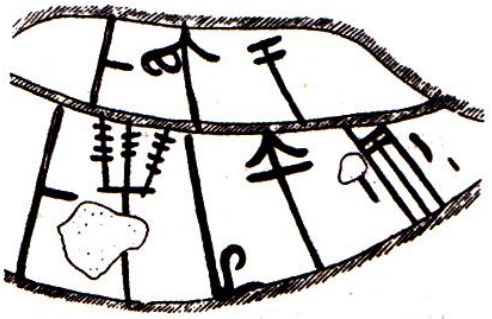


(চিত্র-৯)

Ignace Jay Gelb এর 'Study of Writing' অনুযায়ী, প্রাথমিক পর্যায়ের লিখন পদ্ধতিসমূহের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিন্যাস থেকে বোঝা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় সহস্রাব্দের শুরুর দিকেই লেখার ধারণাটি মেসোপটেমিয়া ও মিশর থেকে উদ্ভূত হয়ে ক্রমেই বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আদি কীলকাক্ষর বা Proto-cuneiform পদ্ধতি চালু হওয়ার পর, স্বল্পকালের জন্য, ইরানীয় মালভূমির বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এর ব্যবহার শুরু হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর সিরিয়ার এবলা বা ইবলেইট থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য, ইবলেইট হলো অধুনালুপ্ত সেমিটিক ভাষা। খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় সহস্রাব্দে উত্তর সিরিয়ার জনগোষ্ঠী সেমিটিক ভাষা ব্যবহার করতো। প্রাচীন শহর ইবলার নামানুসারে এ ভাষার নামকরণ করা হয়। ইবলা বর্তমান সিরিয়ার পশ্চিমাংশে অবস্থিত। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম সহস্রাব্দের দিকে মেসো-আমেরিকায় লেখনীর প্রমাণ পাওয়া যায় (Gelb, 1952 : 212-20)। মেসো-আমেরিকা হলো, মধ্য মেক্সিকো থেকে হণ্ডুরাস এবং নিকারাগুয়া অঞ্চল ও সাংস্কৃতিক এলাকা।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় থেকে ২য় সহস্রাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে Crete Minoan লেখনী পদ্ধতি শুরু হয়। সেকালের কীলকলিপি বা Cuneiform লিখন পদ্ধতি উত্তরের আনাতোলিয়া প্রদেশেও পাওয়া যায়। ক্রিট (Crete) গ্রিসের বৃহত্তম দ্বীপ। রাজধানী কানিয়া (Canea) বা কানডিয়া (Candia)। ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশে মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এর অবস্থান। পূর্ব-পশ্চিম দিকে প্রায় ১৬০ মাইল বিস্তৃত। পৌরাণিক কাহিনীর রাজার (Minos) নামানুসারে পরিচিত ক্রিটের প্রাচীন মিনোয়ান (Minoan) সভ্যতা বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম। ক্রিটে তিন স্তরের ভাবলিপির প্রচলন ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ২১০০-১৫৮০ পর্যন্ত হায়রোগ্লিফিক লিপির প্রচলন ছিল এবং খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৫০-১৪০০ পর্যন্ত রৈখিকলিপি-এ (Linear script-A)-এর প্রচলন ছিল। সর্বশেষ, খ্রিষ্টপূর্ব ১৪৫০-১২০০ পর্যন্ত রৈখিকলিপি-বি (Linear Script-B)-এর প্রচলন ছিল। এই তিন ধরনের লিপি ক্রিটানলিপির তিনটি স্তরকেই নির্দেশ

করে (Hrozny, 1953 : 199)। একটি বড়ো পাত্রে লিখিত (চিত্র-১০) ক্রিট লিপির উদাহরণ দেখানো হলো :



(চিত্র-১০)

প্রথম চরণের পাঠ নিম্নরূপ :

 = ta
 = ya
 = na, n

অর্থাৎ, ta-yâ-n(a).

প্রথম ও তৃতীয় চিহ্ন সাইপ্রিয়ান (Cyprian) চিহ্ন এবং মাঝের চিহ্নটি হায়রোগ্লিফিক চিহ্ন প্রভাবিত।

দ্বিতীয় চরণের পাঠ :

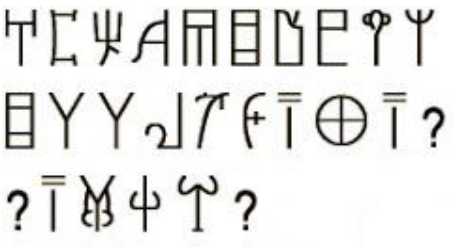
 = ta, t
 = ha, h
 = b, ba
 = yâ

অর্থাৎ t(a)-ha-ba-yâ.

প্রথম চিহ্ন সাইপ্রিয়ান এবং দ্বিতীয় চিহ্ন সাবীয় (sabacan) চিহ্ন প্রভাবিত। তৃতীয় চিহ্ন মিশরীয় পায়ের চিহ্ন অনুরূপ এবং চতুর্থ চিহ্ন প্রথম চরণের দ্বিতীয় চিহ্নের রূপভেদ। পাঠটির শেষে কিছু সমাপ্তিনির্দেশক চিহ্ন রয়েছে। এরূপ চিহ্ন হায়রোগ্লিফিক-'হিট্টাইট', প্রোটো-ইন্ডিয়ান, ব্যাবিলনীয়-কিউনিফর্ম লিপিতেও পাওয়া যায়। এর দ্বারা বিরাট গৃহ বা প্রাসাদ বোঝানো হয়।

ড. বেডরিচ রোজনি (Dr. Bedrich Hrozny) Tayan(a) শব্দটিকে কিউনিফর্ম-হিট্টাইট ভাষার ক্রিয়ারূপ tai-, te-, থেকে উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করেন। যার অর্থ, রাখা বা স্থাপন করা। ক্রিটান লিপিতে 'রাখা হয়েছে', 'উৎসর্গ করা হয়েছে' এমন শব্দ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শব্দ T(a)habaya ক্রিটীয় বা প্রাক হেলেনীয় ধরনের শহরের নাম বলে ধরেছেন। রোজনির মতে,

শব্দটি 'থিবিস' (Thebes) নির্দেশক। ক্রিটিয় Thabaya শব্দটি অনুসর্গ/ai(a) যোগে সম্ভবত, বহুবচনাত্মক রূপ নিয়েছে। শব্দ দুটির পাঠ হলো– Offering of the palace of the city of Thebes. ইলিউসিসের মন্দিরে এই পাত্রে মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে পূজা নিবেদন করা হত। এ কারণে পাত্রের এই নাম (মুজাম্মিল, ২০০০ : ১৬৫-৬৬)। ক্রিট লিপির Linear Script-A (চিত্র-১১) এবং Linear Script-B (চিত্র-১২)-এর উদাহরণ দেখানো হলো :



(চিত্র-১১)



(চিত্র-১২)

মনে করা হয়, গ্রিক লিপি লিনিয়ার লিপির তৃতীয় স্তরের। অর্থাৎ, পরিবর্তনের ধারায় লিনিয়ার লিপি পরিবর্তিত হয়ে তৃতীয় স্তরে এসে গ্রিক লিপিতে পরিণত হয়েছে। অ্যালিস কোবার লিনিয়ার বি লিপির গাঠনিক বিশ্লেষণের দিকে নজর দিয়েছিলেন। কোবারের গাঠনিক বিশ্লেষণের ধারণাকে অবলম্বন করে স্থপতি অ্যালিস প্রাচীন গ্রিক লিপির পাঠোদ্ধার করেছিলেন।

৬.

মানব সভ্যতা, শাসন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সামাজিক রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি ইত্যাদির সাথে লিপির সম্পর্ক বিদ্যমান। সেজন্য, সভ্যতার প্রাচীন পর্বের বিষয়াবলি লিপির আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা প্রাচীন ভারতীয় লিপি-বিজ্ঞানের অতীত ইতিহাসকে উন্মোচিত করেছে। ইউরোপীয় মনীষীরাই প্রাচীন ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধার করেন। এক্ষেত্রে, প্রিন্সেফ এবং অন্যান্য পণ্ডিত কর্তৃক ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপির পাঠোদ্ধার প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দুর্লভ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত (গৌরীশঙ্কর, ১৯৮৯ : উপক্রমণিকা)। আমরা লক্ষ করি, খ্রিস্টের জন্মের চার হাজার বৎসর পূর্বে মিশর, বাবিরুস (Babylon) ও আসুর (Assyria) দেশে তামার নির্মিত অস্ত্রের ব্যবহার ছিল। খ্রিস্টের জন্মের তিন হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড়রা বাবিরুষ দখল করে বাবিরুষ ও আসুরের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। বাবিরুস ও আসুরের প্রাচীন অধিবাসীরা সেমিটিক জাতীয়। ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, ভিন্ন বংশজ সুমেরীয় জাতি, এই আদিম অধিবাসীদেরকে পরাজিত করে নতুন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সুমেরীয়রা প্রাচীন কীলকাক্ষরের (Cuneiform Script) সৃষ্টিকর্তা (রাখালদাস, ২০১২ : ১৬)।

মধ্য ভারতের পার্বত্য উপত্যকায় একটি ক্ষুদ্র গোলাকার প্রস্তরনির্মিত কীলক আবিষ্কৃত হয়েছে। কীলকটি ভারতের নাগপুরের মিউজিয়ামে আছে। কীলকাক্ষরে একটি খোদিত লিপি আছে এবং কীলকটি বাবিরুষের প্রাচীন মুদ্রা (Cylinder Seal)। প্রাচীনকালে বাবিরুষে এই জাতীয় মুদ্রার (সিলমোহরের) বহুল প্রচলন ছিল (রাখালদাস, ২০১২ : ১৭)। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান পণ্ডিত হিউগো উইঙ্কলার (Hugo Winckler) তুরস্কের বোগজকোই নামক স্থানে কীলকাক্ষরে (Cuneiform) লিখিত প্রাচীন মিতান্নি রাজগণের কতকগুলি মৃন্ময় সন্ধিপত্র আবিষ্কার করেন।

খ্রিস্টের জন্মের ২০০০ বছর পূর্বে আর্যজাতি এশিয়ার মধ্যভাগের মরুময় আবাসভূমি ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। আর্যদের আক্রমণে, খ্রিস্টের জন্মের ৫০০ বছর পূর্বে বাবিরুস ও মিশর দেশের প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। খ্রিষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে আর্যবংশজাত কাশীয় জাতি (Kassites, Cossites Kush-Shu) বাবিরুষ দখল করে নতুন রাজ্য স্থাপন করে। তাদের প্রধান দেবতার নাম সূর্য্যস এবং আর্য জাতিসমূহের অনুরূপ ভাষা ছিল। কাশীয়দের পবন দেবতার নাম মরুত্তম (সংস্কৃত মরুৎ) এবং তারা খোদিতলিপিসমূহে নিজেদের আর্যনামে অভিহিত করতেন। প্রায় ৩০০০ (তিন হাজার) থেকে ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) বৎসরকাল যাবৎ আর্য ভাষা গোষ্ঠী টিকে আছে এবং পৃথিবীতে সব থেকে বড়ো ভাষা গোষ্ঠী হলো আর্য ভাষা গোষ্ঠী (রাখালদাস, ২০১২ : ১৩)।

সংস্কৃতে আর্য শব্দের অর্থ সদ্‌বংশজাত ব্যক্তি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার (১৮২৩-১৯০০), ইংরেজ পণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্স (১৭৮৬-১৭৯৪) প্রমুখের মতে আর্য একটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম। বেদ হলো আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য। চারটি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম। বেদ প্রথমে লিখিত আকারে ছিল না। ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলো প্রথম রচিত হয় এবং শ্রুতি বা কানে শুনে স্মৃতি বা আবৃত্তির মাধ্যমে বহুকাল বংশ পরম্পরায় থেকে যায়। ঋগ্বেদে আফগানিস্তানের কাবুল ও স্বাত, পাঞ্জাবের শতদ্রু, ইরাবতী, চন্দ্রভাগ, বিপাশা, ঝিলাম, সিন্ধু ও সরস্বতী নদীর উল্লেখ আছে। হিন্দুকুশ পর্বতের গিরিপথ দিয়ে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করে এবং প্রথমে আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করে। আর্যরা আফগানিস্তান সীমান্ত থেকে পাঞ্জাবের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে 'সপ্তসিন্ধু' আখ্যা দিয়েছিল। বৈদিক যুগে আর্যসভ্যতার কেন্দ্র পাঞ্জাব থেকে মধ্যদেশ বা গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় সরে আসে। বৈদিক উৎসগুলোতে দুটি সাগর, হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে, দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে বিস্তার লাভ করেনি।

ভারতের সর্বপ্রাচীন সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতাকে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা সভ্যতা বলা হয়। স্যার জন মার্শালের মতে, 'মহেঞ্জোদাড়ো' শব্দের অর্থ মৃতের স্তূপ। স্যার মার্টিমার হুইলার এবং ম্যাকের (Mackky) মতে, বিদেশি আর্যরা ভারতে ঢুকে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো 'পুর' বা নগরকে ইন্দ্র ধ্বংস করেছিলেন বলে তার নাম 'পুরন্দর'। 'পুরন্দর' শব্দের বৈদিক অর্থ, হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতা।

অন্যদিকে, বালগঙ্গাধর তিলক "অস্টিক হোম অব্ দ্যা বেদ্‌স" গ্রন্থে লিখেছেন, আর্যরা ভারতীয়। বালগঙ্গাধর এবং অধ্যাপক জেকোবির মতে, ভারতের বৈদিক সভ্যতা মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা সভ্যতার চেয়ে অন্তত দু'হাজার বছর আগের এবং সিন্ধু সভ্যতা দ্রাবিড় সভ্যতা নয়, বৈদিক সভ্যতারই অংশ। 'মহেঞ্জোদাড়ো' শব্দের অর্থ "মহা-ইঞ্জ-দাড়ো"। সংস্কৃত ভাষায় 'ইঞ্জ' ধাতুর অর্থ সংকেত বা নির্দেশ দেয়া এবং 'দাড়ো' শব্দের অর্থ দুর্গ। অর্থাৎ, "মহেঞ্জোদাড়ো" শব্দের অর্থ হলো, সেনাছাউনি বা দুর্গ।

যজ্বাবতী নদীর তীরে হরিয়ূপীয়া নামক স্থানে আর্যদের বিবদমান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একটা ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে আর্যদের সেনাপতি ছিলেন চায়মান এবং বিরোধীপক্ষ দাসদের সেনাপতি ছিলেন বর্চিনদাস। বর্চিনদাসের ১ লক্ষ ৫ জন সৈন্য ছিল। অগ্রভাগে বরশিখ বংশোদ্ভূত ৩ হাজার দুর্ধর্ষ বৃচিবন যোদ্ধা ছিল। যুদ্ধে আর্য সেনাপতি চায়মানের শতঘ্নী ও সূমী অস্ত্রের আক্রমণে বৃচিনরা পরাজিত হয়।

সংস্কৃত "যজ্ব" শব্দের প্রতিশব্দ হলো "হ্ব-র" যার অর্থ স্রোত। যজ্বাবতীর নাম "হ্বরবতী" যা বর্তমানে 'ইরাবতী'। এই ইরাবতীর পশ্চিম তীরেই বর্তমান মন্টোগোমারী জেলায় আবিষ্কৃত হয়েছে হরপ্পা নগরীর ধ্বংসাবশেষ। এলাকার অধিবাসীরা হরিয়ূপীয়াকে 'হরপ্পা' বলেন।

ঋগ্বেদের বিবরণ : "এতত্যক্ত ইন্দ্রিয়মচেতি যেনাবধীবর্বরশিখস্য শেষঃ।

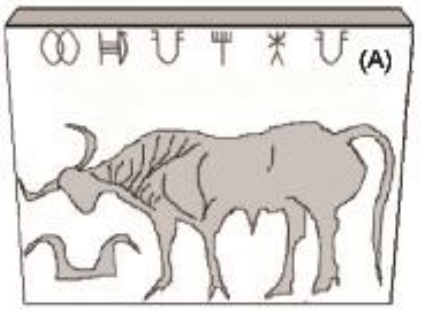
বজ্রস্য যত্তে নিহতস্য শুষ্ম্যাৎস্বনাচ্চিদিন্দ্রপরমো দদার।।

বধীদিন্দ্রো বরশিখস্য শেষোহভ্যাবর্তিনে চায়মানয় শিক্ষন্।

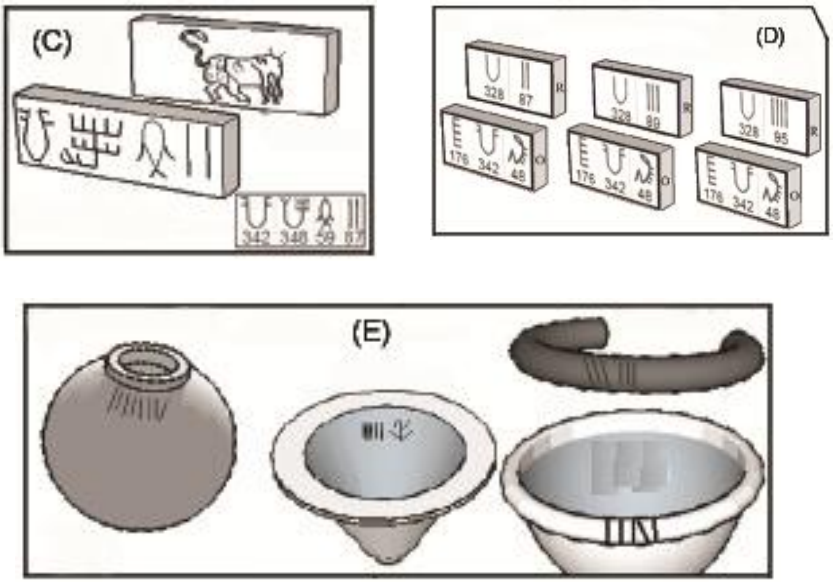
বৃচীবতো যদ্ হরিয়ূপীয়ায়াম হন্ পূর্বে অর্ধে ভিয়সাপরো দর্তন।।" (ঋগ্বেদ ৬/২৭/৪,৫)

সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়ায় ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস জানা সম্ভব হয়নি। তবে, বাঙালি মেয়ে, কার্টুনিস্ট, টেনিস ও ফ্যাশনে আগ্রহী, কবি এবং পেশায় আইটি বিশেষজ্ঞ বহতা অংশুমালী মুখোপাধ্যায় রচিত "Interrogating Indus inscriptions to unravel their mechanisms of meaning conveyance" শীর্ষক ৩৭ পৃষ্ঠার গবেষণা প্রবন্ধটি বিখ্যাত নেচার ব্রান্ডের পত্রিকা 'প্যালগ্রেভ কমিউকেশন্স'-এর পঞ্চম ভলিউমে ৭৩ নম্বরে প্রকাশিত হওয়ায় সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধারের পদ্ধতি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

সিন্ধু লিপি (চিত্র-১৩)-কে প্রধানত শব্দচিত্রের মাধ্যমে লিখিত একটি লিপি বলে মনে করেন বহতা। সিন্ধু লিপিতে উৎকীর্ণ সিলমোহর আর মৃৎ-ট্যাবলেটগুলো বর্তমানকালের স্ট্যাম্প, মুদ্রা, টোকেন ইত্যাদির সঙ্গে তুলনীয়। মুদ্রার বা স্ট্যাম্পের বিশেষ বিশেষ অংশে যেমন বিশেষ বিশেষ তথ্য দেয়া থাকে, ঠিক সে রকমই এগুলোর বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ ধরনের বা শ্রেণির শব্দচিত্র থাকে যা Fuctionally এক রকমের। এই উৎকীর্ণ সিলমোহর আর লিপিফলক Formalized Data Cariars, যার মধ্যে 'Document Specific Syntax' আর 'Linguistic Syntax', এই দুই রকমের Syntax বা গঠনপদ্ধতি দেখা যায়।







(চিত্র-১৩)

[চিত্র-১৩ : A-তে মহেঞ্জোদাড়োর খোদাই করা সিলমোহর, B-তে হরপ্পার সিলমোহর, C-তে মহেঞ্জোদাড়োর তামার টেবিল, D-তে হরপ্পার তিন জোড়া অনুচিত্র, E-তে ৪টি খোদাই করা মৃৎশিল্প দেখানো হয়েছে।]

বহতার মতে, শব্দচিত্রলিপিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই Rebus Principle ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়, 'মা' বোঝাতে শিশু কোলে মায়ের ছবি দেয়া হলো। আবার 'খা' বোঝাতে একটি মানুষের খাওয়ার ছবি দেয়া হলো। দুটি শব্দচিত্রই তাদের অন্তর্নিহিত অর্থকে সুচারুভাবে ফুটিয়ে তুললো। এবার যদি 'মাখা' লিখতে হয়, তা হলে তার জন্য নতুন শব্দচিত্র উদ্ভাবন না করে, মা এবং খা-এর জন্য ব্যবহৃত দুটি শব্দচিত্রকে পাশাপাশি বন্ধনী দিয়ে জুড়ে দেয়া হলো (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩/৯/২০১৯)।

বহতা মনে করেন, সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধারের জন্য ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics), দেহতত্ত্ব (Physiology), শব্দ বিজ্ঞান (Acoustics Science), ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics), গণিত (Math), পুরাতত্ত্ব (Archeology), ইতিহাস (History), প্রাচীন সভ্যতার অর্থনীতি (Old Historical Economics), কম্পিউটার বিজ্ঞান (Computer Science) এবং সর্বোপরি সাধারণজ্ঞান (Overall Commonsense) প্রয়োজন। সিন্ধু সভ্যতার লোকজন ভীষণভাবে বাণিজ্যধর্মী ছিল। সিন্ধু লিপি ও সভ্যতা নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে দেড়শ বছর ধরে। সিন্ধু লিপি ডান দিক থেকে বাম দিকে লেখা হয়েছে। বিভিন্ন ভাষার ও বিভিন্ন জ্ঞান শাখার প্রায় ১০০ জন গবেষক দাবি করেছেন, যে তাঁরা সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার করে ফেলেছেন। তবে তাঁদের একজনের কথাও গবেষক সমাজ কর্তৃক গৃহীত হয়নি (দৈনিক প্রথম আলো, ৩০/১০/২০১৯)। বহতা অংশুমালী কর্তৃক সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধারের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

৮.

১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ড. স্পুনার (Dr. D.B. Spooner) পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ খননকালে একটি মৃন্ময় মুদ্রা (Terracotta Plaque) আবিষ্কার করেছিলেন। এই মুদ্রায় মহাবোধি বিহারের প্রকৃতি এবং কতকগুলি খরোষ্ঠী অক্ষর আছে (রাখালদাস, ২০১২ : ২৬)। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম লিপি হলো খরোষ্টি ও ব্রাহ্মী লিপি। পাকিস্তানের 'শাহবাজগঢ়হি' ও 'মান্ সেরা'য় অশোকের দুটি অনুশাসন লিপিতে খরোষ্টি লিপির ব্যবহার দেখা যায় (কাইউম, ২০০ : ১৫৬)। ১৮৮০ হতে ১৮৯২ পর্যন্ত জে.ডি.এম বেগলার মহাবোধি মন্দির খনন ও সংস্কারকালে রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্মিত একটি বোধিসত্ত্ব মূর্তি আবিষ্কার হয়। এই মূর্তির পাদপীঠে একটি খোদিতলিপি আছে। খোদিতলিপির অক্ষরসমূহ সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তির অক্ষরের অনুরূপ (রাখালদাস, ২০১২ : ২৬-২৭)।

প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ২১০০টি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত মাইক্রোনেশিয়া। এর পশ্চিমে ফিলিপাইন, দক্ষিণ-পশ্চিমে ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণে পাপুয়া নিউগিনি ও মেলানেশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্বে পলিনেশিয়া অবস্থিত। মাইক্রোনেশিয়ার অন্যতম একটি দ্বীপ 'ইয়াপ'। সুপ্রাচীনকাল থেকে এখানে 'পাথুরে শিলা মুদ্রা' প্রচলিত রয়েছে (চিত্র-১৪)।



(চিত্র-১৪)

কয়েক সেন্টিমিটার থেকে শুরু করে সাত মিটার ব্যাসের মুদ্রাও এখানে রয়েছে। মূলত বড়ো কোনো লেনদেন, বিয়ের উপহার, ক্ষতিপূরণ দেয়ার মতো পরিস্থিতিতে এই মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। বর্তমানকালে, মুদ্রার জায়গা মার্কিন ডলার দখল করলেও পাথুরে শিলা মুদ্রার কদর এখনো আগের মতোই রয়েছে (দৈনিক ইত্তেফাক, ০৮/০৫/২০১৮)।

পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া জেলায়, শুশুনিয়া পর্বতে চন্দ্রবর্মার যে শিলালিপি আছে, তা হতে জানা যায়, তাঁর পিতার নাম সিংহবর্মা এবং তিনি চক্রস্বামী বা বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। দিল্লীর কুতুব মিনারের নিকটে মসজিদ কুতুব-উল-ইসলামের অঙ্গনে একটি বৃহৎ লৌহস্তম্ভ আছে। লৌহস্তম্ভের গায়ে যে, প্রাচীন খোদিতলিপি আছে, তা থেকে জানা যায়, চন্দ্র নামে জনৈক রাজা বিষ্ণুপাদ গিরিতে বিষ্ণু ধ্বজ স্থাপন করেছিলেন এবং বঙ্গে সিন্ধুর সপ্তমুখের পারে ও বাহ্লীক দেশে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। শুশুনিয়া পর্বতলিপির চন্দ্রবর্মা ও দিল্লির লৌহস্তম্ভলিপির চন্দ্র একই ব্যক্তি; এবং দশপুর বা মন্দশোরের শিলালিপির নরবর্মা তাঁর ছোটো

ভাই। চন্দ্রবর্মা সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে, বঙ্গদেশ হতে বাহ্লীক দেশ পর্যন্ত সমগ্র আর্যবর্ত জয় করেছিলেন। এলাহাবাদের দূর্গের মধ্যে অশোকের শিলাস্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তাতে দেখা যায় সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্মা নামক জনৈক আর্যবর্তরাজকে বিনষ্ট করেছিলেন। সমুদ্রগ্রপ্তের প্রশস্তির ও শুশুনিয়া শিলালিপির চন্দ্রবর্মা এবং দিল্লি স্তম্ভলিপির চন্দ্র অভিন্ন (রাখালদাস, ২০১২ : ২৭-২৮)। কলিঙ্গাধিপতি চেতবংশোদ্ভব রাজা খারবেলের একটি দীর্ঘ শিলালিপি ভারতের পুরি জেলায় ভুবনেশ্বর গ্রামের নিকটে উদারগিরি পর্বতের হাফিগুম্ফা নামক একটি গুহার উপরে উৎকীর্ণ আছে। এসব নিদর্শন হতে প্রাচীন লিপির উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

মানব মনের প্রস্ফুটিত মাধুর্য সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যে সংগীত লিপিধৃত হয়, সে সঙ্গীত যুগের পর যুগ বেঁচে থাকে। সঙ্গীতের জন্মভূমি সম্ভবত, সিরিয়ায়। ১৯৫০ এর দশকে সিরিয়ায় সংগীত সংক্রান্ত ২৯টি নিদর্শন পাওয়া যায়। এগুলো ৩ হাজার ৪০০ বছরের পুরোনো। এদের একটিতে মাটির খণ্ডের উপর অনেকটা আধুনিক যুগের সুরলিপির মতোই সংগীতের সুরলিপি অঙ্কন করা আছে। এগুলো খণ্ড খণ্ড অবস্থায় থাকায় প্রত্নতত্ত্ববিদগণ প্রায় ২০ বৎসর চেষ্টার পর জোড়া লাগিয়ে একটি গানের পূর্ণ লিপি বের করতে সক্ষম হন (চিত্র-১৫)।



(চিত্র-১৫)

এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম স্বরলিপির নিদর্শন। গবেষক দলের একজন ইরাকের ব্যাবিলন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক রিচার্ড ডামব্রিল বলেন, অনেকের ধারণা হাজার হাজার বৎসর আগে কেবল ধর্মীয় গানই গাওয়া হতো। কিন্তু, বিষয়টি তেমন নয়। একটি গানের কথায় দেখা গেছে, একজন বার গার্ল তার খরিদ্দারের উদ্দেশ্যে গান গাইছে। আরেকটি গানের কথায় দেখা যায়, একজন নারী সন্তান না হওয়ার জন্য গান গাইছেন। তার ধারণা তিনি হয়তো কারো সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন, সেজন্য, সৃষ্টিকর্তা রুষ্ট হয়ে তাকে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করেছেন। এরকম থিমের উপর গান রচিত হতো। এছাড়াও, ৩ থেকে ৪ হাজার বৎসর পূর্বের বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শনও সিরিয়ায় পাওয়া গেছে। ড্রামবিল বলেছেন, মানব জাতির প্রথম গানটি সিরিয়ায় উদ্ভব

হয়েছিল কি-না তা নিয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে (দৈনিক ইত্তেফাক, ০৯/০৫/২০১৮)।

৭.

লিপির উৎপত্তি পর্যালোচনা করলে লক্ষ করা যায়, আধুনিক ধ্বনি, বর্ণ বা অক্ষরমূলক লিপিগুলি একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এগুলি আবহমানকালের মানুষের মানসকৃতির (Intellectual Activities) প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন। বাক্যনির্ভর গুহাচিত্র থেকে চিত্রলিপি (Pictogram), চিত্রলিপি থেকে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ সক্ষম ভাবলিপি (Ideogram), এরপর বস্তুর প্রতিকৃতি সংক্ষিপ্ত বা সাংকেতিক হয়ে শব্দলিপির (Logogram) উন্মেষ ঘটে। লিপি বিবর্তনের ফলে, বস্তুচিত্র একটি বিশেষ চিহ্নে রূপান্তরিত হয়ে শব্দলিপিতে পরিণত হয়েছিল। এক্ষেত্রে, ঐ বিশেষচিহ্ন এবং সংশ্লিষ্ট বস্তুচিত্রের সঙ্গে কোনো মিল থাকেনি। ভাষার প্রতিটি শব্দের জন্য একটি করে চিহ্নের ব্যবহার শব্দলিপির বৈশিষ্ট্য, যা পরবর্তীকালের অক্ষরলিপি (Syllabogram)-কে নির্দেশ করতো। একীভূত শব্দগুলি কালক্রমে গঠনগত (Physiological) দিক থেকে অক্ষর (Syllable)-এর মর্যাদা লাভ করেছিল। তবে, শ্রুতিগত (Acoustic) দিক থেকে সংশ্লিষ্ট শব্দের সমগ্র ধ্বনিসমষ্টিকেই নির্দেশ করেছে (শাহজাহান, ১৯৮৪ : ২৮–২৯)।

লিপি সৃষ্টির সাথে সরাসরি প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সম্পর্ক আছে। পৃথিবীতে যত ভাষা আছে, সবগুলো ভাষারই যে লিপি আছে, তা নয়। যেসব ভাষা লিপিধৃত হয়নি, সেসব ভাষা প্রযুক্তির ছোঁয়া পায়নি। সভ্যতার ইতিহাসে লিপি তৈরি প্রথম প্রাযুক্তিক পদক্ষেপ। লিপি আবিষ্কৃত হওয়ার পর সমগ্র পৃথিবীর জীবনযাত্রায় বড়ো রকমের পরিবর্তন সূচিত হয়। মানুষ হাজার হাজার বৎসর ধরে গুহালিপি, প্রস্তরলিপি, শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, ভূর্জপত্র, তালপত্র, বৃক্ষবাকল, পশুর চামড়া, শিং, দাঁত ইত্যাদিতে ইতিহাসকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে (মনসুর, ২০১৭ : ১৭৫)। লিপির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার জন্য যুগের পর যুগ মানুষ চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বের ভিত্তিতে হায়রোগ্লিফিক, কিউনিফর্ম, ক্রিটান, ফিনিশিয়ান এবং আরো অনেক লিপি একেক সময় একেক জন পণ্ডিত কর্তৃক প্রথম লিপি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে (The Encyclopedia Americana, 1896 : 618–19)।

তবে, এ যাবত প্রাপ্ত লিপির উৎপত্তি সম্পর্কে এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়, গুহাচিত্র এবং শিলালিপি অতিপ্রাচীনকালের নিদর্শন হিসেবে বিরাজ করছে। যুদ্ধ, বিগ্রহ, প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প, ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি কারণে অনেক প্রসিদ্ধ মানব সভ্যতা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। সেজন্য, ধারাবাহিক মানব সভ্যতার ইতিহাস পাওয়া বেশ দুষ্কর। সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুশাসন সবকিছুই লিপিধৃত হওয়ায় যুগের পর যুগ মানবসভ্যতা টিকে আছে। পূর্ববর্তী মানুষের অর্জন ও সৃষ্টির বিষয়াদি লিপিধৃত হওয়ার কারণে পরবর্তীকালের মানুষের জীবন-যাত্রা সহজ ও বিজ্ঞানভিত্তিক হয়েছে। কে, কখন, প্রথম লিপি উদ্ভাবন করেছিল, তা সঠিক ভাবে জানা যায় না; যেমন, জানা যায় না, কখন, ভাষা সৃষ্টি হয়েছিল। ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক প্রায়োগিক উপযোগিতা পাওয়ার জন্যই মানুষ লিপি উদ্ভাবন করেছে। ভাষা ও লিপির ব্যবহার চলমান প্রক্রিয়া। লিপির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ তার মনোভাব লিপি ফলকে অঙ্কিত করে রাখতে পারে। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে একই ভাষার লিপির বিভিন্নরূপ

লক্ষ করা যায়। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার লিপির স্থায়িত্ব ও অভিন্ন রূপ নিশ্চিত করেছে এবং ভাষার মানরূপ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। সেজন্য, লিপির উৎপত্তি ভাষা ও মানব সভ্যতার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত।

সহায়কপঞ্জি

আলা উদ্দিন, শায়লা শারমিন (২০১৫)। 'জৈবিক ভিত্তি ও সামাজিক সংযোগ : প্রেক্ষিতে ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান'। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা : ৯৫, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এস. এম. লুৎফর রহমান (২০০৫)। *বাঙালা-লিপির উৎস ও বিকাশের অজানা ইতিহাস*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

কল্পনা ভৌমিক (১৯৯২)। *পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

খন্দকার মুজাম্মিল হক (২০০০)। *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সম্পাদনা*। অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা (১৯৮৯)। *প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা*, মণীন্দ্র নাথ সমাজদার (অনু.)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা (২০০৩)। *বর্ণমালার উদ্ভববিকাশ ও লিপি সভ্যতার ইতিবৃত্ত*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

দৈনিক ইত্তেফাক (২০১৮)। সম্পাদক : তাসমিমা হোসেন, ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লি., ঢাকা।

দৈনিক জনকণ্ঠ (২০১৯)। সম্পাদক : এম. এ. খান মাসুদ, গ্লোব প্রিন্টার্স লি. ও জনকণ্ঠ লি. ঢাকা।

দৈনিক প্রথম আলো (২০১৯)। সম্পাদক : মতিউর রহমান, ঢাকা।

নলিনী সান্যাল (১৯৮৫)। 'ভারতবর্ষে লিপিবিদ্যার বিকাশ'। *বাঙলা ভাষা*, ২য় খণ্ড। সম্পাদক : হুমায়ুন আজাদ। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মনসুর মুসা (২০১৭)। *পাণিনি, চমস্কি ও তারপর*। মধ্যমা মিডিয়া অ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া (১৯৮৪)। *বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম (২০০০)। *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা*। গতিধারা, ঢাকা।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১২)। *বাঙ্গালার ইতিহাস* (অখণ্ড সংস্করণ)। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

Bedrich Hrozny, (উদ্বৃত, খন্দকার মুজাম্মিল হক, ২০০০) Translated by Indirich Prochazka (1953), *Ancient History of western Asia, India and Crete*. New .

Ignace Jay Gelb (1952). *A study of writing : The Foundations of Grammatology*. University of Chicago Press, Chicago.

The Encyclopedia Amercana (1996). International Edition, Grolier Incorporated, USA.

রাগসংগীতের ইতিহাসে রামপুর (সহসওয়ান) ঘরানার ঐতিহ্য

আকলিমা ইসলাম কুহেলী*

[সারসংক্ষেপ : ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ইতিহাসে বিভিন্ন ঘরানাকেন্দ্রিক সংগীতের মধ্যে রামপুর ঘরানা এক অনন্য বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। ধারণা করা হয় রামপুর ঘরানা বৃহৎ সেনী ঘরানারই শেষ পর্যায়। ভারতের উত্তর প্রদেশের বাদাউন জেলায় সহসওয়ান নগর অবস্তিত। এই সহসওয়ান নাম থেকেই রামপুর ঘরানাকে সহসওয়ান ঘরানা বলা হয়। রামপুর ঘরানা শুধুমাত্র কণ্ঠসংগীত নয়, নানা প্রকার যন্ত্রসংগীত চর্চার ক্ষেত্রেও স্বনামধন্য। মূলত তানসেন বংশীয় বিভিন্ন গুণী সংগীতজ্ঞদের হাত ধরে এই ঘরানা বিস্তৃতি লাভ করে। এদের মধ্যে তানসেন জামাতা মিশ্রী সিং, নৌবৎ খাঁ ও সদারঙ্গ উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৭ সালের দিকে ভারতবর্ষে বিদ্রোহকালীন সময়ে ইংরেজদের নানাভাবে সহায়তা করে নবাব উপাধি প্রাপ্ত তৎকালীন জমিদার নবাব ইউসুফ আলী খাঁর সংগীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। পরবর্তী সময়ে তানসেনের কন্যাবংশীয় ওমরাও খাঁ'র পুত্র আমীর খাঁ এবং তানসেনের পুত্র বংশীয় বাহাদুর হোসেনের হাত ধরেই রামপুর ঘরানা বিস্তৃতি লাভ করে এবং প্রজন্মক্রমে এর ধারা অব্যাহত থাকে। সে সময়কার রামপুর দরবারের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞদের মধ্যে উজীর খাঁ, হায়দার খাঁ, ফিদা হুসেন খাঁ, মেহবুব বক্স খাঁ, মহম্মদ আলী খাঁ, বুলু খাঁ, ভাইয়া সাহেব গনপত রাও, আহমেদ জান থিরকুয়া, কালে নজীর খাঁ, অচ্ছন মহারাজ, কালিকাপ্রসাদ মিশ্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও রামপুর ঘরানার অন্যতম প্রসিদ্ধ সংগীত গুণীদের মধ্যে আমীর খাঁর পুত্র উজীর খাঁ অন্যতম। রামপুর ঘরানা প্রধানত তন্ত্রবাদন ঘরানা হলেও কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত চর্চার জন্য বিখ্যাত। এই ঘরানায় ধ্রুপদাঙ্গ রাগালাপ সংগীতচর্চার ভিত্তিস্বরূপ। এছাড়া বিভিন্ন যন্ত্রবাদনে দ্রুত-তান, কণ্ঠসংগীতে দ্রুত-তান, বোলতান, জোড়-বোলতানের ব্যবহার এই ঘরানার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ঘরানার গায়করা উৎকৃষ্ট তারানা গায়করূপে খ্যাত। বর্তমান প্রবন্ধে রাগসংগীতের ইতিহাসে রামপুর (সহসওয়ান) ঘরানার ঐতিহ্য অনুসন্ধানের প্রয়াস থাকবে।]

রামপুর দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় গুণী সংগীতজ্ঞদের বিশিষ্ট সংগীত ধারাই রামপুর ঘরানা নামে খ্যাত। ভারতের উত্তরপ্রদেশের বাদাউন জেলায় সহসওয়ান নগর অবস্থিত। এখানে অনেক দিকপাল সংগীতজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেছেন। রামপুর ঘরানা একটি বৃহৎ সেনী ঘরানারই শেষপর্যায় বলে ধারণা করা হয়। তানসেন বংশীয় কয়েকজন গুণী সংগীতজ্ঞদের শিক্ষাধারায় সহসওয়ান বা রামপুর ঘরানা বিস্তার লাভ করে। তানসেন জামাতা মিশ্রী সিং তথা নৌবৎ খাঁ ও সদারঙ্গ এই তিন প্রজন্মে রামপুর ধারার বিকাশ হয়েছিল বলে জানা যায়। বিভিন্ন রীতির কণ্ঠসংগীত ও নানা প্রকার যন্ত্রসংগীত চর্চার জন্য রামপুর ভারতে একটি বৃহত্তম ও বিখ্যাত সম্প্রদায়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রামপুর ঘরানার ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় যে, ১৮৫৭ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে বিদ্রোহের সময় অনেকের মতো সহসওয়ানের দক্ষিণে অবস্থিত রামপুরের জমিদার নবাব ইউসুফ আলী খাঁ (১৮৪০-১৮৬৪) ইংরেজদের নানাভাবে সহায়তা করেন। এতে ইংরেজরা

*সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বিদ্রোহ দমনের পর নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে তাঁকে 'নবাব' উপাধি দেন। রামপুর নবাব ইউসুফ আলী ও তাঁর বংশধরেরা অত্যন্ত গুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং রামপুরে একটি উন্নতমানের সংগীত দরবার প্রতিষ্ঠায় খুব আগ্রহী ছিলেন। সেই লক্ষ্যে তিনি রামপুর দরবারে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বাদককে আমন্ত্রণ করে আনেন যাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তানসেন বংশীয় দু'জন গুণিশিল্পী। এঁদের একজন হলেন তানসেনের কন্যা-বংশের ওমরাও খাঁ'র পুত্র আমীর খাঁ যিনি বারানসী থেকে রামপুর দরবারে যোগ দিতে আসেন আর অন্যজন হলেন তানসেনের পুত্র বংশের (জাফর খাঁ-বাসৎ খাঁ'র ভাগিনেয়) বাহাদুর হোসেন যিনি কাশীর নিকটবর্তী ভাদৈ রাজসভা থেকে রামপুর আসেন। অন্যান্য যারা রামপুর দরবারে ছিলেন তাঁরা বিভিন্ন সংগীত পরিবার থেকে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আমীর খাঁ ও বাহাদুর হোসেনকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য শিল্পীদের রামপুর দরবারে নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁরা এই দুই দিকপালের কাছে সংগীতশিক্ষার সুযোগ পান। সেইসময় বংশের অতিরিক্ত কাউকে তালিম দেওয়ার রীতি না থাকলেও সংগীতপ্রেমী নবাব ইউসুফ আলীর প্রভাব ও দাক্ষিণ্যে রামপুর দরবারে তা সম্ভব হয়। তাঁর পুত্র কলবে আলী খাঁ সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতায় পিতার চেয়েও অগ্রণী ছিলেন। ইউসুফ আলী খাঁ'র অপরপুত্র হায়দার আলী খাঁ অতি গুণিশিল্পী ছিলেন। হায়দার আলী ছিলেন বাহাদুর সেনের শিষ্য। তাঁর সাহায্যেই অন্যান্য রাজ্যের মতো রামপুর দরবারে সংগীতসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন দরবারি সংগীতজ্ঞদের মধ্যে উজীর খাঁ, বুনিয়দ হুসেন খাঁ, মহম্মদ হুসেন খাঁ ও হায়দার আলীর পুত্র সাদাত আলীর নাম উল্লেখযোগ্য। কলবে খাঁ'র পুত্র নবাব মুস্তাক আলী খাঁ মাত্র দুই বৎসর নবাবী করেন। তাঁর পুত্র নবাব হামিদ আলী খাঁ (১৮৮৯-১৯২৮) অত্যন্ত গুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাঁর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর সহায়তায় পণ্ডিতজি তানসেন বংশীয় অনেক মূল্যবান সংগীত সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে জনা যায়। সেইসময় রামপুর দরবারে ভারতের অনেক শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। যাঁদের মধ্যে উজীর খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, হাফিজ আলী খাঁ, হায়দার খাঁ, ফিদা হুসেন খাঁ, মেহবুব বক্স খাঁ এবং তাঁর পুত্র ইনায়ত হুসেন খাঁ, মুস্তাক হুসেন খাঁ, মহম্মদ আলী খাঁ, বুন্দু খাঁ, ভাইয়া সাহেব গনপত রাও, আহমদ জান থিরকুয়া, কালে নজীর খাঁ, অচ্ছন মহারাজ, কালিকা প্রসাদ মিশ্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য (দিলীপ, ১৩৮৪)।

বাহাদুর হোসেন ছিলেন ধ্রুপদি, সুরশৃঙ্গার বাদক এবং তারানা রীতির কণ্ঠসংগীতে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী শিল্পী। সুরশৃঙ্গারে রাগালাপ বাদনের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন এবং প্যারে খাঁ'র কাছে সেনিয়া ঘরানার ধ্রুপদের তালিম পেয়েছিলেন। বস্তুত বাহাদুর হোসেন ও আমীর খাঁ'র কাছে সংগীতশিক্ষার কালে রামপুরে যে শিষ্যসম্প্রদায় গঠিত হয় পরবর্তীকালে তা-ই একটি সংগীত পরিবাররূপে চিহ্নিত হয় এবং ধীরে ধীরে এই গুণিজনদের সমন্বিত ধারাই রামপুর ঘরানা নামে খ্যাত হতে থাকে। বাহাদুর হোসেন ও আমীর খাঁ'র কাছে সংগীতশিক্ষা গ্রহণ করে যে সংগীতিক পরিবার গঠিত হয়েছিল তার মধ্যে বহিরাগত কলাবৎদের সঙ্গে নবাব বংশীয় ব্যক্তিরাও ছিলেন। তাঁরা দুইজন একসাথেই রামপুরে শিষ্যসম্প্রদায় গঠন করেছিলেন। বাহাদুর হোসেনের শিষ্যবর্গের মধ্যে প্রধান হলেন নবাব ইউসুফ আলীর কনিষ্ঠ পুত্র হায়দার আলী। তিনি সুরশৃঙ্গার, বীণা ও ধ্রুপদ-ধামারে রামপুর ঘরানার তালিম পেয়েছিলেন। রামপুরে হায়দার আলীর মতো আর কেউই বাহাদুর হোসেনের কাছ থেকে

এমন পর্যাপ্ত বিদ্যা লাভ করেননি। নবাবের কনিষ্ঠ পুত্র হওয়ায় হায়দার আলী বিলসী ও বদায়ন জেলার তালুকদারি পান যার উপস্বত্ব থেকে তিনি ওস্তাদ বাহাদুর হোসেনকে যথেষ্ট দক্ষিণা দিতেন। বাহাদুর হোসেনের দ্বিতীয় শিষ্য ছিলেন কুতুবউদ্দৌলা। বীণা ও সেতারে তিনি বাহাদুর হোসেনের কাছে তালিম নেন। লক্ষ্ণৌর এই সম্ভ্রান্ত বংশীয় গুণিশিল্পী লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলীর দরবারেও নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সেতারিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাহাদুর হোসেনের তৃতীয় শিষ্য ছিলেন গোয়ালিয়র ঘরানার হদ্দু খাঁ'র জামাতা বিখ্যাত গায়ক এনায়েত হোসেন খাঁ। রামপুরে থাকাকালীন তিনি বাহাদুর হোসেনের কাছে বিশেষ করে তারানার শিক্ষা পান। এনায়েত হোসেন খেয়াল গাইতেন। তিনি এনায়েত হোসেনকে ধ্রুপদের তালিম না দিয়ে অনেকাংশে পাখোয়াজের বোলের ভিত্তিতে গঠিত ধ্রুপদভাঙা এবং ভারিচালের খেয়ালাঙ্গ তারানার তালিম দেন। বাহাদুর হোসেন তবলার বোলে তারানাও গঠন করেছিলেন। তাঁর রচিত তারানার বন্দিশগুলো ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তবে খেয়াল গায়ক বলেই এনায়েত হোসেন- বাহাদুর হোসেনের কাছে তারানার তালিম বেশী পান। এইসকল তারানা পরবর্তীকালে এনায়েত হোসেন বিখ্যাত সংগীত শিল্পী মুস্তাক হোসেনকে দেন যাঁকে আমরা রামপুর ঘরানাদার হিসেবে পাই উজীর খাঁ'র শিষ্যমণ্ডলীতে। পরবর্তী সময়ে এনায়েত হোসেনের জামাতা নিসার হুসেন খাঁ রামপুর ঘরানার বিখ্যাত খেয়াল গায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হন। বাহাদুর হোসেনের শিষ্যদ্বয় ছিলেন প্রসিদ্ধ দুই গায়ক আলী ও ফত্তু। সংগীতজগতে তারা আলীয়া ফত্তু নামে পরিচিত। সংগীতজীবনে একসঙ্গে পথচলার কারণেই তাঁদের নাম যুগ্মভাবে উচ্চারিত হয়। আলীয়া ফত্তু-বাহাদুর হোসেন ছাড়া ডাগর ঘরানার বৈরাম খাঁ'র কাছেও সংগীতশিক্ষা লাভ করেন। তবে হায়দার আলীর পর বাহাদুর হোসেনের শ্রেষ্ঠ শিষ্যরূপে যিনি গণ্য তিনি হলেন এনায়েত হোসেনের ভ্রাতা এবং কুতুবউদ্দৌলার জামাতা মহম্মদ হোসেন। বাহাদুর হোসেনের নিকট বীণার তালিম এবং শ্বশুরের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে মহম্মদ হোসেন রামপুর ঘরানার অন্যতম কৃতী সংগীতজ্ঞরূপে প্রতিষ্ঠা পান। এনায়েত হোসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলী হোসেন ছিলেন উৎকৃষ্ট বীণকার। বাহাদুর হোসেনের তালিমে তিনি অনেক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এছাড়া এই ঘরানার আবিদ আলী খাঁ তারানার শিক্ষা পান বাহাদুর হোসেনের নিকট। ১৮৭০ সালে বাহাদুর হোসেন মৃত্যুবরণ করেন। আবিদ আলীর জ্ঞাতি ভ্রাতা আসাদ আলী খাঁ প্রথমে বাহাদুর হোসেনের নিকট ধ্রুপদ-ধামার ও তারানার তালিম নেন, পরবর্তীকালে কণ্ঠ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি যন্ত্রসংগীত শেখেন এবং দিনাজপুরের দরবারে গিরিজানা রায়ের সময়ে সরোদবাদক হিসেবে নিযুক্ত হন। আবিদ আলীর পুত্র আহম্মদ আলী তাঁর কাছে সরোদের তালিম পান এবং সরোদ বাদকরূপে দিনাজপুর ও মুক্তাগাছা দরবারে নিযুক্ত থাকেন। বিখ্যাত শিল্পী আলাউদ্দিন খাঁ প্রথম জীবনে কিছুদিন আহম্মদ আলীর নিকট সরোদ শিক্ষা গ্রহণ করেন (অমল, ১৯৯৫)।

রামপুরে আমীর খাঁ'র তালিম যারা পান তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য উজীর খাঁ। তিনি পিতার বংশগত শিক্ষায় গঠিত হলেও আমীর খাঁ তাঁর তালিম সম্পূর্ণ করতে পারেননি। কারণ আমীর খাঁ মাত্র ৪৯ বছর বয়সে (১৮৭৩ সালে) দেহত্যাগ করেন, যখন উজীর খাঁ'র বয়স ছিল ২২ বছর। তাঁর পিতার মৃত্যুর তিন বছর আগেই বাহাদুর হোসেন গত হয়েছিলেন। এরপর উজীর খাঁ ঘরানাদার তালিম পান হায়দার আলীর কাছে যিনি বাহাদুর হোসেনের প্রধান শিষ্য হলেও আমীর খাঁ'র কাছেও বীণা, ধ্রুপদ ও হোরী গানের তালিম পেয়েছিলেন। হায়দার আলীর পর

আমীর খাঁ'র শিষ্যরূপে ফিদা হোসেনের নাম উল্লেখযোগ্য। শাজাহানপুরের সরোদি পরিবারের সন্তান এবং এনায়েত আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র ফিদা হোসেন প্রথমে নিজ ঘরের তালিম পান এবং পরবর্তীকালে রামপুরে অবস্থান করে আমীর খাঁ'র কাছে শিক্ষালাভ করেন। রামপুর ঘরানার বাদকরূপে তিনি দীর্ঘকাল সরোদ যন্ত্রের শিল্পী হিসেবে রামপুর দরবারে নিযুক্ত থাকেন।

আমীর খাঁ'র আরেক অন্যতম কৃতী শিষ্য বনিয়াদ হোসেন সারেঙ্গি বাদকরূপে রামপুর দরবারে নিযুক্ত থাকেন। তিনি পুত্র মেহেদী হোসেনকে রামপুর ঘরানার তালিম দেন। পরবর্তীকালে মেহেদী হোসেন উজীর খাঁ'র কাছেও সংগীতশিক্ষা লাভ করেন। আমির খাঁ'র অপর শিষ্যের মধ্যে মুরাদ আলী, কুতুবদ্দৌলা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ছম্মন সাহেব ছিলেন বাহাদুর হোসেনের প্রধান শিষ্য হায়দার আলীর পুত্র। তিনি সুরশৃঙ্গারের অত্যন্ত গুণিশিল্পী ছিলেন। সুরশৃঙ্গারে রাগালাপ ছিল তাঁর বাদনের এক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। তিনি স্বল্প পরিসরে ঠুমরী চর্চা করতেন। ঘরোয়াভাবে উজীর খাঁ ঠুমরী চর্চার পাশাপাশি 'ছতর পিয়া' ভনিতায় ঠুমরী গানও রচনা করেছেন। উজীর খাঁ'র ঠুমরীর প্রতি আগ্রহ আসে 'সনদ পিয়া' থেকে। 'সনদ পিয়া' ছিলেন রামপুর দরবারে ঠুমরী গানের প্রধান গায়ক। বাহাদুর হোসেন ও আমীর খাঁ'র সময় তিনি এই দরবারে যোগদেন। লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারে ঠুমরী গায়ন ও ঠুমরী গান রচনা করে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ দরবারের ভগ্নদশা কালে তিনি রামপুরের নবাব ইউসুফ আলীর দরবারে চলে আসেন। তাঁর আসল নাম তবক্কুল হোসেন খাঁ হলেও গানের ভনিতায় ছদ্মনাম হিসেবে ব্যবহার করতেন 'সনদ পিয়া'। সনদ পিয়া রামপুর দরবারে অবস্থান করার সময় বহু ঠুমরি রচনা করেন এবং সেইসব ঠুমরি গান তিনি দরবারে পরিবেশন করেন। বাহাদুর হোসেন ও আমীর খাঁ রামপুরে সুরশৃঙ্গার ও বীণাবাদনের যে ধারা প্রবর্তন করেন তার চলন ও বাজ অনুসারেও সনদ পিয়া অনেক বন্দিশ রচনা করেন। ভারতীয় সংগীতের পুনরুদ্ধারে নিবেদিত প্রাণ পণ্ডিত ভাতখণ্ডে সনদ পিয়া রচিত তেমন কিছু বন্দিশও প্রকাশ করেন। পণ্ডিতজি এক্ষেত্রে উজীর খাঁ ও ছম্মন সাহেবের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা লাভ করেন। উজীর খাঁ'র শিষ্যরূপে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে রামপুর ঘরানার কিছু ধ্রুপদ সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর *ক্রমিক পুস্তক মালিকা* গ্রন্থের জন্য। পরবর্তীকালে উজীর খাঁ'র সেই ঠুমরির ধারা– সগীর খাঁ, দবীর খাঁ এবং রামপুরে ছম্মন সাহেবের শিষ্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তী পর্যন্ত দেখা যায়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, রামপুরে সকলের ঠুমরি ধারার উৎসমূলে ছিল সনদ পিয়া এবং যার সূত্রপাত হয়েছিল রামপুরের নবাব ইউসুফ আলীর দরবারে ঠুমরী পরিবেশনের মাধ্যমে। এতৎসত্ত্বেও রামপুর ঘরানার ঠুমরী গানের চর্চা অতটা জনপ্রিয় হতে পারেনি (অমল, ১৯৯৫)।

উজীর খাঁ আনুমানিক ১৮৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মসুত্রেই রামপুর নিবাসী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর নবাবভ্রাতা হায়দার আলীর কাছে রামপুরে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীকালে বারানসীতে মাতামহ সম্পর্কিত নিসার আলী, সাদিক আলী এবং বড়কু মিঞার কাছে তালিম নেন। রামপুর থেকে তিনি কাশীতে যাতায়াত করতেন। ১৮৯২ সালে কলকাতায় আগমনের আগেও তিনি রামপুর কেন্দ্রে যুক্ত ছিলেন। কলকাতায় সাত বছর অবস্থানের পর তিনি রামপুর দরবারে স্থায়ীভাবে যোগ দেন। কলকাতায় অবস্থানকালীন বেশকিছু প্রতিভাবান বাঙালি তাঁর কাছে শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। এঁদের মধ্যে কলকাতার শিমুলিয়া নিবাসী হাবুদত্ত নামে সুপরিচিত অমৃতলাল দত্ত (এসরাজ ও সুরবাহার বাদক, ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক এবং বিখ্যাত

সুরশৃঙ্গার বাদক), ভবানীপুরের প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যাদরেন্দ্র নন্দন মহাপাত্র যিনি উজীর খাঁ'র কাছে সুরবাহারের শিক্ষা পেয়েছিলেন- প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। উজীর খাঁ কলকাতা থাকাকালীন আলাউদ্দিন খাঁ কিছুদিন তাঁর কাছে তালিম নেন। পরবর্তীকালে আলাউদ্দিন খাঁ রামপুরে গিয়ে উজির খাঁ'র কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। উজীর খাঁ ১৮৯৯ সালে রামপুর দরবারে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হবার পর গঠিত হয় তাঁর প্রধান শিষ্যমণ্ডলী। ফলে রামপুর ঘরানার ধারা রক্ষা পায় কারণ, যেহেতু রামপুর ঘরানা একটি বৃহৎ সেনী ঘরানারই শেষ পর্যায় এবং তার বাহক হলেন স্বয়ং উজীর খাঁ, তাই তাঁর নেতৃত্বে রামপুর ঘরানা স্বমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে থাকে। রামপুরে যাঁদের তালিম দিয়ে উজীর খাঁ শিষ্যসম্প্রদায় গঠন করেন তাঁদের মধ্যে মহম্মদ হোসেন (বীণকার), নাসির আলি (সেতারি, সুরবাহারি), সৈয়দ ইব্বন আলী (হারমোনিয়াম বাদক), আলাউদ্দিন খাঁ (সরোদি), আব্দুর রহিম (সেতারি), হাফেজ আলী (সরোদি), মেহেদী হোসেন (ধামার), মুস্তাক হোসেন (ধামার, আলাপ), নবাব হামিদ আলী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য (দিলীপ, ১৩৮৪)।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ মাইহার দরবারে অবস্থানকালে বিভিন্ন সময় যোগ্যশিষ্য তৈরি করে তিনি আধুনিককালের সংগীতের ইতিহাসে এক সুবর্ণ অধ্যায় রচনা করেছিলেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে আলী আকবর (সরোদ), রবিশংকর (সেতার), পান্নালাল ঘোষ (বাঁশি), অন্নপূর্ণা, পৌত্র আশীষ খাঁ, তিমির বরণ ভট্টাচার্য (সরোদ), আলী আহম্মদ (সেতার), বাহাদুর খাঁ, (সরোদ), রাজা রায় (সেতার), যতীন্দ্র ভট্টাচার্য (সরোদ), নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় (সেতার), বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সরোদ), ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য (সেতার), অজয় সিংহ রায় ও বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

আলাউদ্দিন খাঁ'র সামসময়িক তানসেনের কন্যাবংশের শেষ বীণকার ধ্রুপদি এবং রামপুর ঘরানার ঐতিহ্যের সমাপ্তি পর্যায়ের অন্যতম আচার্য স্থানীয় সেনিয়া ছিলেন দবির খাঁ যিনি বাংলার সংগীতসমাজে এই ঘরানাকে বহুল প্রচলিত করেন। তিনি রামপুর থেকে ১৯৩৪ সালে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি তানসেন বংশের কুলপ্রদীপস্বরূপ ঘরানাদার শিক্ষার মাধ্যমে বিরাট বাঙালি শিষ্যগোষ্ঠী গঠন করেন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ক্ষেত্রমোহন ঠাকুর (বীণা), কৃষ্ণচন্দ্র দে (ধ্রুপদ), বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (বীণা, ধ্রুপদ), বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় (খেয়াল), জয়কৃষ্ণ সান্যাল (ধ্রুপদ), রাধিকা মোহন মিত্র (সরোদে রাগালাপ), প্রকাশ সেন (বীণা), রাজা রায় (সেতার), জিতেন্দ্র মোহন সেন গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। দবীর খাঁ কলকাতাবাসী হবার কয়েক বছর পূর্বে উজীর খাঁ'র পুত্র সগীর খাঁ কলকাতায় অবস্থান করেন। তিনি খুব বেশি সময় কলকাতায় অবস্থান করেননি। তবে তাঁর সঙ্গে কলকাতার সংগীতক্ষেত্রের একটা সংযোগ থেকে যায়। তিনি রামপুর থেকে প্রায়ই কলকাতায় আসতেন। তাঁর কাছে যে ক'জন বাঙালি গুণী শিক্ষালাভ করেন তাঁদের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন ঠাকুর, বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি উত্তম ঠুমরি গাইতেন এবং সেসব ঠুমরি তিনি পিতা উজীর খাঁ ও ছম্মন সাহেবের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন।

রামপুর ঘরানার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী রামপুরনিবাসী মেহেদী হোসেন ১৮৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বনিয়াদ হোসেন। শুরুতে তিনি পিতার কাছেই সারেঙ্গি বাদনে শিক্ষালাভ করেন। সারেঙ্গি বাদক হলেও কণ্ঠসংগীতের বিভিন্ন রীতিতে মেহেদী হোসেন

অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি রামপুর থেকে পেশাদার জীবনযাপনের জন্য কলকাতায় আসেন এবং শিষ্যগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। উজীর খাঁ'র জ্যেষ্ঠ পুত্র নাজির খাঁ ছিলেন তাঁর অন্যতম প্রধান উত্তরসাধক এবং প্রিয় পুত্র। কিন্তু নাজির খাঁ'র (প্যারে খাঁ) অকাল মৃত্যুতে নিদারুণ শোকে দুই বছর পরেই উজীর খাঁ'র মৃত্যু হয় (১৮২৬)। তবে তার আগেই তিনি তরুণ পৌত্র দবীর খাঁকে যথাসাধ্য তালিম দেন। উজীর খাঁ'র মৃত্যুর দুই বছরের মধ্যে রামপুরের নবাব হামিদ আলীরও জীবনাবসান হওয়ায় চূড়ান্ত সংকট দেখা দেয় দরবারনির্ভর রামপুর ঘরানায়। উজীর খাঁ'র পুত্র সগীর খাঁ এবং অন্য গুণীরা রামপুর ত্যাগ করেন। ফলে রামপুরের সংগীত দরবার নিষ্প্রদীপ হয়ে যায়।

রামপুর ঘরানা প্রধানত তন্ত্রবাদ্যের ঘরানা হলেও বিভিন্ন রীতির কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত চর্চার জন্য এই ঘরানা বিখ্যাত হয়। সম্পূর্ণ পদ্ধতির এবং ধ্রুপদাঙ্গ রাগালাপ এই ঘরানার সংগীতচর্চার ভিত্তিস্বরূপ। এই ঘরানার বিখ্যাত খেয়াল গায়ক নিসার হুসেন খাঁ তাঁর গায়নশৈলীতে প্রথমে আলাপ ছাড়াই দ্রুত লয়ের বন্দিশ করতেন। তারপর দ্রুততান, বোলতান, জোড়-বোলতানের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ঘরানার গায়নশৈলী ফুটিয়ে তুলতেন। মুস্তাক হুসেন খাঁ তাঁর গানে ছোটো ছোটো লয়কারী, আকার যুক্ত তান এবং বিভিন্ন ছন্দের লয়কারী প্রয়োগ করতেন।

এই ঘরানার গায়কির সাথে গোয়ালিয়র ঘরানার গায়কির মিল রয়েছে। জটিল তান এবং তারানা গায়কির জন্যও রামপুর ঘরানা বিখ্যাত। তবে বর্তমানে ওস্তাদ নিসার হুসেন খাঁ'র পৌত্র রাশিদ খাঁ রামপুর (সহসওয়ান) ঘরানাদার গায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি খ্যাতিলাভ করেছেন। তিনি স্বীয় প্রতিভা দ্বারা তাঁর তালিম পূর্ণ করেছেন। তাঁর কণ্ঠে স্বর প্রয়োগের মধ্যে যে আবেগ আছে তা সচরাচর এই ঘরানার অন্য ওস্তাদদের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁর গায়কিতে ওস্তাদ নিসার হুসেন খাঁ'র প্রভাব লক্ষণীয়। রাশিদ খাঁ'র বিস্তারে কিরানা ঘরানারও প্রভাব দেখা যায় কারণ তিনি অপরিসর গণ্ডির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে স্বকীয় একটি গায়কি তৈরি করে নিয়েছেন।

ধ্রুপদাঙ্গের রাগালাপ এবং ধ্রুপদি মেজাজের গায়ন রামপুর ঘরানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এতে তান, বোলতান, সরগম প্রভৃতি যথেষ্ট কিন্তু সুসংগতরূপে প্রযুক্ত হয়। এই ঘরানার শিল্পীরা উৎকৃষ্ট তারানা গায়করূপে বিখ্যাত। রামপুর ঘরানার গায়কির বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই ঘরানা অনেক জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

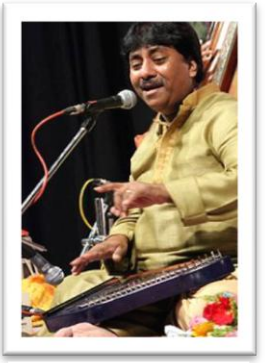
রামপুর ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র :



ওস্তাদ এনায়েত হোসেন খাঁ



ওস্তাদ নিসার হোসেন খাঁ



ওস্তাদ রশিদ খাঁ

ছবিসূত্র

১. http://www.prasadkhaparde.com/Gharana.htm
২. https://www.discogs.com/artist/2808362-Nissar-Hussain-Khan
৩. https://en.wikipedia.org/wiki/Rashid_Khan_(musician)#/media/File:U

সহায়কপঞ্জি

অমল দাশ শর্মা (১৯৯৫)। *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*। কলকাতা : দরবারী প্রকাশন।

দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৮৪)। *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*। কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা. লি.।

নজরুলের নাটকে লোক-উপাদানের ব্যবহার

শারমিন মুস্তারী*

[সারসংক্ষেপ : কিশোর বয়সে লেটো দলের জন্য পালা রচনার মধ্য দিয়ে নজরুলের নাট্যচর্চা শুরু। কাজী নজরুল ইসলামের পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা খুব কম। তাঁর বেশিরভাগ নাট্যকর্মই নাটিকা, গীতিনাট্য, বেতারনাট্য ও রেকর্ডনাট্য। নজরুলের সাহিত্যকর্মের মধ্যে নাটক অনেকটা উপেক্ষিত। অথচ নাটকের মাধ্যমে তাঁর প্রতিভার বিশেষ দিক গীতিপ্রবণতা ও লোক-ঐতিহ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ পরিলক্ষিত হয়। তিনি মূলত গীতিকবি ও গীতিকার। নাটক রচনায় তাঁর সযত্ন প্রয়াস ছিল, বলা যায় না। তাঁর নাটক শৈল্পিক মানদণ্ডে সবক্ষেত্রে উত্তীর্ণ না হলেও লোকজীবন ও ঐতিহ্যের প্রতি তিনি যে সম্মান দেখিয়েছেন এবং নাটকে স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, তা-ই তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।]

বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) পরিচয় প্রধানত কবি এবং সুরস্রষ্টা হিসেবে। তবে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও নাটক– সাহিত্যের এসব শাখাতেও তাঁর সাবলীল বিচরণ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ দিক হতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিক পর্যন্ত হলো নজরুলের সাহিত্যজীবন। যুদ্ধোত্তর দুঃখবাদ, নৈরাশ্যবাদ, মৃত্যুচেতনা প্রভৃতি মৌল বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে কাজী নজরুল তাঁর রচনায় নিয়ে আসেন উজ্জ্বল আশাবাদ।

কিশোর বয়সে গ্রাম্য যাত্রাদলের সংস্পর্শে এসে গীতিনাট্য রচনার মধ্য দিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। বাংলার অন্যতম প্রধান লোকনাট্য-আঙ্গিক 'লেটোর' দলের জন্য পদ্যে নাটক রচনা করে বা পালা রচনার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল নজরুলের নাট্য-প্রতিভার বিকাশ। বাংলা নাটকের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) সামসময়িক নাট্যরচনায় স্বকীয় অবস্থান তৈরি করেছিলেন স্বীয় প্রতিভায়। নজরুল সে-সময় রবীন্দ্র-প্রভাবকে উপেক্ষা করে নাটকের বিষয় ও শিল্পচারিত্র্যে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। নজরুল ছিলেন আপাদমস্তক একজন নাট্যপ্রেমী। তাঁর সাহিত্যকর্মের পরিধির একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে নাটক, নাটিকা, নাট্যধর্মী রচনা, রেকর্ড নাট্যসহ বৈচিত্র্যপূর্ণ রচনা। এসব নাট্যকর্ম ব্যাপক পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও গবেষণার দাবি রাখে। অনুপম হায়াৎ কাজী নজরুল ইসলামের মোট ৮০টি নাট্যকর্মের তালিকা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য :

> নজরুল প্রতিভা যেমন অনন্য সাধারণ তেমন অপরিমেয়। প্রতিকূল পরিবেশের শিকার হয়েও নজরুল তাঁর সৃষ্টি কাজ অব্যাহত রেখেছেন। সেই সৃষ্টির এক সরব ক্ষেত্র ছিল নাটক। নজরুলের নাট্যজীবন, নাট্যকর্ম, নাট্যচর্চা, নাট্যভাবনা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর নাট্য সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত তথ্য ও নিদর্শন এখনো রয়ে গেছে অনুদ্ধারিত। এ পর্যন্ত তাঁর নিজের লেখা নাটক ও নাট্যধর্মী রচনার মধ্যে প্রায় ৮০টির নাম পাওয়া গেছে, আর তাঁর গান লেখা ও সুর সংযোজিত অন্যের লেখা নাটকের সংখ্যা পাওয়া গেছে ৫০টির মতো। এসব সংখ্যার মধ্যে নজরুলের পূর্ণাঙ্গ নাট্য জীবনের পরিচয় না পাওয়া গেলেও তাঁর প্রতিভা ও সৃষ্টির অবদানে বাংলা নাটক হয়েছে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় এ কথা নিঃসন্দেহে বলা হয়। (অনুপম, ১৯৯৭ : ৪৮)

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

কাজী নজরুল ইসলামের চাচা ফজলে করিম ছিলেন স্থানীয় লেটো দলের ওস্তাদ। তার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় নজরুল লেটোদলে যোগ দিয়ে খুব দ্রুত খ্যাতি অর্জন করেন। মাত্র ১১/১২ বছর বয়সে তিনি লেটোদলের জন্য অনেকগুলো পালা রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে 'শকুনিবধ', 'মেঘনাদবধ', 'রাজপুত্র', 'চাষার সঙ', 'বিদ্যাভূতুম', 'কবি কালিদাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই লেটোদলকে কেন্দ্র করেই নজরুলের সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাঁর নাট্যচর্চার সূত্রপাতও এই লেটোদলকে কেন্দ্র করে। নাচ-গান-অভিনয় সমৃদ্ধ লেটোগান রচনার মধ্যদিয়ে একদিকে তিনি বাংলার লোকনাট্য ধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন; আবার পরিণত বয়সেও তিনি এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখেন।

'সংস্কৃতির প্রধান বাহনটির নাম লোকসংস্কৃতি' (মাহবুব, ২০০১ : ৯১)। লোকসংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানই হলো লোক-উপাদান। এসব উপাদানের ব্যবহার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে যেমন দেখা যায়, তেমনি আধুনিক সাহিত্যেও এর ব্যবহার রয়েছে। বলতে গেলে উত্তরাধুনিক সাহিত্যের মর্মমূল পর্যন্ত গ্রথিত লোক-উপাদান।

নজরুল বৃহত্তর লোকজীবনের অনেক অনুষঙ্গ-উপাদান-উপকরণ ব্যবহার করেছেন তাঁর গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে, উপন্যাসে এবং নাটকে। এর কারণ নজরুল লোকজীবনের কবি। বৃহত্তর গণমানুষের পক্ষে আজীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন। একদিকে তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক অন্যায়-অবিচার, রাষ্ট্রের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছেন, অন্যদিকে বৃহত্তর লোক-জীবন থেকে উপাদান নিয়ে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

নজরুলের বাল্য ও কৈশোর জীবনজুড়ে আছে গ্রামীণ জীবনের নানা অনুষঙ্গ। তিনি মক্তবে পড়েছেন, সেখানে পড়িয়েছেন। লেটোদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্ধমান অঞ্চলের লোক জীবনের সবটাই তাঁর মনে গাঁথা ছিল সেই ছেলেবেলা থেকে। লোকজীবনের প্রভাব তাঁর সাহিত্যে তাই অনেকটা স্বাভাবিকভাবে গ্রথিত হয়েছে। নজরুলের নাট্য-প্রতিভার প্রকাশ শুরু আবহমান বাংলার লেটোগান রচনার মধ্যদিয়ে। সে হিসেবে বলা যায় নজরুল নাটকের জগতে পা দেন লোকনাটকের অভিজ্ঞতা নিয়ে। বাংলার আবহমানকালের গীতিবহুল লোকযাত্রার রূপকল্পকে কাজে লাগিয়ে নজরুল নতুন ধারার নাট্যরচনায় হাত দেন। লোকনাটকের আঙ্গিক নিয়ে সমালোচকের অভিমত এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় :

> আমাদের নাট্যসাহিত্যকে অভিনয়রীতি এবং আনুষঙ্গিক ভিত্তি অনুযায়ী দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটি গ্রামীণ যাত্রারীতি, অপরটি প্রচলিত নাটকরীতি। যাত্রা, লোক ভাষায় রচিত এবং বিশেষ লোকনাট্যের ঢং-এ গ্রাম্য সমাজের উপযোগী আসরে গীত বা অভিনীত হয়। যাত্রার জন্য কোন ব্যয়বহুল রঙ্গমঞ্চ, সাজসরঞ্জাম, বা আর্থিক আয়োজনের তেমন প্রয়োজন হয় না। গান এবং অভিনয় কৌশলই যাত্রার প্রধান উপকরণ। আমাদের গ্রাম্য-সমাজের আনন্দোৎসবে নৃত্য, গীতবাদ্যের আবেদন অধিক হওয়ায়, যাত্রা নাটকের রূপায়ণ, রীতিতেও গীতিবাদ্যের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। যাত্রার প্রাথমিক রূপই গীতিনাট্য বা গীতিবহুল নাটক। (আরিফুল, ১৯৯৯ : ৪৩)

লেটোগান রচনার মধ্যদিয়ে নজরুলের নাট্যচর্চার হাতেখড়ি। লেটোগান বর্ধমান অঞ্চলের গান-নাচ-অভিনয়ের একটি মিশ্রধারা। গ্রামীণ-জীবনের অনেক বিষয় নজরুলের মনোজগতে প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর নাট্যরচনায় সে-সবের ছায়া রয়েছে। গ্রামের সাধারণ মানুষের চলমান জীবনে যে সংস্কৃতি বহমান তা-ই লোক-ঐতিহ্য। তারা পুরুষানুক্রমে অনেক কিছু অনুকরণ-অনুসরণ-

অনুধাবন করে যার কার্যকারণ সম্পর্ক যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা চলে না। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নজরুলের নাটকেও লোক ঐতিহ্য ও লোক-উপাদান বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। তাঁর নাটকে লোক-অনুষঙ্গের মধ্যে রয়েছে : ১. গ্রামীণ জীবনের বর্ণনা, ২. লোকসংস্কার, ৩. লোকবিশ্বাস, ৪. লোকগান, ৫. ছড়া।

নজরুল তাঁর নাট্যসম্ভারে লোকজ উপাদানের প্রতি অকৃত্রিম দরদ দেখিয়েছেন। লোকবিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস, লোকসংস্কার, আচার-প্রথা, পার্বণ-সংক্রান্ত গ্রামীণ-চেতনা নজরুল-রচনায় নানাভাবে মিশে আছে। অন্তরীক্ষে জিন-পরী অপ্সরা, মর্ত্যে ভূত-প্রেত, আলেয়া, রাক্ষস-খোক্ষস, পানিতে জলদানো ইত্যাদি অলৌকিক অশরীরী আত্মা সম্পর্কে বিশ্বাস-সংস্কারের চিত্র রয়েছে নজরুলের নাটকে। গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের কারণে নজরুলের নাটকে লোক-সংস্কৃতির বিষয়টি সহজ-সরলভাবে বর্ণিত হয়েছে। গ্রাম বাংলার সমাজ জীবনে দীর্ঘদিন লালিত লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার চমৎকার অনুষঙ্গ হয়েছে তাঁর নাটকে।

সাপ নিয়ে লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার বাংলাদেশে অতি পরিচিত। বেদেরা ভূত-প্রেত, জাদু-টোনা, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবচ প্রভৃতি পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে থাকে। বেদে সম্প্রদায় ও তাদের জীবনাচরণ নিয়ে রয়েছে 'বনের বেদে' নাটিকা। নজরুল বেদের জীবন সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেই তাদের নিয়ে নাটক লিখেছেন। তিনি তাদের ঝাপান গানের সুর ও রাগ অনুসারে গান রচনা করেছেন। এ ধরনের একটি গান :

নিম ফুলের মৌ পিয়ে ঝিম হয়েছে ভোমরা
মিটে হাসির নূপুর বাজাও ঝুমুর নাচো তোমরা।
(নজরুল, ২০০৮ : ৩২৫)

লোক-বিশ্বাসের চিত্র রয়েছে 'বিলাতী ঘোড়ার বাচ্চা' নাটিকায়। কিরা কাটা, কসম কাটা, ভূতে বিশ্বাস– এগুলো লোকবিশ্বাসের অন্তর্গত। নাটকটিতে লটারি জেতার কাল্পনিক টাকা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, এক পর্যায়ে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রহার- সমস্ত ঘটনার পর স্ত্রীটির বিশ্বাস জন্মেছে যে তার স্বামীকে বিলাতী ঘোড়ার ভূতে পেয়েছে। নাটিকাটির আর এক জায়গায় স্ত্রী প্রতিজ্ঞা করে এভাবে :

আমি যদি এক বাপের বিটি হই, তবে আমার
গয়না আগে হইব। তারপর অন্য কিছু।
(নজরুল, ২০০৮ : ২২৪)

রূপকথা গ্রামাঞ্চলে খুবই জনপ্রিয়। গ্রামীণ জীবনে দেখা যায়, অবসর সময়ে নানী, দাদী, চাচী, ফুফুদের কাছে শিশু-কিশোররা রূপকথা শুনতে চায়। জিন-পরি, দৈত্য-দানব, রাজা-রানীর বাহিনী লোক সংস্কৃতিরই বিশিষ্ট রূপ। 'মধুমালা' নাটকে লোকজীবন রূপায়িত হয়েছে। নাটকটি লোকগাথা-ভিত্তিক। পূর্ববঙ্গ গীতিকা থেকে এর কাহিনি নেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এখানে রাজা-রানি, রাজকন্যা, পেতনি, স্বপ্নপুরী প্রভৃতি রূপকথার নানা অনুষঙ্গ রয়েছে। ময়ূরবাহন, শুকশারি প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। 'মধুমালা'কে লোক-ঐতিহ্যের আধুনিক রূপায়ণ বলা যায়। নজরুল 'মধুমালা'র কাহিনিকে কলকাতার মঞ্চের উপযোগী করে সাজিয়েছিলেন। 'বাংলা সাহিত্যের লোক ঐতিহ্যের বা রূপকথার আধুনিক রূপায়ণের ক্ষেত্রে 'মধুমালা' একটি বিশিষ্ট সংযোজন'(রফিকুল, ২০০১ : ৪২৬)। 'মধুমালা' নাটকে লোকবিশ্বাসের একটি চিত্র নিম্নরূপ :

অয়স্কান্ত : আজ্ঞে, যদি কাছে শ্যাওড়া গাছ না থাকে, আমি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারি। এই তিনদিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে চোখ-মুখ হয়ে গেছে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতের মত, পেট হয়ে গেছে মাড়োবারের, পা ফুলে হয়ে গেছে উড়িষ্যার, পেটের ভিতর ঝগড়া করছে মাদ্রাজি। আমি একেবারে আন্তর্জাতিক পুরুষ হয়ে পড়েছি। এখন একটু ঘুমুতে না পারলে প্রাণ চলে যাবে চিত্রগুপ্তের দেশে- দেহ নিয়ে টানবে শ্যাওড়া গাছের পেত্নি। (ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন)

রুদ্রকুমার : আচ্ছা বয়স্যদা, পেত্নি নিয়ে যে ঘর করে, তার এত পেত্নির ভয় কেন? তা ছাড়া তোমার শ্বশুরালয়ও ত পেত্নিতলা গ্রামে আর মামার বাড়ি শেওড়া-ফুলিতে। কাজেই শেওড়া গাছ বা পেত্নিকে ত তোমার ভয় করার কথা নয়।

অয়স্কান্ত : তুমি থাম ত হে ছোকরা। তুমি শুধু মানুষ জবাই করতে শিখেছ। মানুষকে পোষ মানানোর গুরুভার কখনো বহন করেছ? বৃষস্কন্ধ পুরুষই নারীকে বয়ে বেড়াতে পারে সংসারে। যুদ্ধে তোমার শোভা যেমন তোমার কোমরের তলোয়ার, তেমনি সংসার যুদ্ধে পুরুষের শোভা তার কাঁধের স্ত্রী, বুঝেছ? (নজরুল, ২০০৮ : ২৭৬)

শুধুমাত্র লোকসাহিত্যের আঙ্গিকেই নাটকটি রচিত নয়। পুরো নাটকে ছড়িয়ে আছে এরকম অসংখ্য লোক-উপাদান, লোক-বিশ্বাসের ছবি।

লোক-উপাদানের আর একটি দিক হলো গ্রামবাংলা তথা গ্রামীণ-জীবনের বর্ণনা। 'কলির কেষ্ট', 'কালোয়াতি কসরৎ' ও 'পুরোনো বলদ নতুন বৌ' নাটিকায় গ্রাম বাংলার সমাজ জীবনের চমৎকার বর্ণনা রয়েছে। 'কলির কেষ্ট' নাটিকায় গ্রাম বাংলার উচ্ছৃঙ্খল তরুণদের চিত্র রয়েছে। 'পুরোনো বলদ নতুন বৌ' নাটিকায় গ্রাম বাংলার চিরন্তন দাম্পত্য সম্পর্কের মধুর রূপটি ফুটে উঠেছে। যেখানে রয়েছে মা, ছেলে, ছেলে বৌ। আছে গ্রামবাংলার পিঠা-পুলির প্রসঙ্গ। কাজলা বিল, লজ্জা রাঙা গ্রাম্য বধূ– সব মিলিয়ে চমৎকার গ্রামীণ-পরিবেশ। গ্রামবাংলার পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনের একটি ছবি :

মা ॥ কেডা? বাবা পুঁইটা আইছস? অ গুইলা, গুইলা, ছ্যামড়া গেল কই? আলো বাত্তিডা ধর-

গাড়োয়ান ॥ গুইলা ক্যান? বাড়ির কি আর মানুষ-জন নাই, সব মরছে? সবাইকে দেখবার পাইতেছি, কাউকে দেখবার পাইতেছি না ক্যান?

মা ॥ আচ্ছা বাবা, তুই খাড়া হ, আমিই গিয়া আলো-বাত্তিটা লইয়া আস্‌তেছি।

গাড়োয়ান ॥ তুমি বুড়া মানুষ, তুমিই বা আন্‌বে কিসের লাইগ্যা? বাড়িতে কি আর মানুষ জন নাই, সব মরছে? সবাইরে দেখ্‌ছি মানুষের দেখবার পাইতেছি না যে!

মা ॥ (হাসিয়া) অ, তুই বৌমারে খুঁজত্যাছস্। বৌমা, অ বৌমা, আলো-বাত্তিতা ধর গো, আমাগো পুঁইটা আইত্যাছে। (নজরুল, ২০০৮ : ২৭৭)

'কালোয়াতি কসরৎ'ও গ্রামীণ-জীবন নির্ভর নাটিকা। নজরুল মূলত গীতিকার ও সুর-স্রষ্টা। তাঁর গানে রয়েছে বৈচিত্র্যময় সুর। লোকগান নিয়ে তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। লোকগানের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার দেখা যায় তাঁর নাটকে। 'কালোয়াতি কসরৎ'-এ কালোয়াতি গানের প্রসঙ্গ রয়েছে। যেমন :

গাব্বুসের বাপ : অইগ্যা পেন্নাম ওই পতিতুণ্ডী ঠাউর। আইগ্যা, তুমি আপনি যাইবার লাগছে কই? আহা হাহা! ওদিক পানে যাইওনা ঠাউর! ময়লা আছেন-ময়লা আছেন-মানুষের ময়লা!

পতিতুণ্ডী : কে ও? গাব্বুসের বাপ? হল্লারে বিল্লা। নক্কুরে আইছিল। রামচন্দ্র। বাবা গাব্বুসের বাপ। বাইচা থাহ বাবা কইচা থাহ বাবা। তুমি না কইলে এহনি আমি ঐ ময়লাতে পারা দিচ্ছিলাম। তা

হেরে কি কয়, মুই যাইত্যাচি বৈকুন্টু তলাপাত্রের বাড়িতে। তলাপাত্র বুঝলি? বেডপ্যান, বেড্যান। কলা বুঝছ? হেই তলাপাত্রের বাড়িতে কালোয়াতি গান হইব-হেরে হুনবার যাইতেছি।

গাব্বুসের বাপ : কালো হাতির গান? আইগ্যা কি যে কন। মুইত বাপের জন্মেও কালো হাতির গানও হুনছি না। সার্কসে কালি হাতির নাচ দেখছি-গান ত হুনছি না। মো গো গোরিব গো কি যাইবার দিব?

পতিতুণ্ডী : (হাসিয়া) আরে কালো হাতির গান নয়; কালোয়াতি গান। আইও মোর লগে, যাইবার দিব না কিসের লাইগ্যা। (নজরুল, ২০০৮ : ২৭২)

লোকখেলা, ছড়া লোক-সংস্কৃতির উপাদান। নজরুল লোকখেলা নিয়ে বেশ কয়েকটি শিশুতোষ নাটিকা রচনা করেছেন। 'পুতুল খেলা', 'ছিনিমিনি খেলা', 'কানামাছি', 'কিৎকিৎ খেলা' প্রভৃতি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। 'পুতুলের বিয়ে' নাটকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এখানে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির একটি নিটোল ছবি নজরুল আমাদের উপহার দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

পাঁচটি ছোট ছোট মা তাদের পুতুল ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে কখনো আদর করে ছড়া কাটে, কখনো বিয়ের গান গায়। এই সব ছড়া আর গানের ধ্বনি প্রতিধ্বনি তাদের আঞ্চলিক ভাষা, দৃষ্টিভঙ্গি সংস্কৃতি ইত্যাদির অনেক টুকরো পরিচয় নাটকটিতে ছড়িয়ে আছে। আঞ্চলিক লোক সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসেবে এগুলি যথেষ্ট মূল্যবান। (মোতাহেরা, ২০০১ : ৬৬)

'জুজুবুড়ির ভয়'-এ রয়েছে কিৎকিৎ খেলার প্রসঙ্গ। এটিও গ্রামবাংলার অতি পরিচিত লোকখেলা। রয়েছে জুজুবুড়ির প্রসঙ্গ। জুজুবুড়ি এক ধরনের লোকবিশ্বাস। দুষ্ট ছেলেমেয়েদের মা তাদেরকে জুজুবুড়ির ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করে। নাটকের জুজুবুড়ি ছেলে ধরা নয় বরং মা ধরা। এছাড়া এখানে রয়েছে ঘুমপাড়ানি গান। ঘুমপাড়ানি গান লোকগীতির অন্তর্ভুক্ত। ঘুমপাড়ানি গানটি এরকম :

ঘুম আয় ঘুম। ঘুম আয় ঘুম।
নিশুতি দুপুর, নিশীথ নিঝুম।
ঘুম আয় ঘুম, ঘুম আয় ঘুম!
টুলটুল ঝিঙে ফুল ঘুমে ঝিমায়
ঝুমকো লতায় ঝিঝি আলসে ঘুমায়।
খোকনের চোখে দেয় ঘুম-পরি চুম
ঘুম আয়, ঘুম।
(নজরুল, ২০০৮ : ৩৬৪)

ছিনিমিনি খেলা ও কানামাছি খেলা নিয়ে রয়েছে দুটি নাটক 'ছিনিমিনি খেলা' ও 'কানামাছি'। এসব খেলা এবং এখানে ব্যবহৃত ছড়াগানগুলো লোকজীবনে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কানামাছি খেলায় একজন চোর হয়। তার চোখ বেঁধে দিয়ে চারদিক থেকে তাকে টোকা দেওয়া হয়। চোর চোখ বাঁধা অবস্থায় অন্যদের ধরার চেষ্টা করে আর ছড়া কাটে :

কানামাছি ভোঁ ভোঁ
যাকে পাবি তাকে ছোঁ।
(নজরুল, ২০০৮ : ৩৬৭)

খেলায় চোর নির্বাচন করা হয় ছড়া কেটে। ছড়ার শেষ শব্দটি যার দেহ স্পর্শ করে সে-ই চোর হয়। ছড়া লোক-সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা। নজরুলের শিশুতোষ নাটিকায় ছড়ার ব্যবহার রয়েছে। ছড়াও শিশুতোষ রচনা। ছড়া আর শিশু অভিন্ন সত্তা। তার নাটকে আর একটি লৌকিক ছড়া :

আইকম, বাইকম তাড়াতাড়ি
যদুমাষ্টার শ্বশুর বাড়ি
রেনকম ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম।
(নজরুল, ২০০৮ : ৩৬৬)

ছড়াটি লোকসমাজে আজও প্রচলিত।

ছিনিমিনিও লোকখেলা। খোলামকুচি ছুঁড়ে এই খেলা খেলতে হয়। এই নাটিকাটিতে লোক-বিশ্বাসজাত 'জল-দানো'র প্রসঙ্গ রয়েছে। 'জুজুবুড়ি'ও প্রেতাত্মা। প্রেতাত্মা ডাইনির রূপ ধারণ করে ঘুরে বেড়ায়। 'জুজুবুড়ির ভয়' নাটিকায় ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে শোনা যায় :

মা গো, তোরে সত্যি বলি, দেখে এলাম ছাদে গিয়ে,
মা-ধরা এক জুজুবুড়ি বসে আছে ঝুলি নিয়ে।
বললে, যে মা খোকায় ধরে যখন তখন দুধ খাওয়ায়
চুলের মুঠি ধরে তার তিন সের দুধ খাওয়াই তায়।
খবরদার মা, দুধ খেতে আর বলিসনে কো দোর দিয়ে।
(নজরুল, ২০০৮ : ৩৬৪)

'আলেয়া' নাটকে আলেয়া এক ধরনের লোক-বিশ্বাস। রাতের অন্ধকারে পথহারা মানুষকে বিভ্রান্ত করা তার কাজ। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের ভাবনা উপস্থাপন করা যায় :

> ভূগর্ভস্থ এক জাতীয় গ্যাস বাতাসের ঘর্ষণে জ্বলে— দিনের আলোয় তা দেখা যায় না, কিন্তু রাত্রে দেখা যায়। সাধারণ মানুষ একেই 'আলেয়া' বলে জানে। জলাভূমিতে আলেয়ার জন্ম; ভ্রান্ত পথিককে পথ ভুলিয়ে ঘুরানো এর ধর্ম— কবির এরূপ ব্যাখ্যা লোকসম্মত হয়েছে। 'নিশি' আলেয়ার মতো রাত্রিবেলার প্রেতাত্মা— নিশি ঘুমন্ত মানুষকে ডাক দিয়ে বাইরে নিয়ে নানারূপ হয়রানি করে, এমনকি জলাশয়ে নিয়ে হত্যাও করে।(ওয়াকিল, ২০০১ : ৮৬)

নিসর্গের ব্যবহার লোক-উপাদানের পর্যায়ভুক্ত। 'বাসন্তিকা' লোকনাটক। এখানে রয়েছে ফুল, পাখি, ঋতু, দখিনা বাতাস, পঞ্চশর প্রভৃতি প্রসঙ্গ। যেমন :

> পঞ্চশর : শুনিতেছ, কি মধুর গান আসে ভেসে?
> চৈতালি : তোমাদের রাজার বন্দনা গাহিতেছে বনলক্ষ্মী।
> বলিতে কি পার বন্ধু তুমি কি করিছে রাজা-রানি কুঞ্জে নিরালায়?
> দখিন হাওয়া : আমি যদি চলে যাই এই স্থান ত্যাজি যা করিবে নিরালাতে তোমরা দু'জন-তেমনই একটা কিছু। বেশি কিছু নহে।
> (নজরুল, ২০০৮ : ৩৫৯)

নজরুলের নাটক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তার অধিকাংশ নাটকই নাট্যরস নিষ্পত্তিতে প্রত্যাশিত মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়নি। তাঁর নাটকে নেই কোনো উজ্জ্বল চরিত্র কিংবা সুবিন্যস্ত কাহিনি।

নেই নাটকের পক্ষে অপরিহার্য উপাদান গতিবেগের পুরোমাত্রায় উপস্থিতি। ফলে সাধারণ অর্থে নাটক বলতে যা বোঝায় নজরুলের নাটক তা নয়। তা সত্ত্বেও বাংলা নাট্যসাহিত্যে তিনি একটি বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন– তা হলো গীতিনাট্যকার হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ।

নজরুল-প্রতিভার মূল শক্তি তাঁর কবি-সত্তা। তাঁর গদ্য রচনায়ও রয়েছে কবি-সত্তার স্পর্শ ও লাবণ্য। ফলে তাঁর নাটকের গদ্য সংলাপ, চরিত্রসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতিতে রয়েছে কাব্যের স্পর্শ। একইভাবে তিনি গণমানুষের কবি। জন ও জনতার কথা তাঁর সাহিত্যের মর্মমূলে বিরাজমান। নাট্যসাহিত্যও এ থেকে ব্যতিক্রম নয়। এই বিদ্রোহী সত্তার পাশাপাশি তাঁর আরেকটি পরিচয় হলো সহজ-স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি লোক-ঐতিহ্যের চর্চাকারী। নাটকে লোকজ উপাদান, উপকরণ, অনুষঙ্গের বহুমাত্রিক ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর কারণ :

> যুদ্ধে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নজরুল ছিলেন রীতিমত গ্রামীণ জীবনের মানুষ। এক কথায় তাঁর বাল্য-কৈশোর-তারুণ্যের বছরগুলো কাটে গ্রামীণ পরিবেশে। তবে তাঁর এই জীবন ছিল অন্য দশজন গ্রামের মানুষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অনেক ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যে ভরপুর। মক্তবের শিক্ষক মসজিদের মোয়াজ্জিন, রেলওয়ে গার্ডের খানসামা, রুটির দোকানের বয়, লেটোদলের গান রচয়িতা ইত্যাদি বিচিত্র ও বহুমুখী জীবন থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠ। লোকজীবনের এই মুক্ত পাঠশালায় লোক-ঐতিহ্য ও লোক-সংস্কৃতির নানা উপাদান মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। (সেলিম, ১৯৯৭ : ১৭)

নজরুল লোকায়ত জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে মনের গভীরে ধারণ করে লোকায়ত জীবনের প্রতিচ্ছবিকে তুলে আনতে ছিলেন সতত সচেষ্ট। তাঁর নাটকে লোক-ঐতিহ্যের প্রকাশ সুস্পষ্ট। লোক-ঐতিহ্যের প্রায় প্রতিটি শাখাতে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল। নাটকে লোক-বিশ্বাস, লোক-সংস্কার, ছড়া, গান স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

সহায়কপঞ্জি

অনুপম হায়াৎ (১৯৯৭)। *নাট্যকার নজরুল*। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
আরিফুল হক (১৯৯৯)। *নাট্যকার নজরুল ইসলাম*। নজরুল একাডেমি, ঢাকা।
ওয়াকিল আহমদ (২০০১)। *নজরুল লেটো ও লোক-ঐতিহ্য*। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
কাজী নজরুল ইসলাম (২০০৮)। *নজরুল রচনাবলী* (৫ম খণ্ড)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
কাজী নজরুল ইসলাম (২০০৮)। *নজরুল-রচনাবলী* (৬ষ্ঠ খণ্ড)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
কাজী নজরুল ইসলাম (২০০৮)। *নজরুল-রচনাবলী* (৭ম খণ্ড)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
কাজী নজরুল ইসলাম (২০০৮)। *নজরুল-রচনাবলী* (৮ম খণ্ড)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
মাহবুব হাসান (২০০১)। *নজরুলের কবিতায় মিথ ও লোকজ উপাদান*। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
রফিকুল ইসলাম (২০০১)। *নজরুল সাহিত্য*। মৌলী প্রকাশ, ঢাকা।
সেলিম জাহাঙ্গীর (১৯৯৭)। *লোকায়ত নজরুল*। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
সৈয়দা মোতাহেরা বানু (২০০১)। *নজরুলের শিশুসাহিত্য*। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

বিশ্বভারতী : রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্বসাধনা

মো. জফির উদ্দিন*

[সারসংক্ষেপ : আমৃত্যু রবীন্দ্র জীবনসাধনা ছিল মনুষ্যত্বেরই সাধনা। শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মনুষ্যত্ব অর্জনের উপায়। কিন্তু নোবেলবিজয়ী কবি বিশ্বপরিভ্রমণ করে এবং বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মনুষ্যত্বের পরাজয় দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ভেবেছিলেন বিশ্বসভ্যতায় ভারতেরও দেওয়ার কিছু আছে। ক্রমবর্ধমান ঔপনিবেশিক শিক্ষাপরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল ভারতের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় বা বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজসমূহে 'বাঁধা নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালিতে ডিগ্রি বানাবার কারখানাঘর বসেছে', কিন্তু সমাজে সত্যের জন্য কর্মের জন্য নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয়নি। প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের আদলে পাশ্চাত্যবিদ্যার সংযোগে জ্ঞানের তাপস কর্মের ব্রতীদের জন্যে 'তপোভূমি' রচনার দরকার। একইসঙ্গে দরকার ব্যাপকভাবে সংস্কৃতি-অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠারও। তখনকার ভারতে সাধনা বলতে সাধারণত আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা বা সন্ন্যাসের সাধনাই বুঝানো হতো, কিন্তু রবীন্দ্র-আশ্রম উদ্যোগে সাধারণ মানুষের 'চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে' কোনো লক্ষ্য ছিল না। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে-সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে, তার বাইরে গিয়ে সবরকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লিহিতসাধনের জন্য যেসকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তকেই তিনি সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বিদ্যার উদ্ভাবন ও বৈশ্বিক মানের স্বপ্ন নিয়ে দেশের 'সত্য বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার সংকল্পে রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শ বিদ্যালয়ের নাম দিয়েছিলেন 'বিশ্বভারতী'। চল্লিশ বছরের কর্মসাধনায় 'বিশ্বভারতী'কে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিশ্বসভায়, যার মূলমন্ত্র ছিল মনুষ্যত্বের সাধনা। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকাল হতে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন-আশ্রমবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল বক্তৃতা দিয়েছিলেন তারই সংকলন-গ্রন্থ 'বিশ্বভারতী' নামে প্রকাশিত হয় ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে। 'বিশ্বভারতী : রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্বসাধনা' প্রবন্ধে বিশ্বভারতীর বক্তৃতামালার আলোকে রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্ব-ধারণা ও মনুষ্যত্বসাধন অনুসন্ধান করা হয়েছে।]

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তার 'বৃহৎ রচনারই অঙ্গ'। শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাবিধির নবরূপায়ণ বিষয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাশাস্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অমরস্থান যে-সুনির্দিষ্ট সে বিষয়ে মতভেদ নেই (প্রভাতকুমার, ১৪০৭ : ১২)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবিপুরুষ, স্বাভাবিকভাবেই সে-পরিচয়ে তিনি ছিলেন একক ও নিঃসঙ্গ। তবে, পরিবর্তমান সময় ও বিশ্বপরিস্থিতিতে কবি যখন কর্মব্রতী হলেন, 'যেখানে তিনি কর্ম সৃষ্টি করেছেন, সেখানে বহুমানবের অভ্যুদয় হয়েছে'। আর পৃথিবীর ইতিহাসে 'কোনো কবি কোনো কালে বিদ্যালয় স্থাপন করে নিজের অর্থ, সময়, সামর্থ্য ঢেলে দেন নি' (প্রভাতকুমার, ১৪০৭ : ১২)। কবিপুরুষের এমনতর উদ্যোগ ও কর্মপন্থার পেছনে যে 'সত্যসংকল্প' ছিল তা হচ্ছে কবির চির-আরাধ্য 'মনুষ্যত্বসাধনা'। শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মনুষ্যত্ব অর্জনের উপায়। সে-উপায় সাধনের জন্য প্রয়োজন ছিল বিশিষ্ট বিদ্যায়তনের। সে-বিশিষ্ট বিদ্যায়তনটি রবীন্দ্রনাথ তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন ভারত-ঐশ্বর্য ও বিশ্বসম্পদের সমবায়ে দীর্ঘ ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে। তিনি এর নামকরণ করেছিলেন 'বিশ্বভারতী'।

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকাল হতে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত ২০ বছরের অধিককাল শান্তিনিকেতন-আশ্রম বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন জায়গায় অনেক বক্তৃতা করেছিলেন। শুধু তাই নয় শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক ও ছাত্রদেরকে আশ্রমের আদর্শ সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল হতে আশ্রমগুরু জীবনের বিভিন্ন পর্বে অসংখ্য চিঠিপত্রও লিখেছিলেন। এসব বক্তৃতা ও চিঠিপত্রে শান্তিনিকেতন-আশ্রমবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর আদর্শের সঙ্গে কর্ম ও সত্যসাধনার পাশাপাশি মনুষ্যত্বসাধনারও অবতারণা করেছেন। অন্যদিকে আমৃত্যু রবীন্দ্র জীবনসাধনা ছিল মনুষ্যত্বেরই সাধনা। সুতরাং এসব রচনায় রবীন্দ্র-মনুষ্যত্ববোধ ও মনুষ্যত্বধারণা একদিকে যেমন বিশিষ্টরূপে ধরা পড়েছে, অন্যদিকে বৈশ্বিক ও সর্বমানবিক পটভূমিকায় মনুষ্যত্বসাধনকল্পও অভিব্যক্ত হয়েছে। শান্তিনিকেতন-আশ্রমবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর আদর্শের বিষয়ে ব্যক্তিগত পত্রাদি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য বাংলা রচনাও রয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষা, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, প্রাক্তণী, প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ ও প্রথম কার্যপ্রণালী প্রভৃতি। কিন্তু বর্তমান আলোচনাটি শুধুমাত্র *বিশ্বভারতী* সংকলনভুক্ত বক্তৃতামালা অবলম্বন করেই।

বিশ্বভারতী (১৯৫১)

১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কুড়ি বছর পরে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ৮ই পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্বভারতী পরিষদ সভার প্রতিষ্ঠা হয়। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকাল হতে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ (১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত শান্তিনিকেতন-আশ্রমবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল বক্তৃতা দিয়েছিলেন তারই সংকলন-গ্রন্থ *বিশ্বভারতী* নামে প্রকাশিত হয় ৭ই পৌষ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে (১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ) শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের পঞ্চাশদ্‌বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে। গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ের সকল বক্তৃতা সংকলিত হয়নি; বিভিন্ন সাময়িকপত্র হতে গ্রন্থে অধিকাংশ বক্তৃতাই সংকলিত হয়েছিল, যা পূর্বে কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি। এ-গ্রন্থে সর্বমোট ১৯টি বক্তৃতা সংকলিত হয়েছে। বক্তৃতাগুলো ছাড়াও রয়েছে পরিশিষ্ট অংশ। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনটি হচ্ছে বিশ্বভারতী পরিষদ সভার প্রতিষ্ঠা-উৎসবের সভাপতি শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অভিভাষণ। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিল বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে বৃহৎ পৃথিবীর পরিসরে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা কাজ করে। সে-অর্থে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর উদ্যোগ গ্রহণ করেন ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ৮ই পৌষ এবং ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১৮ই আষাঢ় এর কার্যের সূচনা হয় (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৭০-৭১)। যদিও ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ৮ই পৌষ বিশ্বভারতী পরিষদ গঠন ও বিশ্বভারতীর জন্য প্রণীত সংস্থিতি (Constitution) গৃহীত হয় বলে এটিই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাদিবস বলে স্বীকৃত। এই প্রতিষ্ঠাদিবসের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী বিষয়ে একাধিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। যা গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

*বিশ্বভারতী*তে সংকলিত বক্তৃতামালার প্রধান বিষয় শিক্ষার আদর্শ, সমকালীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা, বিশ্বভারতীর অভিপ্রায় ও আদর্শ ইত্যাদি হলেও কর্ম ও সত্যসাধনার অবতারণা করে রবীন্দ্রনাথ এসবের মধ্যেই মনুষ্যত্বসাধনার রূপকল্প হাজির করেছেন। যে-মনুষ্যত্বসাধনা রবীন্দ্রনাথের সকল সৃষ্টি ও কর্মের মূলমন্ত্র ছিল।

বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের মূলে ছিল সত্য, কর্ম ও মনুষ্যত্বসাধন। এর মূল প্রেরণা ছিল মানবহিতৈষণা, দয়া, সম্মিলন ও বিশ্ববোধ। নিশ্চিতভাবেই তা সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ছিল। বিশ্বভারতীকে উদ্দেশ্য করে তার মূল লক্ষ্য ছিল 'সত্য বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা। এই সত্য বিদ্যালয় একদিকে যেমন ভারতের, অন্যদিকে তেমনি সারা পৃথিবীরও। রবীন্দ্রনাথের এরূপ শিক্ষাদর্শ বা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিল সমকালীন ভারতের ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীত প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। অথচ ভারতের আধুনিক শিক্ষায় ভারতকে রাখা হয়েছে দূরে : 'এই শিক্ষাপ্রণালীর সকলের চেয়ে সাংঘাতিক দোষ এই যে, এতে গোড়া থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে আমরা নিঃস্ব' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৬)। অন্যদিকে সকল বড়ো দেশেই শিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যাবহারিক সুযোগ লাভ, উচ্চতর লক্ষ্য, মানবজীবনের পূর্ণতা সাধন এবং সে-লক্ষ্যেই সে-সব দেশে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি হয়েছে; কিন্তু 'আমাদের দেশের আধুনিক বিদ্যালয়গুলির সেই স্বাভাবিক উৎপত্তি নেই। বিদেশী বণিক ও রাজা তাঁদের সংকীর্ণ প্রয়োজর-সাধনের জন্য বাইরে থেকে এই বিদ্যালয়গুলি এখানে স্থাপন করেছিলেন' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৫)। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় নকল করে গড়ে উঠেছে বলে বৃহৎ জীবনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরিবর্তে 'ভদ্রসমাজে' প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আধুনিক শিক্ষার যোগ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায়,

> অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠা-স্থানের চতুর্দিক্‌বর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গোপালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্রশিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৯–১০)

এই যুক্ততার জন্যই বিশ্বভারতীর উদ্যোগ ও আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, পাশ্চাত্য দেশে মানুষের জীবনের একটা লক্ষ্য আছে এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষা সে-লক্ষ্যের দিকে মানুষকে নানা রকমে বল দিচ্ছে ও পথ নির্দেশ করছে। অথচ আধুনিক ভারত-শিক্ষায় এখানকার জীবনের বড়ো লক্ষ্য জাগ্রত হয়ে ওঠেনি, জীবিকা উপার্জনের স্থির লক্ষ্যটি ছাড়া। জীবিকার লক্ষ্য আবার শুধুমাত্র অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়েই। কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে; পরিপূর্ণতাই জীবনের মহিমা– প্রয়োজন এখানে তুচ্ছ জিনিস। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হচ্ছে,

> এই পরিপূর্ণতার আদর্শ সম্বন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু কোনো একটা আদর্শ আছে বা কেবল পেট ভরাবার না, টাকা করবার না, এ কথা যদি না মানি তাহলে নিতান্ত ছোটো হয়ে যাই।
>
> এই কথাটা মানব, মানতে শেখাব, এই মনে করেই এখানে প্রথমে বিদ্যালয়ের পত্তন করেছিলুম। তার প্রথম সোপান হচ্ছে বাইরে নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষেপ থেকে সরিয়ে এনে মনকে

> শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। সেই জন্যে এই শান্তির ক্ষেত্রে এসে আমরা আসন গ্রহণ করলুম। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৩-১৪)

কিন্তু ঔপনিবেশিক পদ-পদবিগ্রাহী শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে জীবনের মহিমা-অর্জনসুলভ শিক্ষাদর্শের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না নিশ্চয়। একদিকে অভাবের সঙ্গে অন্নচিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই চলমান সরকারি বিদ্যাশিক্ষা মানুষ বহন করে চলেছে, অন্যদিকে এরূপ ভয়ংকর জবরদস্তি আছে বলেই শিক্ষাব্যবস্থায় স্বতন্ত্রতা প্রকাশ পাচ্ছে না। আবার যা কিছু সমস্তই বাইরে থেকে নিতে হচ্ছে বলে 'নিজের ঘরে শিক্ষার পৈতৃক মূলধন যেন কানাকড়ি নেই' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৭০-৭১)। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি, এতে কেবল যে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে তা নয়, মানুষের মনে একটা নিঃস্ব-ভাবও তৈরি করে। শুধু তাই নয়, এধরনের শিক্ষা যে কোনও জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপকে ভেঙে দেওয়ার মতো, অথবা তার নিজের অস্তিত্বকে ভুলিয়ে দেওয়ার মতো এবং এতে যে সমস্ত জগতেরই ক্ষতিসাধন করা হয় তাও অনুভব করেছিলেন (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৭)।

ভারতের একটা সমৃদ্ধ অতীত ছিল– জ্ঞানে-মানে-ধনে ও দর্শনে। রবীন্দ্রনাথ ভালো করে জানতেন, ভারতবর্ষ নিজের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও শক্তি দিয়ে জগৎকে গভীরভাবে চিন্তা করেছে এবং আপন বুদ্ধিতে তার সমাধানও করেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তি দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৭)। ভারতবর্ষ এই মনন অর্জন করেছিল নিজের শক্তি দিয়ে কেননা রবীন্দ্রনাথের মতে, 'তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল', আর এখন এই যে 'ভিক্ষাবৃত্তি', 'আন্তরিক দীনতা' ও 'হীনতা' কারণ– 'এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৮)। এই বিচ্ছিন্নতাকে তিনি তুলনা করেছেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-চেতনাসূত্রের বিচ্ছেদের সঙ্গে, যে-বিচ্ছেদ সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সেইরূপ, ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খৃস্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৮)। অতএব তাঁর অভিমত, ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করতে হবে। শুধু তাই নয়, এই নানা ধারা দিয়ে ভারতবর্ষের মন কেমন করে প্রবাহিত হয়েছে তাও জানতে হবে,

> এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে, যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মতো গ্রহণ করিবে। সেইরূপ ভিক্ষাজীবিতায় কখনও কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৮)

অন্যদিকে তিনি মনে করেছেন, মনের দাসত্ব ঘোচাতে চাইলে শিক্ষার দাসভাবটা ঘোচাতে হবে। সে-জন্যে তিনি আশ্রমের শিক্ষাকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতকে চূড়ান্ত মেনে নিয়েছিলেন যে, ভারতের টোলের চতুষ্পাঠীতে কেবল সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হয় এবং অন্য সকল শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। ফলে সেখানকার শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দেশীয় শিক্ষাকে মূল আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন

করে তার ওপর অন্য সকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে। তবেই সে-জ্ঞানসাধনা সত্য ও কর্ম সাধনায় পরিণত হবে– ভারতেবর্ষের মানুষ অর্জন করবে মনুষ্যত্বসাধনার বহুবিধ উপায় ও পথ। অতএব দেখা যাবে, সে-লক্ষ্যেই স্বদেশের পণ্ডিতদের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে বিশ্বমনীষীদের আহ্বান করেছিলেন যারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টিকার্যে নিবিষ্ট ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্ববোধ, মনুষ্যত্বধারণা ও মনুষ্যত্বসাধনা

রবীন্দ্রনাথের 'মনুষ্যত্ব' ধারণা সুবিশাল ও সুগভীর। জ্ঞানতপস্যা, কর্মযোগ ও সত্যপন্থা তাঁকে এ-ধারণায় উপনীত করেছিল। মানুষের আত্মবিকাশ ও আত্মমহিমাকেই রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্ব বলে জানতেন। সৃষ্টি ও কর্মে গোটা জীবনই তিনি তাই মনুষ্যত্বসাধনা করে গেছেন এবং মানুষকে আপনার পথে অগ্রসর হতে বারবার নির্দেশও করেছেন। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালের অস্থির পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সকরুণ কণ্ঠে তাই উচ্চারণও করেছেন,

> আজকার দিনে বিশ্বমানবকে আপনার বলে স্বীকার করবার সময় এসেছে। আমাদের অন্তরের অপরিমেয় প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা এই কথা জানতে হবে যে, মানুষ শুধু কোনো বিশেষ জাতির অন্তর্গত নয়; মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরচয় হচ্ছে– সে মানুষ। আজকার দিনে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের। তার মধ্যে কোনো জাতীয়তা বা বর্ণভেদ নেই। সেই পরিচয়সাধন হয় নি ব'লেই মানুষ আজ অপরের বিত্ত আহরণ করে বড়ো হতে চায়। সে আপনাকে মারছে, অন্যকে মারতে তার হাত কম্পিত হচ্ছে না– সে এতবড়ো অপকর্ম করতে সাহস পাচ্ছে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৮১-৮২)

রবীন্দ্রনাথের হৃদয়সংবেদী ও ঋষিতুল্য এই বাণী দেন ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে, যখন তার বয়স ৬২ বছর। ততদিনে কবি রবীন্দ্রনাথ কর্মী রবীন্দ্রনাথে পরিণত হয়েছেন। ভাবুক ও কবি নিজেকে পল্লিবাংলার নৈসর্গিক ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে কলকাতার বৃহৎজীবনের পরিসরে বৃহৎ পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে আসীন করেছেন শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে। একটা সত্যসংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পরে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কবির এই সত্যসংকল্প ছিল মনুষ্যত্বসাধন-সংকল্প। কিন্তু তারও অনেক আগে বিভিন্ন রচনায় মনুষ্যত্ববোধ, মনুষ্যত্বের দায় ও মনুষ্যত্বেসাধনের কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন। সে-উচ্চারণের সঙ্গে বিশ্বভারতীর বক্তৃতামালার উচ্চারণে কোনো তফাত ছিল না, সে-সত্যবচনের মূল সুর ছিল একই তারে বাঁধা।

মানবদেহ নশ্বর ও মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী, তা হলেও প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে অনন্ত জীবন, অনন্ত সম্ভাবনা। মনুষ্যত্বসাধনের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি জগৎসংসার প্রতিক্ষণেই তার বিচিত্র স্পর্শের দ্বারা মানুষকে একটি কথাই বলছে, 'আপনাকে বিকশিত করো, আপনাকে সমর্পণ করো, আপনার দিক হইতে একবার সকলের দিকে ফেরো, এই জল-স্থল-আকাশে, এই সুখদুঃখের বিচিত্র সংসারে অনির্বচনীয় ব্রহ্মের প্রতি আপনাকে একবার সম্পূর্ণ উন্মুখ করিয়া ধরো' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৪৫৭-৫৮)। নিখিল জগৎ মানুষকে মানব হওয়ার পথে আহ্বান করলেও তাতে বাধা সীমাহীন। নদীপথের বাধার মতো রবীন্দ্রনাথের মতে নদীর তটদ্বয়ের

ধারাবাহিক বৈচিত্র্য ও সাগরপানে অবিরাম যাত্রার মতো 'মনুষ্যত্বকে সেইরূপ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে বিপুলভাবে মহৎ সার্থকতা লাভ করিতে হয়' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৪৫৮)। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে আঘাত আছে, ভাঙন আছে, সংঘর্ষ আছে, বিচ্ছেদ আছে, যন্ত্রণা আছে; আছে দুঃখও। এই দুঃখই মানুষকে বড়ো করে, মানুষকে আপন বড়োত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত সচেতন করে তোলে এবং এই বড়োত্বই মানুষকে আনন্দের অধিকারী করে তোলে। 'বিশ্বসংসারের মধ্যে মনুষ্যত্বই সেই দুঃখের মহিমায় মহীয়ান, অশ্রুজলেই তাহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৪৫৮)। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

> মনুষ্যত্ব আমাদের পরম দুঃখের ধন, তাহা বীর্যের দ্বারাই লভ্য। প্রত্যহ পদে পদে বাধা অতিক্রম করিয়া যদি তাহাকে পাইতে না হইত, তবে তাহাকে পাইয়াও পাইতাম না— যদি তাহা সুলভই হইত, তবে আমাদের হৃদয় তাহাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিত না। কিন্তু তাহা দুঃখের দ্বারা দুর্লভ, তাহা মৃত্যুশঙ্কার দ্বারা দুর্লভ, তাহা ভয়-বিপদের দ্বারা দুর্লভ। এই দুর্লভ মনুষ্যত্বকে অর্জন করিবার চেষ্টায় আত্মা আপনার সমস্ত শক্তি অনুভব করিতে থাকে। সেই অনুভূতিতেই তাহার প্রকৃত আনন্দ। ইহাতেই তাহার আত্মপরিচয়।...
>
> এইজন্য পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব যত সহজ, মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব সহজ নহে।...
>
> কারণ, মানুষ মহৎ; কারণ মনুষ্যত্ব সুকঠিন, এবং মানুষের যে পথ, 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৪৫৮—৫৯)

সংসারে আঘাত, সংগ্রাম আর নিরন্তর দুঃখ আছে বলেই মনুষ্যত্ব সুকঠিন; ফলে দরকার পড়ে সাধনার। ভোগ-সুখ-আরাম-বিলাসের মধ্যে আত্মার জড়ত্ব আসে; সে-জড়ত্বকে কাটিয়ে তুলতে প্রয়োজন পড়ে সমস্ত শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ; আর এটার জন্য মানুষকে হতে হয় বদ্ধ পরিকর।

রবীন্দ্র-মনুষ্যত্বধারণায় সত্য ও বিশ্ববোধ এবং সমগ্র বা সামষ্টিকচেতনা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের ধর্মটাই এমন, তার সফলতা নির্ভর করে অন্যকে সহযোগিতার ওপর। মানুষ বুঝতে পারে, অনেকের মধ্যে সে একজন; জানতে পারে, নিজের জানাটা বিশ্বমানবমন দ্বারা যাচাই করে প্রমাণিত হলে তবে এর মূল্য। মানুষ দেখতে পায়, জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে সকলের সঙ্গে যতই সে যুক্ত হয়, ততই সে সত্য হয়। যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা। সুতরাং মানুষের সেই প্রকাশ শ্রেষ্ঠ যা একান্ত ব্যক্তিগত মনের নয়, যাকে সকল কালের সকল মানুষের মন স্বীকার করতে পারে (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬২১)। রবীন্দ্রনাথের কথা হচ্ছে, 'এই সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি সীমাকে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎমানুষের সাধনা। এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬২১)। ইতিহাসবিচারে কবি লক্ষ্য করেছেন, মানুষের এই আত্মোপলব্ধি বাহির থেকে অন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে, যে অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতা, যেখানে বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌঁছেছে বিশ্বমানসলোকে— যেখানে তার সৌন্দর্য ও মুক্তি। 'সত্যতপস্যা' ও 'জ্ঞানযজ্ঞ'ই মানবের রুদ্ধমনে বিশ্বমানবচিত্তের উদ্‌বোধন করে। রবীন্দ্রনাথের ঘোষণা, 'এই তার আন্তর সত্তার বোধ দৈহিক সত্তার ভেদসীমা ছাড়িয়ে দেশে কালে সকল মানুষের মধ্যে ঐক্যের দিকে প্রসারিত। এই বোধেরই শেষ কথা এই যে, যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের

আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে, সে জানে সত্যকে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬২১)। প্রকারান্তরে এই সত্যসাধনাই মনুষ্যত্বসাধনা।

জীবভাব ও বিশ্বভাব– এই দুইপ্রকার ভাব নিয়েই মানুষ বাঁচে। আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে ও আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে জীবে অবস্থান ও চলা। মানুষের মধ্যে সে-জীবত্ব পেরিয়ে যে-সত্তা তা-ই তার আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬২১)। আর এই নির্দেশনা বিচ্ছিন্নতা, অপূর্ণতা বা ব্যক্তিগত সীমার দিকে নয়– বরং বিশ্বমানবের দিকে। এ থেকে বিচ্যুত হলেই সে-আদর্শচ্যুত হয়, মানবত্ব খর্ব হয়; মনুষ্যত্বের পতন ঘটে : 'যে পরিমাণে তার গতি এর বিপরীত দিকে, বাহ্যিকতার দিকে, দেশকালগত সংকীর্ণ পার্থক্যের দিকে, মানবসত্য থেকে সেই পরিমাণে সে ভ্রষ্ট, সভ্যতার অভিমান সত্ত্বেও সেই পরিমাণে সে বর্বর' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬২২)। কিন্তু মানুষকে সেই মানবসত্য রক্ষা করতেই হবে, সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে এই প্রেরণায় যে, সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম। এই প্রেরণা বিশ্বমানবের প্রেরণা, –আর তাতে প্রবৃত্ত হতে হবে আপন আত্মার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির জন্য, সমাজরক্ষার খাতিরে বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। মানুষ তার আপন অন্তরের গভীরতর প্রচেষ্টায়ই তার সাধন করতে হবে। রবীন্দ্রদর্শনে 'এক আত্মলোকে সকল আত্মার অভিমুখে আত্মার সত্য' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬২৫)। আর তাঁর মতে, এই সত্যের আদর্শেই বিচার করতে হবে মানুষের সভ্যতা, ভব্যতা, রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মকে। কেননা,

> জন্তুদের বাস ভূমণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে দেশ। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। মানুষে মানুষে মিলিয়ে এই দেশ জ্ঞানে জ্ঞানে, কর্মে কর্মে। যুগযুগান্তরের প্রবাহিত চিন্তাধারায় প্রীতিধারায় দেশের মন ফলে শস্যে সমৃদ্ধ। বহু লোকের আত্মত্যাগে দেশের গৌরব সমুজ্জ্বল যে-সব দেশবাসী অতীতকালের, তাঁরা বস্তুত বাস করতেন ভবিষ্যতে। তাঁদের ইচ্ছার গতি কর্মের গতি আগামীকালের অভিমুখে। তাঁদের তপস্যার ভবিষ্যৎ আজ বর্তমান হয়েছে আমাদের মধ্যে কিন্তু আবদ্ধ হয়নি। আবার আমরাও দেশের ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে উৎসর্গ করছি। সেই ভবিষ্যৎকে ব্যক্তিগতরূপে আমরা ভোগ করব না। যে তপস্বীরা অন্তহীন ভবিষ্যতে বাস করতেন, ভবিষ্যতে যাঁদের আনন্দ, যাঁদের আশা, যাঁদের গৌরব, মানুষের সভ্যতা তাদেরই রচনা। তাঁদের স্মরণ করে মানুষ আপনাকে জেনেছে অমৃতের সন্তান; বুঝেছে যে, তার দৃষ্টি তার সৃষ্টি তার চরিত্র মৃত্যুকে পেরিয়ে। মৃত্যুর মধ্যে গিয়ে যাঁরা অমৃতকে প্রমাণ করেছেন তাঁদের দানেই দেশ রচিত। ভাবী কালবাসীরা, শুধু আপন দেশকে নয়, সমস্ত পৃথিবীর লোককে অধিকার করেছেন। তাঁদের চিন্তা, তাঁদের কর্ম, জাতিধর্ম-নির্বিচারে সমস্ত মানুষের। সবাই তাঁদের সম্পদের উত্তরাধিকারী। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬২৫)।

সাধক-কর্মী সে-পুরুষেরা তাই প্রমাণ করেন সকল মানুষকে নিয়ে, সকল মানুষকে অতিক্রম করে, কালের সীমানা পেরিয়ে সর্বত্র 'এক-মানুষ' বিরাজিত। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, সেই মানুষকে প্রকাশ করতে হবে বলে, শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে বলে মানুষের বাস সুতরাং দেশে দেশে : 'অর্থাৎ, এমন জায়গায় যেখানে প্রত্যেক মানুষের বিস্তার খণ্ড খণ্ড দেশকালপাত্র ছাড়িয়ে– যেখানে মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬২৫)। অন্যদিকে, মানুষের অপূর্ণতার উপলব্ধি এবং পূর্ণতার আদর্শ জ্ঞান, সত্য, প্রেম ও কর্মে চালিত করে তাকে মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই উপলব্ধি

ও আদর্শ মনুষ্যত্বেরই দায়। এই দায় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাণী হচ্ছে : 'মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬২৭)। এই অন্তহীন সাধনাই, রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্বের সাধনা।

বিশ্বভারতী : মনুষ্যত্বসাধনা

বিশ্বভারতীর পরিচয় একটি বিদ্যাপীঠ হিসেবেই। জীবনের সুগভীর আদর্শ বিতরণ ও প্রতিষ্ঠা এর মূল লক্ষ্য হলেও রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রয়োজন বা জীবিকাকে মোটেও অবজ্ঞা করেননি। বরং তিনি লব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে জীবিকাকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে চেয়েছেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রায় ১১ বছর পর ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে ব্যাবহারিক জীবন ও বিষয়বুদ্ধির ব্যাপারে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল যে, মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেখানে আপন ব্যক্তিগত জীবননির্বাহে তার জ্ঞান, কর্ম ও সৃজনশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। কিন্তু মানুষের আরও একটা দিক আছে যা ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত-প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সে জীবনে মানুষ বাঁচতে চায় (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬১৯)। রবীন্দ্রনাথের জবানিতে,

> স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।
>
> কোন্ মানুষের ধর্ম। এতে কার পাই পরিচয়। এ তো সাধারণ মানুষের ধর্ম নয়, তা হলে এর জন্যে সাধনা করতে হত না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৬১৯)

সুতরাং জৈবপ্রয়োজনের বাইরে মনুষ্যত্বের বিকাশ যে-মানবধর্ম তার সাধনক্ষেত্র হিসেবে বিশ্বভারতীতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগে থেকেই শান্তিনিকেতনে 'সর্বমানবের যোগ-সাধনের সেতু'-রচনার কল্পনা তাঁর মনকে ক্রমশ অধিকার করতে থাকে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত একখানা পত্রে। কবি তখন আমেরিকার শিকাগো থেকে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লিখেন,

> ... এখানে মানুষের শক্তির মূর্তি যে পরিমাণে দেখি পূর্ণতার মূর্তি সে পরিমাণে দেখতে পাই নে। ... মানুষের শক্তির যতদূর বাড় হবার হয়েছে, এখন সময় হয়েছে যখন যোগের জন্যে সাধনা করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা কি সেই যুগসাধনার প্রবর্তন করতে পারব না? মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগমুক্ত করে তার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরব না?...মানুষকে তার সফলতার সুরটি ধরিয়ে দেবার সময় এসেছে। আমাদের শান্তিনিকেতনের পাখিদের কণ্ঠে সেই সুরটি কি ভোরের আলোয় ফুটে উঠবে না? (রবীন্দ্রনাথ, ১৩২০)

১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে উগ্র জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজমের আদর্শ গোটা বিশ্বকে রণক্ষেত্রে পরিণত করলে মানুষের জীবনে যে সর্বনাশ সংসাধিত হয় তাতে পৃথিবীর অন্য ভাবুকদের মতো রবীন্দ্রনাথও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তখন শান্তিনিকেতন মন্দিরে কবি একদিন বলেছিলেন যে, মানুষের মিলনতপস্যাকে ভঙ্গ করার জন্য শয়তান জাতীয়তাবোধকে অবলম্বন করে কী বিরোধ কী আঘাত, কী ক্ষুদ্রতাকে দিন দিন তার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে। মানুষের সে অপকর্ম থেকে আত্মাকে রক্ষার জন্য কবির বাণী ছিল, 'শান্তিনিকেতনে আমরা মানুষের সমস্ত ভেদ,

জাতিভেদ, ভুলব। আমাদের দেশে চারিদিকে ধর্মের নামে অধর্ম চলচে, মানুষকে নষ্ট করবার আয়োজন চলছে– আমরা আশ্রমে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হব' (রবীন্দ্রনাথ, উদ্ধৃত– প্রভাতকুমার, ১৪০৭ : ৯৮)। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের মে হতে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। জাপানে গিয়ে ন্যাশনালিজমের উগ্র রূপ দেখে তাঁর মন পীড়িত হলো। শিক্ষানীতিতে জাপান যেভাবে 'ন্যাশনালিজমের বিষ' শিশুমনে রোপণ করতে তৎপর হয়েছে ভাবীকাল তাতে যে অনিরাপদ হয়ে পড়বে এটা কবি বুঝতে পারলেন। আমেরিকায় দেখতে পেলেন ওই একই অবস্থা। এরূপ পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের মনে ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে সর্বমানবের আধ্যাত্মিক মিলনক্ষেত্র সংস্থাপনের চিন্তা জাগে। লস এঞ্জেলেস থেকে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে কবি লিখছেন,

> ... তার পরে এও আমার মনে আছে যে, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে– ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে– স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হযে আসছে– ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। এই জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোলবৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে– সর্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯১৬)

কাজটি মোটেও সহজ ছিল না কেননা সেটা ছিল 'একটা উজান-পথে চলা'। শান্তিনিকেতনের শুরুই হয়েছিল বালকদের মুক্তির স্বাদ, মনের দাসত্ব ঘোচানো ও 'কথার মানে এবং বিদেশের বাঁধা বুলি মুখস্থ করিয়ে তোতাপাখি করে তোলার' পরিবর্তে স্বাধীনভাবে ভাবতে শেখানোর প্রতিজ্ঞা করে। তারপর ধীরে ধীরে ব্রহ্মবিদ্যালয়টিকে বিদ্যার সাধকদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার যজ্ঞক্ষেত্রের যথার্থ যোগ্য করতে প্রয়াসী হলেন। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১৮ই আষাঢ় বিশ্বভারতীর কার্যারম্ভের দিনে সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন, 'এই আমাদের বিশ্বভারতীর প্রথম বীজবপন।' সেদিন রবীন্দ্রনাথ কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে জানান বিশ-পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন করার সাধ্য না-থাকলেও সেজন্যে তারা হতাশ নন। বরং আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেছিলেন, 'সাধনার মধ্যে যদি সত্য থাকে তা হলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি হবে না' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৮)। এমন দৃঢ়তার কারণ ছিল যে, সূচনালগ্নেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এমনসব পণ্ডিতের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন, যা ছিল সত্যিকার অর্থেই যজ্ঞতুল্য। সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী, সিংহলের মহাস্থবির, ক্ষিতিমোহন সেন; পাশ্চাত্য সাহিত্যের জন্য এন্ড্রুজ, সংগীতের জন্য ভীমশাস্ত্রী, দিনেন্দ্রনাথ ও নকুলেশ্বর গোস্বামী, বিহার থেকে ফারসি ও উর্দুর জনৈক অধ্যাপক এবং চিত্রকলার জন্য নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর প্রমুখ নামজাদা পণ্ডিতবৃন্দ। এঁরা সকলেই ছিলেন সূচনাকালের বিশ্বভারতীর প্রাণভোমরা।

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে রবীন্দ্রনাথের সংকল্প ছিল শিক্ষার আয়তন দেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখবেন, কিন্তু পরে তা বৃহৎপরিসরে মুক্তিলাভে সচেষ্ট হলো। কালে তাঁর মনে হলো যে, 'যে অনুষ্ঠান সত্য তার উপরে দাবি সমস্ত বিশ্বের, তাকে বিশেষ প্রয়োজনে খর্ব করতে চাইলে তার সত্যতাকেই খর্ব করা হয়' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ২৩)। ১৯২০-২১ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ করেন। নানা কারণে সে-ভ্রমণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রভাতকুমার স্পষ্ট করে জানাচ্ছেন যে, যুদ্ধোত্তর ইউরোপ তার পুনর্গঠন কীভাবে করছে,

সেখানকার মনীষীরা জাগতিক সমস্যা বিষয়ে কী চিন্তা করছেন তা প্রত্যক্ষভঅবে জানবার ও বুঝবার জন্য এবারকার ইউরোপ যাত্রা (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ২৪)। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিমা বিশ্ব দেখে কবির মনে সভ্যতার প্রতি করুণাই জাগল। মানুষকে মনে হলো তাঁর বেদনাহত, আর তিনি দেখতে পেলেন মানুষ পুরাকালে যে আশ্রয়কে নির্মাণ করেছিল তার ভিত্তি ভেঙে পড়েছে। আজ মানুষের মনে হয়েছে, সে-আশ্রয় তার অভাবকে পূর্ণ করবার উপযোগী নয়। পশ্চিমা মনীষীরাও তা উপলব্ধি করেছেন এবং অভাব পূর্ণ হবার মানুষের সাধনার পথসন্ধানও করছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, প্রাচ্য বিশ্বসভ্যতায় কী সম্পদ দিতে পারে তা জানতে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। সুতরাং বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে পৃথিবীর সর্বত্র একটা বিশ্ববোধ উদ্বুদ্ধ হতে দেখা যায়। তখন রবীন্দ্রমনে প্রশ্ন জাগে,

> ভারতবর্ষে কি এই যুগের সাধনা স্থান পাবে না? আমরা কি এই কথাই বলব যে, মানবের বড়ো অভিপ্রায়কে দূরে রেখে ক্ষুদ্র অভিপ্রায় নিয়ে আমরা থাকতে চাই? তবে কি আমরা মানুষের যে গৌরব তার থেকে বঞ্চিত হব না? স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সংকীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সবচেয়ে বড়ো গৌরব? (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ২৪)

এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন যে, 'বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের সম্পদ হলেও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ২৪)। বিশ্বযুদ্ধ শেষে যে লিগ অব নেশনস্ গঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ এতে যে খুব উৎফুল্ল হয়েছিলেন এমন নয়। তাঁর মনে হয়নি এতে জগতের রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। রবীন্দ্রভাবনায় বরং ছিল শিক্ষার যোগে জ্ঞানের মিলনসাধনের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আপন মানসিক ঐক্য উপলব্ধি করুক। তবেই মানুষের হিংস্রভাব দূর হয়ে চিরমিলনের পথে এগিয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথে এরূপ মনোভাব ও উদ্‌যোগ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার লিখেছেন,

> য়ুরোপের মনীষীদের সহিত তিনি মিলিত হইয়াছেন— সকলেই মহত্তর জীবনযাপনের আদর্শের সন্ধান করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে কেবল ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র করিয়া রাখিবার কথা আর ভাবিতে পারিতেছেন না; তিনি তাহার প্রতিষ্ঠানকে বলিতেছেন International University। তাহার মনে হইতেছে য়ুরোপ হইতে জ্ঞানীদের আহ্বান করিয়া আনিবেন শান্তিনিকেতনে— পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন ঘটিবে এই সহযোগিতার উপর। পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন সম্বন্ধে কবির বহুদিনে ভাবনা এতকাল পরে মূর্ত হইতে লাগিল। (প্রভাতকুমার, ১৪০৭ : ১৩৯)

রবীন্দ্রনাথের ইতিবাচক মনোভাব ও বলিষ্ঠ বিশ্বাসের জোরেই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিশ্বভারতীরূপে জয়যাত্রা করে। ব্রহ্মাশ্রমের অবসানে বিশ্বভারতীর উদ্ভব হয়েছে এমনটা নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাবনার অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ এর আবির্ভাব (প্রভাতকুমার, ১৪০৭ : ৩৭)। বহুদিনের বহু সংকল্পে সে ভাবনাকে নিভৃতে পোষণ করে পলে পলে একে পরিণতি দিয়েছেন। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে আদর্শগত কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি; ব্রহ্মাচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতী উভয়েরই আরাধ্য ছিল বৈদিককালের তপোবন কিংবা বৌদ্ধযুগের নালন্দার 'সত্যমানুষ'।

কিন্তু এই সত্যমানুষ তো সাধনার ফল। আর সে সাধনার পথ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই বোধ শুধু রবীন্দ্র-উপলব্ধিতেই ছিল না; বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, আরবিন্দ ঘোষ প্রমুখেরও উপলব্ধ সত্য। উনিশ শতকের শেষভাগে এসে ভারতের সর্বত্রই শিক্ষিতদের মনে পাশ্চাত্যশিক্ষার ব্যাপারে প্রশ্ন ও দ্বিধা জাগে। শতবছরের মাথায় ভারতীয়রা

আবিষ্কার করল তারা ক্রমশই বলহীন হয়ে পড়ছে; তাই শুধু নয়, 'হিন্দুভারত পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি পুরোপুরি পায় নাই, আবার ভারতের মৌলিক সাধনার সহিতও সে বিচ্ছিন্ন— আপনার আত্মাকেও সে হারাইতেছে' (প্রভাতকুমার, ১৪০৭ : ৩২)। কলকাতার বিদ্যালয়সমূহে রবীন্দ্রনাথ নিজে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা সুখকর ছিল না। তিনি স্কুল-পলাতক হয়েছিলেন। তার মনেও হয়েছিল এই পথে 'সত্যমানুষ' সৃষ্টি যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় ভারতের মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ তাই নিজ সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাননি, শিক্ষা সম্বন্ধে নিজ আদর্শে শিলাইদহে গৃহবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এবং সে-বিদ্যালয়টি একদিন শিলাইদহের 'গৃহকোণের সীমানা হইতে বাহির করিয়া বৃহত্তর ক্ষেত্রে' অর্থাৎ শান্তিনিকেতনে স্থাপন করলেন। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনুষ্যত্ব লাভ— স্বার্থ নহে, পরমার্থ। ... ইহাই ব্রহ্মচর্যব্রত; এ কেবল পড়া মুখস্থ করা ও পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া নহে। ইহা ধর্মব্রত।' পত্রটির শেষের দিকে এসে আরও লিখেন,

> আমি অনেক চিন্তা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি যে, বাল্যকালে ব্রহ্মচর্যব্রত, অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্বলাভের উপায় বলিয়া জানিয়া শান্তসমাহিতভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনাসহকারে তাহা দুর্লভধনের ন্যায় গ্রহণ করা— ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়। (রবীন্দ্রনাথ, উদ্ধৃত : প্রভাতকুমার, ১৪০৭ : ৪৩)

এর বাইরে বিদেশ থেকে ধার করে যে বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন তাতে অন্তত মনুষ্যত্বলাভের সম্ভাবনা ফুরিয়ে যায়। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও পরিবেশ-প্রতিবেশের সঙ্গে সকল দেশে সকল কালের মানবিক বিকাশ জড়িত। ভারত-প্রশ্নে, ভারতের শিক্ষার সঙ্গে এসবকে দূর বিচ্ছেদ করায় বৃহৎযাত্রায় হয়েছে গোড়ায় গলদ। তাই, রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের শিক্ষা তাঁকে আনন্দদানের পরিবর্তে পীড়নই করেছে। সে ব্যবস্থা ক্লেশ দিত, আঘাত করত; এটাকে তার অন্যায় ও অন্যায্য মনে হতো; এমনকি বড়ো হয়েও সেটা তিনি ভুলতে পারেননি,

> কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিষ্পেষণে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে। আমরা নর্মাল ইস্কুলে পড়তাম। সেটা ছিল মল্লিকদের বাড়ি। সেখানে গাছপালা নেই, মার্বেলের উঠোন আর ইটের উঁচু দেওয়াল যেন আমাদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকত। আমরা, যাদের শিশু প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উদ্যম সতেজ ছিল, এতে বড়োই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য থেকে দূরে থেকে আর মাস্টারদের সঙ্গে প্রাণগত যোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাস্টাররা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত। ... প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই যে বিদ্যা লাভ করা যায় এটা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ২৫)

এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নানা জায়গায় বক্তৃতা করেছেন। সকলে মনে করল এটা ভাবের কথা, কবির বাণী। না এটা মানলেন কেউ, না কাজে খাটানোর উদ্যোগ নিলেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'অসাধ্যসাধনে' লেগে গেলেন, 'আমার ভাবকে কর্মের মধ্যে আকার দান করবার জন্য আমি নিজেই কৃতসংকল্প হলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা হল, আমি ছেলেদের খুশি করব, প্রকৃতির

গাছপালাই তাদের অন্যতম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে– এমনি করে বিদ্যার একটি প্রাণনিকেতন নীড় তৈরি করে তুলব' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ২৬)।

ঘাড়ে লক্ষ টাকার দেনা নিয়েও বিশাল যজ্ঞে যাত্রা করলেন কবি-কর্মী। শান্তিনিকেতনের জামগাছতলায় পাঁচ-ছয়টি ছেলে নিয়েই শুরু করলেন। নিজের বিদ্যার সামর্থ্য অনুযায়ী ছেলে কটিকে রস দিয়ে ভাব দিয়ে রামায়ণ-মহাভারত পড়িয়ে, হাসিয়ে কাঁদিয়ে, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের মানুষ করলেন। প্রতিষ্ঠান আকারে শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হলেও রবীন্দ্রনাথ জবরদস্তির বিরুদ্ধে মাস্টারদের সঙ্গে লড়াই করেছেন, সংকল্প ত্যাগ করেননি। তার অভিপ্রায় ছিল বিদ্যার্থীরা জীবনের আরম্ভকালকে বিচিত্র রসে পূর্ণ করে নেবে এবং পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও বাধামুক্ত সম্বন্ধে যুক্ত হবে। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগ, অভিনয়ে, গান এবং ছবিতে আনন্দরস আস্বাদনের নিত্যচর্চায় শিশুদের মগ্ন চৈতন্যে আনন্দের স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে উঠবে। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ চাইতেন, জীবনের গভীর ও মহৎ তাৎপর্য শিশুরা বুঝতে শিখুক। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমার কথা এই যে, সবচেয়ে বড়ো যে আদর্শ মানুষের আছে তা ছেলেদের জানতে দিতে হবে।' এজন্যে সকাল-সন্ধ্যায় প্রাচীন তপোবনের মহৎ বাণী উচ্চারণ করিয়েছেন, নিশ্চুপ বসিয়ে রেখেছেন। দেখেছেন এতে তাদের মনের মধ্যে ঘটমান পরিবর্তনকে। এতে করে ছেলেদের মধ্যে একধরনের কলহাস্য, ব্যাকুল চঞ্চলতা ও অপার আনন্দ রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেলেন। এই শিশুদের মধ্যেই তিনি স্পর্শ করলেন নিখিল মানুষ। এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'বিশ্বচিত্তের বসুন্ধরার সমস্ত মানবসন্তান যেখানে আনন্দিত হচ্ছে সেই বিরাট ক্ষেত্রে আমি হৃদয়কে বিস্তৃত করে দিয়েছি। যেখানে মানুষের বৃহৎ প্রাণময় তীর্থ আছে, যেখানে প্রতিদিন মানুষের ইতিহাস গড়ে উঠছে, সেখানে আমার মন যাত্রা করছে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৩০)। বিশ্বভারতী নিয়ে এলো আরও বৃহৎপরিসর। শুধু গ্রহণ নয়, ভারত বা প্রাচ্য অঙ্গীকার করল দেওয়ার যা আছে, তা দান করতে। ভারতের ক্ষেত্রে তাই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

আধুনিক পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা নেই, মানুষ পরস্পরের কাছে এসেছে; রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ এ সত্য ভারতবাসীর অনুসরণীয়। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব আছে, সংঘাত আছে, হিংসা আছে, বিচ্ছেদও আছে। কিন্তু এটা মানুষের সত্য নয়; মানবসত্য হচ্ছে মিলন। মানুষে মানুষে এই মিলনের ভিত্তি হবে প্রেম, বিদ্বেষ নয়। এই সত্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথের মতে, পূর্ব-পশ্চিম নেই। চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নেই। নেই বলে পৃথিবীর সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কস্থাপনে বিশ্বাসী তিনি। পশ্চিমের দিকে একতরফা হাত পেতে রাখাতে আদান-প্রদানের সম্বন্ধও স্থাপিত হয়নি। ফলে ভারত-অন্তরে আত্মবিশ্বাসের অভাব, দীনতার ছড়াছড়ি। শুধু তাই নয়, এককালে যে-ভারতে গুরুকণ্ঠে 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা' আহ্বানবাণী ধ্বনিত হতো; সেখানে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করলেন, ভারত 'সকলের থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদ্যার নির্জন কারাবাসে রুদ্ধ হয়ে' আছে। এ বিচ্ছিন্নতা থেকে ভারতবর্ষকে মুক্তিদান করা সহজসাধ্য নয়। সুতরাং,

> সেবা করবার, সেবা আদায় করবার, দান করবার ও দান গ্রহণ করবার সম্বন্ধকে আমাদের তৈরি করে তুলতে হবে। বিশ্বের জ্ঞানজগৎ থেকে ভারতবর্ষ একঘরে হয়ে আছে, তাকে শিক্ষার ছিটেফোঁটা দিয়ে চিরকেলে পাঠশালায় পড়ো করে রাখা হয়েছে। আমরা পৃথিবীর জ্ঞানধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত অবমাননা থেকে মুক্তি পেতে চাই। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৩২)

এই প্রত্যয়েই বিশ্বভারতীকে সত্যসাধনা, সত্যসম্মিলন ও জ্ঞানের তীর্থ হিসেবে গড়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথ বদ্ধপরিকর ছিলেন। এ জন্য তাঁর মনে হয়েছিল ভারতবর্ষকে– তার আপন মনকে জানতে হবে এবং আধুনিককালের সকল লাঞ্ছনা থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে হবে। তিনি মনে করেছেন, যা কিছু ভারতের সম্পদ, যা কিছু ভারতের গৌরব– রামানানুজ, শংকরাচার্য, বুদ্ধদেব প্রমুখ ভারত-মনীষীগণ বিশ্বমানবের জন্য যা কিছু রেখে গেছেন তা অনুসন্ধানের প্রয়োজন। সনাতন ধর্ম ছাড়াও প্রাচ্যের আপরাপর ধর্ম জরাস্তেরীয়, ইসলাম প্রভৃতির শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। হিন্দুমুসলমানের সংমিশ্রণে ভারতের বিচিত্রসৃষ্টির পরিচয়ই যে ভারতের পূর্ণপরিচয় তা উপলব্ধির জন্য বিশ্বভারতীর মতো সাধনক্ষেত্র বড়ো ভূমিকা রাখতে পারে বলে রবীন্দ্রনাথের আত্মবিশ্বাস ছিল : 'বিশ্বভারতীতে সেই কাজটি হতে পারে। ... মানুষের জ্ঞানচর্চার বৃহৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগ হলেই তবে আমাদের বিদ্যার সার্থকতা হবে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৩৩)।

কিন্তু বিশ্বভারতীর ভাব ও আদর্শ শুরুর দিকে অনেকেই অনুধাবন করতে পারেননি। এ নিয়ে বরং রবীন্দ্রনাথের উচ্চবাচ্য তেমন ছিল না। কারণ, তাঁর মতে, 'আমি যে ভাবটিকে প্রকাশ করতে চাই বর্তমান কালে সকলের চিত্ত সে দিকে নেই' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৩৫)। এ কথা অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই কুড়ি বছর আগে নিভৃতে-গোপনে তার কাজটি করে গেছেন। মাঝে মাঝে বাধা এলে বলেছেন, 'হয়তো আমারই চরিত্রের এমন অসম্পূর্ণতা আছে যাতে আমার আপনার কর্ম দেশের কর্ম হয়ে উঠতে পারছে না' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৩৫–৩৬)। কিন্তু শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর কর্মকাণ্ডে শিশু থেকে অধ্যাপক পর্যন্ত সবাই যে সত্যসাধনায় সহযোগিতা করে গেছেন তাতে রবীন্দ্রনাথের ছিল অটল বিশ্বাস 'আশা আছে, একদিন এর বীজ নিঃসন্দেহ পরিপূর্ণ বৃক্ষরূপে উপরের আকাশে মাথা তুলবে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৩৬)। আর বিদ্যালয়ের শিশুদের চোখে-মুখে যেদিন আনন্দের ছটা দেখতে পেলেন, স্বাধীন বিকাশের প্রমাণ পেলেন সেদিন তিনি প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলেন। তাঁর গোপনটাও ছিল গরজ, আর প্রকাশ্যটাও আপনার থেকে আদেশ।

যুগচেতনা রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল। তিনি জেনেছিলেন, সময়টা ইতিহাসের ক্রান্তিকাল। ইতিহাস নতুনদিকে বাঁক নেওয়ার চেষ্টা করছে। মানুষের জন্য যেটা সত্য, আপনাকে অনেকের মধ্যে লাভ করলে তবেই সে আপনাকে লাভ করে– এটা কাজ করেছিল এতদিন ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে। জাতীয় উন্নতিই ছিল এতদিন জাতিবিশেষের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু ভূগোলের সীমা ভেঙে গেল বলে দেশ বা জাতিগত বেড়াও ভেঙে গেল; মানুষ এসে দাঁড়াল পরস্পরের কাছে– কিন্তু ব্যবধান কমলো না। রবীন্দ্রনাথের খেদোক্তি, 'কিন্তু এতবড়ো সত্যটা আজও বাহিরের সত্য হয়েই রইল, মনের ভিতরে এ সত্য স্থান পেলে না' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৪০)। তিনি চিহ্নিত করলেন এটাকে পুরোনো যুগের অভ্যাস বলে; অথচ তা বর্তমান কালের পাথেয় নয়। বরং টিকে থাকতে হলে যুগের সত্যকেই ধারণ করতে হবে। কোথাও তা হচ্ছে না বলে, 'তাই আজ মারামারি বেধেছে, নানা জাতির মিলনের ক্ষেত্রেও আনন্দ নেই, শান্তি নেই। কাটাকাটি মারামারি সন্দেহ হিংসা যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে তাতেই বুঝেছি যে, সত্যের সাধনা হচ্ছে না' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৪০)।

এই সত্যসাধনার প্রধান বাধা জাতিবৈর ও ধনের গৌরব। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, ধন মানুষের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে, আর সত্য ভেদকে অতিক্রম করে। এ শিক্ষা ভারতীয়। ভারতীয় ঋষির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাই তিনি উচ্চারণ করেছেন, ধনকে যে মানুষ চরম আশ্রয় বলে বিশ্বাস করে

না, সেই তো ধনঞ্জয়, সেই তো ধনের বেড়া ভেঙে মানবাত্মার অধিকারকে সর্বত্র উদ্‌ঘাটিত করতে পারে (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৪১)। রবীন্দ্রনাথের মতে, বিশ্বভারতী সেই অধিকার স্বীকার করেছিল। তাই ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ঐক্যসাধনা ও সত্যসাধনার যে তপস্যা করেছে অতীতে, সেটাকে বর্তমান যুগের ওপর প্রতিষ্ঠিত করাই বিশ্বভারতীর সাধনা।

চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত পদ্মাতীরের নিরালা আবাসে রবীন্দ্রনাথ আপন খেয়ালে সাহিত্যরচনা করেছেন, সাহিত্যের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাল কাটিয়েছেন। তারপর বৃহৎপৃথিবীর কর্মযজ্ঞের ডাক পান, অন্তরের আহ্বানে। যে-কর্ম করার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা হলো, তা হচ্ছে শিক্ষাদানকার্য। অথচ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ ছিল না। তাহলেও চারপাশ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতীতি জন্মেছিল আধুনিক শিক্ষাপ্রণালিতে গুরুতর একটা জিনিসের অভাব রয়েছে যা শিক্ষাকে জীবন থেকে স্বতন্ত্র রাখার পক্ষে যথেষ্ট। এই গুরুতর সমস্যা শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর সকল দেশেরও : 'সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ হতে পারছে না– সর্বত্র বিদ্যাশিক্ষাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপার করে ফেলা হয়' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৪৮)। এই সীমাবদ্ধ আয়োজন তাঁর মগ্নচৈতন্যে আদর্শ ও সংকল্পের বীজ বপন করে, যা ক্রমে অগোচরে অঙ্কুরিত হয়ে বৃহৎপৃথিবীতে জেগে ওঠে। তপোবনের শিক্ষাপ্রণালিতে রবীন্দ্রনাথ বড়ো একটা সত্য আবিষ্কার করেছিলেন। যে বিশ্বপ্রকৃতির কোলে মানুষের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির মধ্যে একটা স্বাস্থ্যকর সম্বন্ধ বিদ্যমান। ফলে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যথার্থ যোগ হয়। তাই রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি, 'তখনকার দিনে তপোবনের মধ্যে মানবজীবনের বিকাশ একটি সহজ ব্যাপার ছিল বটে, কিন্তু তার সময়টি এখনও উত্তীর্ণ হয়ে যায়নি; তার মধ্যে যে সত্য ও সৌন্দর্য আছে তা সকল কালের। বর্তমান কালেও তপোবনের জীবন আমাদের আয়ত্তের অগম্য হওয়া উচিত নয়' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৪৯)। শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর সাধনায় তাই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগের জন্য মানুষের অন্তরে যে ন্যূনাধিক ক্ষুধার অংশ আছে তা মেটাবার চেষ্টা করেছেন এবং যে-স্পর্শ থেকে মানুষ বঞ্চিত তাকেও জাগাতে চেয়েছেন। শিক্ষার্থীদের মনের ধারা ঠিক করে দিয়ে দেওয়া ও একটি অ্যাটিচুড তৈরি করে তোলাকে তিনি প্রয়োজন মনে করতেন,

> মানুষের যে এতবড়ো বিশ্বের মধ্যে এতবড়ো মানবসমাজে জন্ম হয়েছে, সে যে এতবড়ো উত্তরাধিকার লাভ করেছে, এইটার প্রতি তার মনের অভিমুখিতাকে খাঁটি করে তোলা দরকার। আমাদের দেশের এই দুর্গতির দিনে আমাদের অনেকের পক্ষেই শিক্ষার শেষ লক্ষ্য হয়েছে চাকরি, বিশ্বের সঙ্গে যে আনন্দের সম্বন্ধের দ্বারা বিশ্বসম্পদকে আত্মগত করা যায় তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। কিন্তু মানুষকে আপন অধিকারটি চিনে নিতে হবে। সে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তের সামঞ্জস্য সাধন করবে তেমন তাকে বিরাট মানব-বিশ্বের সঙ্গে সম্মিলিত হতে হবে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৫১-৫২)

এইসবের অভাবহেতু মানুষ তার স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারছে না, নিজেকে দূরে নিক্ষেপ করেছে। রবীন্দ্রনাথের ধারণা দেশে কি বিদেশে মানুষ অত্যন্ত ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রার মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখছে। ভারতীয়রা ঋষিদের বাণী ভুলেছে, যেখানে তারা বলেছেন 'ভূমৈব সুখম'– দুঃখের পথেই মানুষের সুখ। অথচ জীবনকে না জানলে, জীবনকে মানসিক ক্ষীণতা ও ভীরুতা থেকে উদ্ধার করতে না পারলে মনুষ্যত্ব অর্জন একেবারেই অসম্ভব।

দুঃখের অনুভূতিও প্রখর হয় না, হয় না আপনাকেও চেনা। শেষ বয়সে কবি লিখেছিলেন– 'আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন'; অথচ এই তপস্যা জীবন থেকে উধাও হয়ে গেছে। ঋষিদের বাণী স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যে, সৃষ্টিকর্তা তপস্যা করেন, তপস্যা করেই সবকিছু সৃজন করেছেন। জগতের সকল বস্তুতে সে তপস্যা নিহিত আছে। সৃষ্টিকর্তার এই তপঃসাধনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও তপস্যার ধারা চলছে। মানুষও সৃষ্টিকর্তা, তারও কাজ সৃষ্টি। মানুষ শুধু যে গ্রহণ করে, সঞ্চয় করে তা-ই নয়, সে ত্যাগও করে; আর এটাই তার সত্য পরিচয়। সুতরাং মানুষ যে তপস্বী– এটা তাকে উপলব্ধি করতে হবে : 'উপলব্ধি করতে হলে সকল কালের সকল দেশের তপস্যার প্রয়াসকে মানবের সত্য ধর্ম বলে বড়ো করে জানতে হবে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৫৩)। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে তপঃক্ষেত্রে বিশ্বের সব দেশের সব জাতির মানবের তপস্যার আসন পাতা হয়েছে ভারতের মানুষকেও সকল ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে সেখানে পৌঁছুতে হবে। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাকালে এ প্রত্যয়ই তাঁর মনে ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ইউরোপকে পর্যবেক্ষণ ও বিচার করেছেন নানাভাবে। ইউরোপ থেকে পাওয়া সম্মাননা তাকে শিখিয়েছে যে, 'মানুষের অন্তরপ্রদেশের বেদনা-নিকেতনে' জাতিবিচার নেই। ইউরোপের গুণী মানুষেরা তাঁকে আত্মীয়রূপে বরণ করে নিয়ে প্রাচ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছে নিঃসংকোচে; একইভাবে ইউরোপ জগদীশ চন্দ্র বসুর সত্যজ্ঞানেও অভ্যর্থনা জানিয়েছে উদারচিত্তে। রবীন্দ্রনাথ আরও লক্ষ করেছেন পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিক দুর্যোগ, রেষারেষি, যুদ্ধ ও প্রতিযোগিতা লেগে থাকলেও জ্ঞানতাত্ত্বিক সহযোগ কখনও বন্ধ হয়নি। এশিক্ষা রবীন্দ্রনাথকে তাড়িত করেছিল বলেই বিশ্বভারতীর সাধনার ক্ষেত্রে তিনি বরাবর পাশ্চাত্য মনীষীদের নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বিশ্বভারতী যেন এমন ক্ষেত্র হয়ে ওঠে, যেখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, কল্যাণজনক ও আত্মীয়জনোচিত হয়।

মানুষের ভেতরকার সবচেয়ে বড়ো প্রেরণা নিজেকে বিকশিত করবার। ভারতীয় ঋষিবাক্য স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ মানুষের চির-আকাঙ্ক্ষাকে এভাবে প্রকাশ করেছেন, 'হে সূর্য, তোমার আলোকের আবরণ খোলো, আমি সত্যকে দেখি।' মানুষের এমন আকাঙ্ক্ষার পেছনে রবীন্দ্রনাথ কারণ নির্দেশ করেছেন যে, মানুষ নিজের মধ্যে প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করে এক দ্বান্দ্বিক সত্য। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ যে অবস্থার মধ্যে সে বিরাজমান সেটিই চরম নয়। লোভ ও লোভকে চরিতার্থ করার বাসনার মধ্যে তার অন্তরে আরও এক গভীর চাওয়া কাজ করে। সে লোভের আবরণ থেকে মনুষ্যত্বকে মুক্তি দিতে চায়। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে, 'যে-পদার্থটা তার মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রবল হয়ে আছে সেটাকে সে আপন মনুষ্যত্বের প্রকাশ বলে স্বীকার করে না, বাধা বলেই স্বীকার করে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৫৯-৬০)। মানবসত্যের প্রকাশ বাধাগ্রস্ত বলেই মানুষ সভ্যতা নির্মাণ করেছে বলে রবীন্দ্রনাথের ধারণা। আর মানুষের নিজের প্রকাশ যে একলা নিজের মধ্যে নয়, সকলের সঙ্গে মিলনে এটাও জোর দিয়ে বলেছেন বারবার। তাঁর মতে, 'যেখানে এই মিলনতত্ত্বের যতটুকু খর্বতা সেইখানেই মানুষের সত্য সেই পরিমাণে আচ্ছন্ন' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৬০)।

এই প্রকাশ হচ্ছে নিজেকে দান। মানুষ নিজেকে দিতে গিয়েই নিজেকে প্রকাশ করে, নিজেকে জানে। নিজেকে দেওয়া ও নিজেকে জানা একসঙ্গে ঘটে বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ:'যে মানুষ নিজেকে সঞ্চয় ক'রে সকলের চেয়ে বড়ো হয় সেই প্রচ্ছন্ন, সেই

অবরুদ্ধ; যে মানুষ নিজেকে দান ক'রে সকলের সঙ্গে এক হতে চায় সেই প্রকাশিত, সেই মুক্ত' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৬১)। তাই আত্মনিবেদন পূর্ণ হলেই মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পায়, তা না হলে জগতের যত অনিষ্টকর ঘটনা। আত্মনিবেদনের মাধ্যমে সত্যরূপ গ্রহণ করে মানুষ বিশ্বের সঙ্গে মিলনের পথ পায়।

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের বিশ্বভারতীর ভেতরকার সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি মনে করতেন বিদ্যার্থীরা যদি আশ্রমের ভেতরের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করতে সমর্থ হয়, আত্মনিবেদন আপনা থেকেই আসবে। সত্যে ধোঁয়াশা থাকলে ত্যাগে স্বতঃস্ফূর্ততা না-আসাই স্বাভাবিক। কেননা সত্য মানুষকে ত্যাগ করতে শেখায়। আবার ত্যাগের দ্বারাই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে এই ত্যাগেরই আহ্বান করেছিলেন।

কিন্তু এই ত্যাগ নিয়েও মানুষের বিভ্রান্তি ছিল দীর্ঘদিন ধরে। জাতিরাষ্ট্র উদ্ভবের পর থেকে পৃথিবীতে মানুষ স্বজাতির নামে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়। ন্যাশনালিজম হয়ে উঠেছিল মনুষ্যত্বের বড়ো সত্য। এর অনিবার্য ফল ছিল লুণ্ঠন, শোষণ, নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বযুদ্ধ। ন্যাশনালিজমের সংকীর্ণ পরিচয় সত্যকে খণ্ডিত করেছিল বলে তা অশুভ পরিণতির পথ পায়। জাতিরাষ্ট্রের কারখানা ইউরোপ তাই জাতীয়তার বিভীষিকায় দগ্ধ হতে চললো,

> যুদ্ধ ও সন্ধির ভিতর দিয়ে যে নিদারুণ দুঃখ য়ুরোপকে আলোড়িত করে তুলেছে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, নেশনরূপের মধ্যে মানুষ আপন সত্যকে আবৃত করে ফেলেছে; মানুষের আত্মা বলছে, 'অপাবৃণু'— আবরণ উদ্‌ঘাটন করো। মনুষ্যত্বের প্রকাশ আচ্ছন্ন করছে বলে স্বজাতির নামে পাপাচরণ সম্বন্ধে মানুষ এতদিন এমন স্পষ্ট ঔদ্ধত্য করতে পেরেছে, এবং মনে করতে পেরেছে যে, তাতে তার কোনো ক্ষতি হয় নি, লাভই হয়েছে। অবশেষে আজ নেশন যখন আপনার মুষল আপনি প্রসব করতে আরম্ভ করেছে তখন য়ুরোপে নেশন আপনার মূর্তি দেখে আপনি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৬৪)

অথচ নতুন যুগ নিয়ে এসেছে নবজীবনের বার্তা। এই বার্তা মানবের আপন স্বরূপ উন্মোচনের। এই নবযুগের বাণীই রবীন্দ্রনাথের অন্তরের বাণী; বিশ্বভারতীতে এই বাণীরই বিঘোষক রবীন্দ্রনাথ। আশ্রমকে তাই তিনি সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন এবং বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব জ্ঞানসাধক নবজীবনের বার্তা নিয়ে বিশ্বভারতীতে হাজির হয়েছেন তাঁদের সম্মিলনই মানুষের সত্যরূপ প্রতিষ্ঠার একটি প্রয়াস বলে মনে করেছেন। দেশে দেশে মানুষ জাতিভেদের মাধ্যমে যেভাবে মানবতাকে খণ্ডিত করেছে, সেখানে আত্মপরিচয়ে নিজেকেও কাটাছেঁড়া করেছে। এই 'ভেদবাধার তিমির-মুক্ত মানুষের রূপ'-এর বিপরীতে মানবতার শুশ্রূষায় ভারতকে তীর্থ হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত রবীন্দ্রনাথ, 'পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই আশ্রম এমন একটি জায়গা হয়ে উঠুক যেখানে ধর্ম ভাষা এবং জাতিগত সকলপ্রকার পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা মানুষকে তার বাহ্যভেদমুক্তরূপে মানুষ বলে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়াই নতুন যুগকে দেখতে পাওয়া' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৬৫–৬৬)।

কিন্তু নতুন যুগের ভারতের অন্তরাত্মা কেমন? রবীন্দ্রনাথ একে পুরোনো আদিগঙ্গার দুর্গতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভারত একসময় সমস্ত পৃথিবীকে বড়ো সত্য তার উদার হস্তে দান করেছিল, বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিল বলে কল্যাণময় আহ্বানে ও সুযোগে বড়ো ক্ষেত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিল। চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, সাধনার দ্বারা মনুষ্যত্বের তপস্যা করেছিল।

অথচ সে-ভারত আজ দরিদ্র, রিক্ত ও অপমানিত। তাহলেও রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি ছিল, 'কিন্তু কৃষ্ণপক্ষই ভারতের একমাত্র পক্ষ নয়, শুক্লপক্ষের আলোক থেকে বিধাতা তাকে বঞ্চিত করেন নি। সেই আলোকের যোগেই সে আপন পূর্ণিমার গৌরব নিখিলের কাছে উদ্‌ঘাটিত করবার অধিকারী' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৭৩–৭৪)। এই পূর্ণিমার আলো দেওয়ার মতো সম্পদ ভারতের আছে সুতরাং সারা পৃথিবীকে ভারত নিমন্ত্রণ করতে পারে। ধনে দরিদ্র বলে যদি সে সংকোচ বোধ করে তবে সেটা সর্বমানবেরই অপমান। রবীন্দ্রনাথের এই সংকোচ ছিল না। তিনি বুদ্ধদেবের মতো জানতেন, সত্য আপন মহিমাতেই গৌরবান্বিত।

পশ্চিমের অভিঘাতেই ভারতীয় মনে জাত্যাভিমান আসে। ফলে সে শিখেছে নেশন পরিচয় আগে, তারপরে সত্য। ভারতজীবনে জরা এসেছে এই পথ দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও দেখেছেন পশ্চিমে অর্থব্যবস্থা কীভাবে শিক্ষাদীক্ষাসত্যসাধনাকে নিঃশেষিত করছে। সুতরাং ভারতের পথ এ নয়; ভারতের আকাঙ্ক্ষাও তা নয় : 'বিশ্বভারতীর কণ্ঠ দিয়ে এই কথাই আমরা বলতে চাই যে, ভারতবর্ষে সত্যসম্পদ বিনষ্ট হয় নি। না-যদি হয়ে থাকে তা হলে সত্যের দায়িত্ব মানতেই হবে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৭৫)। এই দায়িত্ব বিশ্বভারতী নিয়েও ছিল। দায়িত্বের সঙ্গে নিমন্ত্রণ জড়িত বলে রবীন্দ্রনাথ ঋষিবাণী ভুলেননি,— 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'— তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা শুনে যাও। সত্যের নিমন্ত্রণবাণী বিশ্বভারতী ঘোষণা করে। কেননা নীরব থাকা আর অস্তিত্বহীন হওয়া এককথা। তাই সত্যসাধনার বাণী ভারত ও বিশ্বের কাছে বিশ্বভারতী প্রচার করুক, বিশ্বভারতীতে ভারত আপনার সম্পদ উপলব্ধি করুক সে ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সচেষ্ট থেকেছেন।

মুক্তির আদর্শ নিয়ে যে শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী শিক্ষাকেন্দ্রের পত্তন হয়েছিল সেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংকীর্ণ সংস্কার দূর হয়ে বন্দিদশা কতকটা ঘুচেওছিল। এখানে সব মানুষকে আপন বলে স্বীকার করা হয়েছিল; পরস্পরের সম্বন্ধ ক্রমশ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল; এর প্রধান কারণ ছিল প্রকৃতিতে ধাত্রী হিসেবে স্বীকার করা। কিন্তু মানুষের আরও একটা অস্বাভাবিকতা রবীন্দ্রনাথের মনোঃপীড়ার কারণ ছিল। সেটা হলো এই যে, মানুষই মানুষের প্রধান শত্রু হিসেবে অবতীর্ণ হওয়া। মানুষের সীমাহীন অজ্ঞতাই যে এর প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন। জানতেন অজ্ঞতার খেসারত দিতে গিয়েই মানুষ অন্তর থেকে বিশ্বকে অস্বীকার করে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনছে। অথচ নানা সভ্যতার ধারায় পৃথিবীতে যেমন জ্ঞানের তীর্থ রচিত হয়েছে, তেমনি নানা জাতির সমাবেশে মানুষের মহামিলনও হয়েছে। গ্রিস রোম প্রভৃতি বড়ো সভ্যতার মধ্যে নানা জ্ঞানধারার সম্মিলন ছিল তেমনি ভারতীয় সভ্যতাতেও তেমনি আর্য দ্রাবিড় পারসিক প্রভৃতি নানা বিচিত্র জাতির মিলন হয়েছিল। অন্যদিকে পৃথিবীর ইতিহাসে শুধু বর্বররাই অন্যকে অস্বীকার করে গ্রহণ না করে স্বতন্ত্র থেকেছে। সুতরাং শত্রুতার পরিবর্তে নতুন যুগে বিশ্বমানবকে আপন সত্তার অংশ বলে স্বীকার করার সময় এসেছে।

যে-ভারতবর্ষ দেহমনে নানা জাতের মানুষের মিলনে গড়া, যার সাধনা নানা জ্ঞান, নানা সভ্যতার সাধনা সে ভারত ইউরোপীয় নেশনের আদলে নিজেকে গড়ার যে মতলব আঁটছে তাতে রবীন্দ্রনাথ উৎকণ্ঠিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, এমনটা হওয়ার প্রধান কারণ ভারতবর্ষের মানুষ আপন ইতিহাস ভুলতে বসেছে। কেননা ইউরোপ আমেরিকার যার যার জাতীয়তার ভিত্তি আর ভারতের ভিত্তি এক নয়। ভারত-অন্তরের কথা হচ্ছে, 'যিনি বিশ্বকে আপনার বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনিই যথার্থ সত্যকে লাভ করেছেন।' অর্থাৎ তিনি

অপ্রকাশ থাকেন না। তিনি সর্বলোকে সর্বকালে প্রকাশিত হন। কিন্তু যারা অপ্রকাশ, যারা অন্যকে স্বীকার করল না, তারা কখনও বড়ো হতে পারল না। ইতিহাসে তারা কোনো বড়ো সত্যকে রেখে যেতে পারল না। ইতিহাস তা বলেও না। ইতিহাস হচ্ছে মানুষ যখনই বিশ্বে নিজের জ্ঞান ও প্রেমের অধিকার বিস্তৃত করতে পেরেছে তখনই সে আপন সত্যকে লাভ করেছে, বড়ো হয়েছে (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৮৩)।

প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে মুক্তি দেবেন। কিন্তু পরে যখন তার মনে হলো, মানুষে মানুষে বিরাট ব্যবধান ঘটে গেছে; এবং তা অপসারণ করা দরকার, তখন নব কর্মপন্থা যুক্ত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দেবার প্রতিজ্ঞা করলেন। সেই লক্ষে তিনি পরিণতির দিকে এগিয়ে গেলেন,

> কারণ বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। নিজের ঘরের— নিজের দেশের মধ্যে যে মুক্তি তা হল ছোটো কথা; তাতে করে সত্য খণ্ডিত হয়, আর সেজন্যই জগতে অশান্তির সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে বারে বারে পদে পদে এই সত্যের বিচ্যুতি হয়েছে বলে মানুষ পীড়িত হয়েছে, বিদ্রোহানল জ্বালিয়েছে। মানুষে মানুষে যে সত্য— 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি', এই কথার মধ্যে যে বিশ্বজনীন সত্য আছে তা মানুষ মানে নি, স্বদেশের গণ্ডিতে আপনাদের আবদ্ধ করেছে। মানুষ যে পরিমাণে এই ঐক্যকে স্বীকার করেছে সে পরিমাণে সে যথার্থ সত্যকে পেয়েছে, আপনার পূর্ণ-পরিচয় লাভ করেছে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৮৩–৮৪)

এই উপলব্ধি নিয়েই বিশ্বভারতীকে বর্তমান পৃথিবীর সমস্যা মোকাবেলায় আসীন হতে অকুণ্ঠ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতের ঐশ্বর্যের প্রতি আস্থা এনে অকৃপণ হাতে বিশ্বমিলনক্ষেত্রে তা প্রচার করতে যদি আঘাত ও অপমানও আসে তাহলেও সেটাকে বরণ করতে আহ্বান করেন। 'পৃথিবীর দেয়ালি-উৎসবে ভারতের যে প্রদীপ জ্বলবে সেই প্রদীপশিখার যেন অস্বীকৃতি না ঘটে, বিদ্রুপের দ্বারা যেন তাকে আচ্ছন্ন না করি' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৮৫)। যে ভারতবর্ষ চিরকাল 'সকল অন্ধকার ও অসত্য থেকে জ্যোতিতে নিয়ে যাও', ও 'মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে নিয়ে যাও' বলে প্রার্থনা করেছে, সে ভারতবর্ষ নিজেকে ছোটো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে রাজি নয় বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।

একটা স্বপ্নের ঘোরে আশ্রমবিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ক্রমে তা বিশ্বভারতীতে রূপ নিয়েছিল। ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে ছাত্রশিক্ষক জড়ো হয়েছেন, দূরপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকেও এসেছেন জ্ঞানসাধকরা। পাশ্চাত্যের সিলভ্যা লেভি, উইন্টারনিট্জ, লেসনি প্রমুখ বিদ্বানরা এসেছেন, ভারতকে দিয়েছেন, ভারতে থেকে নিয়েছেন। বিশ্বভারতী নিজের অন্তর্গূঢ় স্বভাব অনুসরণ করে বিশ্বের ক্ষেত্রে নিজেকে প্রকাশ্য করেছে। রবীন্দ্রনাথের এই হীনম্মন্যতা কখনওই ছিল না ভারত পরাধীন বলে, ভারত দরিদ্র বলে তার সত্যসম্পদ বিশ্ব গ্রহণ করবে না। সর্বদাই তাঁর প্রতীতি ছিল যদি সাধনা সত্য হয়, অন্তরে বাণী থাকে তাহলে মাথা হেঁট করে সকলকে তা নিতেই হবে। তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল, ভারত একটা সুগভীর ভাবলোকেই নিজের মতো ছিল। ভেদবুদ্ধি ও বিদ্বেষবুদ্ধি যেখানে সারা পৃথিবীকে অস্থির করে তুলেছে, মানুষের পারস্পরিক শত্রুতা প্রাচীন পৃথিবীকেও হার মানিয়ে দিয়েছে; ভারতের ঘুম ভেঙেছে বরং সে

সংঘাত ও সংহারেই। মানুষের সীমাহীন বেদনা, দাসত্ব ও মনুষ্যত্বের খর্বতা নিরস্ত করতে ভারত-ঐশ্বর্যকেই সন্ধান করেছে।

বুদ্ধদেবের বাণী বিশ্বসমস্যা মোকাবেলায় রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণা দিয়েছিল, আশ্বস্ত করেছিল। যে বুদ্ধ একদিন একটা ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, 'আমি সমস্ত মানুষের দুঃখ দূর করব'; তাঁকেই আদর্শ হিসেবে নিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথা হলো, বুদ্ধদেব মানুষের দুঃখ দূর করতে পেরেছিলেন কি না সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৯২)। বুদ্ধদেব চাননি ভারতবর্ষ শক্তিমত্ত হোক, ধনী হোক। তিনি তপস্যা করেছিলেন মানবসত্যের, দুঃখজয়ের। ভারত সে সাধনায় আবার জেগে উঠুক, সেই ধ্যানবিন্দু বিশ্বমানবে ছড়িয়ে দিক এটাই চেয়েছিলেন। বিশ্বভারতী সে মন্ত্রপাঠের দায়িত্ব নিক।

গীতার বাণীও তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল– 'ফলে লোভ করলে আপনাকে ভোলাব, অন্যকে ভোলাব'। সর্বমানব সম্বন্ধে ভারতের সমকালীন দীনতা ভুলে গিয়ে বিশ্বভারতীর ক্ষেত্র ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বারবার বিশ্ববাসীকে ভারততীর্থে আহ্বান করেছেন। কোনো বিশেষ শক্তিতে এই আহ্বান করেননি তিনি; না ব্যক্তিক, না সামষ্টিক। তাঁর মনে ভরসা ছিল মানুষের এই মুক্তির ডাক মানুষ শুনতে পাবেই, যতদূরেই সে থাক। কতটা সফল হবেন, নিশ্চিত যদিও ছিলেন না। তবে শুভবোধের ডাক তো নিরন্তর ছিলই : '...সেই সৃষ্টির আনন্দ এবং তপোদুঃখ আমাদের হোক। ছোটো ছোটো মতের অনৈক্য, স্বার্থের সংঘাত ভুলে গিয়ে সাধনাকে আমরা বিশুদ্ধ রাখব সেই উৎসাহ আমাদের আসুক' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৯৩)। রবীন্দ্রনাথ সে সাধনাকে তার একলার বলেননি, বলেছেন সকলের।

রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন ভারতবর্ষের সর্বত্র শুধুই বন্ধনের রূপ, মুক্তির আদল কোথাও নেই। আর যে-বন্ধন একে জর্জরিত করে রেখেছে তা বাইরের নয়, ভেতরের। ভেদবিভেদের অসংখ্য শৃঙ্খলের চক্র ভারতকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও পীড়িত করে রেখেছে। আত্মীয়তার মধ্যে যে মানুষের মুক্তি এটা ভুলে গিয়ে পরস্পরের মধ্যে তৈরি করেছে বিরোধ ও বেড়া। রবীন্দ্রনাথ পর্যবেক্ষণ যে,

> এক প্রদেশেরে সঙ্গে অন্য প্রদেশের অনৈক্যকে আমরা রাষ্ট্রনৈতিক বক্তৃতামঞ্চে বাক্যকুহেলিকার মধ্যে ঢাকা দিয়ে রাখতে চাই, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে পরস্পরসম্বন্ধে ঈর্ষা অবজ্ঞা আত্মপরভেদবুদ্ধি কেবলই যখন কণ্টকিত হয়ে ওঠে তখন সেটার সম্বন্ধে আমাদের লজ্জাবোধ পর্যন্ত থাকে না। এমনি করে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার আশা দূরে থাক্, পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের পথও সুগভীর ঔদাসীন্যের দ্বারা বাধগ্রস্ত। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৯৫–৯৬)

অজ্ঞানতা ও স্বার্থবুদ্ধি এতটাই প্রকট যে রবীন্দ্রনাথ একে ভারতের 'অন্ধকার' হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন, এটাই ভারতের প্রধান দুর্বলতার কারণ। এই অন্ধকারই ভারতের বিভিন্ন সত্তাকে স্বতন্ত্র করে যোগাযোগহীন ও দূরবর্তী করেছে। ভারতেবর্ষে 'সেই রাত্রি চিরন্তন হয়ে রয়েছে' বলে রামমোহন রায় যেমন করে মুসলমানদের জানতেন কিংবা দারাশিকো হিন্দুদের বুঝেছিলেন; সেই বোঝাপড়া হিন্দু-মুসলমানে ততটা দেখতে পাননি রবীন্দ্রনাথ। তিনি মনে করতেন, রামমোহন বা দারাশিকোর মতো পারস্পরিক বোঝাপড়াই হিন্দু-মুসলমানের ভেদ ঘুচাতে পারে। শাস্ত্রীয় অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের বন্ধনকেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত বন্ধন বলে মনে করতেন। সুতরাং যারাই পরস্পরকে মানুষরূপে জানে তারাই তার জ্ঞাতি বলে ভারতের হিন্দু-

মুসলমান-শিখ প্রভৃতি পরস্পর সম্বন্ধে মহাজ্ঞাতি হলেই তবে তারা মহাজাতি হতে পারবে বলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল।

এই পরস্পরের জানার সোপান ছিল বিশ্বভারতী। এই পরস্পরের মিলনের সাধনাই ছিল বিশ্বভারতী বিদ্যায়তনের সাধনা। বিধুশেখর শাস্ত্রী হিন্দুদের সনাতন শাস্ত্রীয় বিদ্যার বাইরে যেসব বিদ্যা আছে তাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে আয়ত্ত করার যে ডাক দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের এটা গভীরভাবে মনে ধরেছিল। সে আহ্বান মাথায় রেখেই, সে সত্যের প্রতি প্রতীতি রেখেই রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন বিদ্যার ক্ষেত্রে সকল জাতির প্রতি সসম্মান আতিথ্যই যথার্থ ভারতীয়। সুতরাং এর কৃপণতা মানেই বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাবের বিকৃতি। শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী এ বিকৃতিকে পরিহার করে দেশের নানা জাতির পরিচয়ের ওপর ভারতের যে আত্মপরিচয় নির্ভর করে, সে সাধনার পীঠনির্মাণে এগিয়ে চলে, 'শান্তিনিকেতনে সেই সাধনার প্রতিষ্ঠা ধ্রুব হোক, এই ভাবনাটি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে বিরাজ করছে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ৯৯)। শুধু তাই নয়, অসংখ্য অভাব, দৈন্য ও ব্যাঘাতের ভেতর দিয়ে দুর্গম পথ বেয়ে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় যেখানে পৌঁছায়; তাতে তাঁর মনে হয়, এর সাধনা ভারত ভূ-সীমানায় বদ্ধ থাকতে পারে না। ভারতের যা আন্তর-সম্পদ তার দাবি সমগ্র বিশ্বের; জাত্যাভিমানের প্রবল উগ্রতা মন থেকে মুছে পৃথিবীর দাবি মোচন করার দায়িত্ব হয়ে পড়েছে বিশ্বভারতীর। 'যে ভারত সকল কালের সকল লোকের, সেই ভারতে সকল কাল ও সকল লোককে নিমন্ত্রণ করবার ভার বিশ্বভারতীর' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১০২)।

এই বোধ ও প্রেরণা আরও শানিত হয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের পর। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। প্রায় প্রতিদিন আগন্তুকেরা রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করতেন, পৃথিবীকে দেওয়ার মতো ভারতবর্ষের কী আছে? এটা রবীন্দ্রনাথকে ভীষণ ভাবিয়েছিল, তিনি একটা উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন। দেখেছিলেন তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনার মধ্যেই এদের জবাব লুকিয়ে আছে;

> ভারতের ঐশ্বর্য বলতে এই বুঝি, যা-কিছু তার নিজের লোকের বিশেষ ব্যবহারে নিঃশেষ করবার নয়। যা নিয়ে ভারত দানের অধিকার, আতিথ্যের অধিকার পায়— যার জোরে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সে নিজের আসন গ্রহণ করতে পারে— অর্থাৎ যাতে তার অভাবের পরিচয় নয়, তার পূর্ণতারই পরিচয়— তাই তার সম্পদ। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১০২)

মানবজাতির ইতিহাস চর্চা করে তিনি দেখেছিলেন প্রত্যেক বড়ো জাতির নিজের বৈষয়িক ব্যাপারে যেমন সৈন্যসামন্ত ও অর্থসামর্থ্য ইত্যাদিতে ভাগ চলে না; সে ভাগে তার ক্ষতি হয় কিন্তু ঐশ্বর্য ভাগে সে গর্বিত হয়। ইতিহাসে ফিনিসীয়রা প্রভৃতি জাতি প্রভূত ধনের মালিক হলেও সভ্যতায় তাদের তেমন দান নেই; অন্যদিকে ইজিপ্ট, গ্রিস, রোম, প্যালেস্টাইন চীন প্রভৃতি দেশ নানা ঐশ্বর্য দান করে বিশ্বকে ঋণী করে গৌরবের অধিকারী। সেই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল ভারতের হাতে শুধু ভিক্ষার ঝুলি নয়, বিশ্বযজ্ঞে দেওয়ার মতো তার অপার সম্পদ রয়েছে; এবং এই এই সম্পদের জন্য সে বিশ্বমানবকে আহ্বান করতে পারে। সুতরাং সকলের জন্য ভারতের বাণী তাই বিশ্বভারতী।

অপরদিকে সমগ্র পৃথিবীর ওপরে ইউরোপের আপন প্রভাব বিস্তারকে রবীন্দ্রনাথ আকস্মিক মনে করেননি; বিষয়টা তার কাছে বাহ্যও ছিল না। কেননা যে বর্বরতা প্রয়োজনের ওপর জোর দেয়,

রবীন্দ্রনাথের ধারণা ইউরোপ অনেক আগেই তা অতিক্রম করেছে। এমনকি ইউরোপ এমন এক সর্বজনীন ও সর্বকালীন সত্যের সন্ধান পেয়েছে যা সমস্ত প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে ও পরিপূর্ণ। ইউরোপীয় সেই পরশপাথরের নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানই ইউরোপকে একক ক্ষমতাশালী করেছে। 'এই বিজ্ঞানকে প্রকাশের দ্বারাই পৃথিবীতে সে আপনার অধিকার পেয়েছে। যদি কোনো কারণ য়ুরোপের দৈহিক বিনাশও ঘটে, তবু এই সত্যের মূল্যে মানুষের ইতিহাসে তার স্থান কোনোদিন বিলুপ্ত হতে পারবে না' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১০৪)। মানবভ্যতায় ইউরোপের এই দানই তার গৌরব ও অমরতা উল্লেখ করেও রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ইউরোপ যেখানে নিজের লোভকে সমস্ত মানুষের চেয়ে বড়ো মনে করে, সেখানেই তার অভাব– সেখানেই তার খর্বতা ও বর্বরতা। এর কারণ ইউরোপের বিচ্ছিন্নতা, যা মানুষকে মানবসত্য থেকে দূরে রাখে। এই বিচ্ছিন্নতাকে রবীন্দ্রনাথ বরাবর পশুধর্ম বলে অভিহিতও করেছেন।

আবার পশ্চিমা দেশগুলো বিজ্ঞানের বাইরেও পলিটিক্স দ্বারা বিশ্বকে পর করে দিয়েছে বলে লক্ষ করেছেন। তাঁর অনুভূত হয়েছে যে, আত্মম্ভরি পলিটিক্সের দ্বারা ইউরোপের যেখানে আত্মবমননা, সেখানেই তার অন্ধকার। অর্থাৎ, ইউরোপ বিজ্ঞান দ্বারা নিজেকে সার্থক করছে, বিশ্বকে প্রকাশ করছে; অন্যদিকে সর্বভুক ক্ষুধার্ত পলিটিক্স নিজের বিনাশ ঘটাচ্ছে। 'কেননা পলিটিক্সের শোণিতরক্ত-উত্তেজনায় সে নিজেকে ছাড়া আর সমস্তকেই অস্পষ্ট ও ছোটো করে দেখে; সুতরাং সত্যকে খণ্ডিত করার দ্বারা অশান্তির চক্রবাত্যায় আত্মহত্যাকে আবর্তিত করে তোলে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১০৫)।

বিশ্বের ক্রমবর্ধমান এই ভয়াল বিভীষিকা থেকে পরিত্রাণেরও পথ আছে বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। এক্ষেত্রে তার কাছে ইউরোপ অনুসরণযোগ্য নয়। যে ইউরোপ সীমাহীন অহমিকা দ্বারা, জাত্যাভিমানে আবিল ভেদবুদ্ধি-দ্বারা নিজে বড়ো হয়েছে; এটা বড়োত্ব নয়, এটা বড়োত্বের বাহ্যরূপ। বরং যে জ্ঞান, যে বিজ্ঞান তাকে মহৎ করেছে তাই তার সত্য; এই সত্যই মুক্তির পথ। এই পথের যৌথসারথি যা কিছু ভারত-ঐশ্বর্য। বিশ্বভারতীর কাজের ভেতর সে ঐশ্বর্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি হেতু থাকুন, এটাই ছিল তার সাধনা।

জ্ঞান, ধর্ম ও সাধনা ছাড়াও ভারতের যে ঐশ্বর্য বিশ্বকে দেওয়ার মতো তা হচ্ছে ভারত-সংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথ তার সাধনযজ্ঞে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগ করেছিলেন। ইউরোপের সংস্কৃতি কেবল বিজ্ঞান নিয়ে ছিল না– সাহিত্য, সংগীত, নানা কলাবিদ্যা ও জনহিতকর কর্মচাঞ্চল্য নিয়ে তার সংস্কৃতির জগৎ বিস্তৃত ছিল। এইসব সাংস্কৃতিক ধারা যে কেবল কর্মফল নিয়ে ছিল এমন নয়– তার মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের আত্মিক বিকাশ, মনুষ্যত্ব। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল নানাভাবে সে বিকাশের প্রবর্তনা ও আনুকূল্য যদি দেশের মধ্যে থাকে তাহলেই দেশের অন্তরাত্মা জেগে উঠতে পারে। 'মানুষের প্রকৃতিতে ঊর্ধ্বদেশে আছে তার নিষ্কাম কর্মের আদেশ, সেইখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই বেদী যেখানে অন্য কোনো আশা না রেখে সে সত্যের কাছে বিশুদ্ধভাবে আত্মসমর্থন করতে পারে– আর কোনো কারণে নয়, তাতে তা আত্মারই পূর্ণতা হয় ব'লে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৪৭)। কিন্তু বাস্তবে ভারতের অবস্থা ছিল ভিন্ন। যে-কটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন জায়গায়, দেখা গেল সেখানে বাঁধা নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালিতে ডিগ্রি দেওয়ার 'কারখানাঘর' বসেছে। এধরনের ডিগ্রিতে সমাজে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বাড়লেও সত্যের জন্য কর্মের

জন্য নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা পায়নি। মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য মানবসত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাগ্রে বরং এর প্রয়োজন ছিল। এই বাস্তব প্রয়োজনেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমে সংস্কৃতি-অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় করেছিলেন। 'আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ যে সীমা আছে, কেবলমাত্র তাই নয়, সকলরকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের জন্যে যেসকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত ব'লে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণবিকাশের পক্ষে এই সমস্তরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৪৮–৪৯)। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ পদ্মার বোট থেকে উঠে এসে কলকাতার অদূরের পল্লিতে কর্মী ও শিক্ষক রবীন্দ্রনাথে পরিণত হন।

উপসংহার

'বস্তুত সাধনা করার আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসেছিল, আমার নিজের জন্যে। নিজেকে দিয়ে ফেলার দ্বারা নিজেকে পাওয়ার লোভ আমাকে দখল করেছিল' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৪৯)। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের একটা বক্তৃতায় নিজের দীর্ঘ সাধনার উন্মোচন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এভাবে। দীর্ঘ চল্লিশ বছরে শিক্ষব্রতী কবি এমনরূপ সাধনাকে আরও উল্লেখ করেছেন, 'এই আত্মবিকাশ, এ কেবল সাধনার ফলে, বৃহৎ মানবজীবনের সংগমক্ষেত্রে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৫০)। এই অভিজ্ঞান শেষে পেয়েছিলেন তিনি যে, আপনাকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই বৃহৎ মানুষের সংসর্গ পাওয়া যায়, 'সামান্য ছেলে পড়ানোর মধ্যেও'। মানুষের সামান্য প্রচেষ্টাও বৃথা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন আগে যখন খুব ক্ষীণ ও অতি তুচ্ছভাবে আয়োজন করেছিলেন শান্তিনিকেতনের, সেদিন তিনি ভাবেননি তাঁর জীবৎকালেই বিশ্বভারতীরূপে এর বিস্তার ঘটবে। তবে, কোনো একদিন বিরাট ভারতবর্ষ এই আশ্রমের মধ্যে আসন পাতবে; নানা জাতি, নানা বিদ্যা ও নানা সম্প্রদায়ের সমাবেশ ঘটবে এ সংকল্প তাঁর মনে ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ সাধনা তাঁর একার ছিল না। এ সাধনায় ভারতের নানা স্থান থেকে যেমন সাধকরা এসেছেন, তেমনি এ কর্মযজ্ঞে যোগ দিয়েছেন বহুদূর থেকে আগত বিদেশি জ্ঞানতাপসেরাও। রবীন্দ্রনাথের কৃতজ্ঞচিত্তে তাই, ' এই-যে হল, এ কোনো একজনের কৃতিত্ব নয়। সকল কর্মীর চিন্তা ও ত্যাগের দ্বারা, সকলের মিলিত কর্ম এই সমগ্রকে পুষ্ট করেছে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৩০)। যদিও তখন স্বদেশবাসীর সহযোগিতা পাননি রবীন্দ্রনাথ।

বহুদিনে ত্যাগের দ্বারা, চেষ্টার দ্বারা আশ্রমকে দেশের বেদিমূলে স্থাপন করার সাধনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর আয়ুর সঙ্গে সঙ্গেই সাঙ্গ করে এনেছিলেন। একটা ব্যাপরে তিনি তুষ্ট ছিলেন যে ব্যক্তিবিশেষের আশ্রয়ে তা পূর্ণতার দিকে যায়নি, বরং সম্মিলিত উদ্যোগে আশ্রমকে জনসাধারণের সংকল্পের অন্তর্গত করে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত করেছেন। বিপুল কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে শ্রেয়কে বরণ করেছেন, যেহেতু কর্মের সাধনাই তাঁর কাছে মনুষ্যত্বের সাধনা ছিল। এই সাধনা এমনটা সর্বজনীন রূপ পেয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন, 'আমাদের এখানে সাধনার আসন পাতা আছে' এবং তার সর্বত্রই ধ্বনিত হচ্ছে প্রাচীন আচার্যদের একটি আহ্বান, 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'। তাই বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের অভিভাষণে অতিথি মনীষীদের সামনে ঘোষণা দেন, 'আমাদের এই আশ্রমের কর্মেতে যে

আপনাকে সমর্পণ করেছি তা সার্থক হবে যদি আমার এই সৃষ্টি আমি যাবার পূর্বে দেশকে সঁপে দিতে পারি' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৫৩)। এও তিনি বলেন, যেমন শ্রদ্ধায় দিতে চাই, তেমনি শ্রদ্ধায় একে গ্রহণ করতে হবে। এমনকি দেওয়া-নেওয়া যেদিন পূর্ণ হবে সেদিন তার কর্মসাধনার ক্ষেত্রটি পূর্ণতায় ভরে উঠবে বলে মনে করেছেন। আর যে তপস্যা চল্লিশ বছর ধরে করেছেন শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী ক্ষেত্রে; সে আদর্শের সঞ্চার রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাশা করেছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, অনাগত কালেও তিনি চেয়েছেন এর বিস্তার। যদিও রবীন্দ্রনাথ তাঁর বর্তমান নিয়ে সুখী ছিলেন না। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে (১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ৭ শ্রাবণ) জীর্ণ শরীরে শান্তিনিকেতন মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ যে উপদেশ বাণী দেন তাতে তাঁর হতাশাই প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি মন্দ্রিত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'প্রথম যে আদর্শ বহন করে এখানে এসেছিলুম, আমার জীর্ণ শক্তির অপটুতা থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে নিজের হাতে বহন করবার আনন্দিত উদ্যম কোথাও দেখতে পাচ্ছিনে। মনে হয় এ যেন বর্তমান কালেরই বৈশিষ্ট্য' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৫৫–১৫৬)। রবীন্দ্রনাথের প্রাজ্ঞ মন এটা অনুধাবন করেছিল সবকিছুকে সন্দেহ করা, অপমান করাই যেন এ যুগের স্পর্ধা। এর বীভৎস লক্ষণ মারীবিস্তার করে উঠেছে পশ্চিম থেকে পূর্বে। আর মানবসভ্যতার চিরদিনের সাধনার সামগ্রীকে উপেক্ষা ও বিদ্রূপ করছে সমাজ ও রাষ্ট্র। তবু তার চির আশাবাদী মন নিবেদন করেছে তার কর্ম ও সাধনাকে, 'আধুনিক যুগের শ্রদ্ধাহীন স্পর্ধা দ্বারা এই তপস্যাকে মন থেকে প্রত্যাখ্যান করো না– একে স্বীকার করে নাও' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৯ : ১৫৭)। এই বাক্যে যে শুধু অনুনয় ছিল তা নয়, ছিল মনুষ্যত্বের প্রতি দায় ও সুগভীর প্রেম। মনুষ্যত্বের সাধনার এই ক্ষেত্রকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথের শেষ আশাবাদ মানুষেরই অপরিসীম সম্ভাবনার প্রতি, 'ইতিহাসের বিপর্যয় বহু ঘটেছে, সভ্যতার বহু কীর্তিমন্দির যুগে যুগে বিধ্বস্ত হয়েছে, তবু মানুষের শক্তি আজও সম্পূর্ণ লোপ পায়নি।'

সহায়কপঞ্জি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৪০৭)। *শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১৯)। *বিশ্বভারতী*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০৭)। 'মনুষ্যত্ব'। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (সপ্তম খণ্ড)। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১৭)। *মানুষের ধর্ম*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (দশম খণ্ড)। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সিকাগো থেকে ৩রা মার্চ ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত পত্র। *প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লস এঞ্জেলেস থেকে ১১ অক্টাবর ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত পত্র। *চিঠিপত্র* ২। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

শামসুর রাহমানের কবিতা : আত্মজৈবনিকতা ও আত্মস্বীকারোক্তি

সাবিনা ইয়াসমিন*

[সারসংক্ষেপ : আত্মবিবরণমূলক, আত্মবিবৃতিমূলক এবং আত্মস্বীকারোক্তিমূলক— এই তিনটি কাঠামোর ত্রিকৌণিক মানচিত্রের কেন্দ্রে অবস্থান করে কবির আত্মসত্তা। খুব সূক্ষ্ম কিছু তারতম্যের ভিত্তিতে উল্লিখিত ত্রিমুখী ধারার বিকাশ। অনুভূতির স্বত্বাধিকার কবির একচেটিয়া হলেও যে প্রেক্ষাপটে এইসব অনুভূতির বিকাশ, সেই প্রেক্ষাপটটি কবির একান্ত জগৎ নাও হতে পারে। একইভাবে আত্মবিবরণমূলক কবিতায় কবি ঘটনার ধারা বিবরণকারী— সত্যাসত্য নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি এখানে নির্বিকার থাকার অধিকার রাখেন, কেননা যে ঘটনা বা অনুভূতির তন্তু দিয়ে তিনি কবিতার বিবরণী তৈরি করছেন সেটি তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার অংশ না হলেও এ ধরনের কবিতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কবির আত্ম-অভিজ্ঞতার ভেতরে রসায়িত হয় অনেকের উপলব্ধির সারাৎসার, নিজেকে কেন্দ্রে রেখে তিনি একনিষ্ঠভাবে বর্ণনা করে যেতে পারেন অন্যের জীবনাকাঙ্ক্ষাকে। পঞ্চাশের শক্তিশালী কবি শামসুর রাহমান-এর হাতে উন্মোচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথসুলভ এক বিপুল কবিতাবিশ্ব। কবিতার নানামাত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যস্ততায় শামসুর রাহমানের কলমে তৈরি হয় আত্মজৈবনিক ও আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতার নতুন ভূমি। আলোচ্য প্রবন্ধে শামসুর রাহমানের কবিতায় আত্মজৈবনিকতা ও আত্মস্বীকারোক্তির স্বরূপ অনুসন্ধানের প্রয়াস থাকবে।]

আত্মবিবরণমূলক, আত্মবিবৃতিমূলক এবং আত্মস্বীকারোক্তিমূলক— এই তিনটি কাঠামোয় বিন্যস্ত কবির আত্মপরিক্রমার মানচিত্র। ত্রিকৌণিক এ মানচিত্রের কেন্দ্রে প্রাণভ্রমরা স্বরূপ অবস্থান করে কবির আত্মসত্তা। খুব সূক্ষ্ম কিছু তারতম্যের ভিত্তিতে এই ত্রিমুখী ধারার বিকাশ। আত্মবিবরণমূলক কবিতার অন্তর্বয়ন-কৌশল গীতিকবিতারসঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। গীতিকবিতার বিকাশ ঘটেছিল আত্ম-অভিজ্ঞান অবলম্বনে, যেখানে কবির কণ্ঠে ধারণকৃত আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আশা-নৈরাশ্যের প্রকল্প তৈরি হয় পারিপার্শ্বিক থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার স্তরায়নে। অনুভূতির স্বত্বাধিকার কবির একচেটিয়া হলেও যে প্রেক্ষাপটে এইসব অনুভূতির বিকাশ সেই প্রেক্ষাপটটি কবির একান্ত জগৎ নাও হতে পারে; একইভাবে আত্মবিবরণমূলক কবিতায় কবি ঘটনার ধারা বিবরণকারী— সত্যাসত্য নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি এখানে নির্বিকার থাকার অধিকার রাখেন, কেননা যে ঘটনা বা অনুভূতির তন্তু দিয়ে তিনি কবিতার বিবরণী তৈরি করছেন সেটি তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার অংশ না হলেও এ ধরনের কবিতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কবির আত্ম-অভিজ্ঞতার ভেতরে রসায়িত হয় অনেকের উপলব্ধির সারাৎসার, নিজেকে কেন্দ্রে রেখে তিনি একনিষ্ঠভাবে বর্ণনা করে যেতে পারেন অন্যের জীবনাকাঙ্ক্ষাকে অবিচল। অন্যদিকে আত্মবিবৃতিমূলক কবিতার ভেতরে জমাটবদ্ধ আবেগ-অনুভূতি-অভিজ্ঞান সবকিছুর জন্য কবির একার দায়, সর্বজনীন চেতনা প্রকাশের সুযোগ এ ধরনের কবিতায় নেই, 'বিবৃতি' শব্দটি নির্দেশ করে সত্যনিষ্ঠতাকে, যার ফলে আত্মবিবৃতিমূলক কবিতা হয়ে ওঠে কবির জীবনকেন্দ্রিক, আত্মজৈবনিক। আবার কবিতা যখন আত্মস্বীকারোক্তিমূলক, তখন তা অতিক্রম

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

করে আত্মজৈবনিকতার সীমা; কবির অবদমনে, অবচেতনে যে অনুভূতির জন্ম, যাকে গোপনতম ভাবাবেগ বলে নির্দেশ করলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই ধরনের অনুভূতি এবং যাপিত জীবনের নানারকম বিকার ও বিবিক্তি যা কবির একান্ত ব্যক্তিগত, সেসব বিষয় কবিতায় স্বীকার করার মাধ্যমে জন্ম হয় আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতা : 'স্বীকারৌক্তিক কবিগোত্র, জীবনে-কবিতায়, উন্মাদ ও আত্মহননপ্রবণ; এবং অনেকে সফল আত্মঘাতী। তাঁদের সাধারণ ধর্ম মনোবৈকল্য, যার উৎসারণ তাঁদের কবিতা। কবিতাকে ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা ও কাহিনীতে না সাজিয়ে তাঁরা জীবনপঞ্জিকেই ক'রে তুলছিলেন কবিতা' (আজাদ, ১৯৮৩ : ২৩)। এ কবিতার ইংরেজি প্রতিশব্দ এবং ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, 'কনফেশন' নামক এক ধর্মীয় পরিভাষাকে উপজীব্য করে পঞ্চাশের দশকের বিশ্বকবিতায় এর বিকাশ। 'কনফেশন' শব্দের উৎস খ্রিস্ট ধর্ম তথা উপাসনালয়, যেখানে ঈশ্বরের সেবক কোনো একজন যাজকের উপস্থিতিতে মানুষ তাঁর জাগতিক পাপের স্বীকারোক্তি প্রদান করে, বিশেষ করে মৃত্যুর পূর্বে কনফেশনের প্রবণতা খ্রিস্টধর্মানুসারীদের মধ্যে প্রবল। স্খলিত মানবসত্তা নির্মলরূপে পরমসত্তার সঙ্গে একীভূত হবার আকাঙ্ক্ষা থেকে যাবতীয় কৃতকর্ম ও পাপের স্বীকারোক্তি প্রদান করে, পঞ্চাশের দশকে একদল আমেরিকান কবি এই ধর্মীয় পরিভাষাটিকে রূপান্তর করে প্রয়োগ করলেন একটি বিশেষ কবিতাধারাকে চিহ্নিতকরণে। এই ধারার কবিরা নিজের একান্ত পতন, স্খলন, মানসিক বিকার এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের নানা প্রান্ত উন্মুক্ত করে দিলেন কবিতার চরণগুচ্ছে। পঞ্চাশে বিশ্বকবিতায় সৃষ্ট এ ধারাটির শক্তিশালী এবং ধারাবাহিক কোনো অনুরণন বাংলা কবিতাধারায় পাওয়া যায় না, তবে বিচ্ছিন্নভাবে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের অনেক কবির কবিতায় রয়েছে আত্মস্বীকারোক্তি প্রবণতার অস্তিত্ব।

সাধারণত 'আমি' সর্বনামের ভেতরে কেন্দ্রীভূত হয় আত্মজৈবনিকতা ও আত্মস্বীকারোক্তি। বাংলা কবিতায় কাজী নজরুল ইসলামই প্রথম 'আমি'র ব্যাপক ব্যবহার করেন 'বিদ্রোহী' কবিতায়, তাঁর পুনরাবৃত্ত 'আমি' আত্মবিবরণের অংশ–আত্মজৈবনিকতা বা আত্মস্বীকারোক্তির নয়। নজরুলের 'আমি'র ভেতরে কেন্দ্রীভূত আর্থ-সমাজ, পুরাণ ও রাজনীতি; এই 'আমি' তাঁর কবিসত্তারও প্রতিনিধি। তিরিশের কবিদের দুটি বিশেষ প্রবণতা– একটি সৃষ্ট হয়েছিল বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বকবিতার সমন্বয়ে, অন্যটি নজরুল এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিঘাতে। এ পর্বের আধুনিক কবিতার চারিত্র্য ছিল নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ, ব্যক্তিসত্তায় সঞ্চিত যুগের ক্লান্তি, যুগের হতাশ্বাস কবিতায় জমে উঠেছিল চিরন্তন মানবাত্মার আর্তনাদ হয়ে। সমাজবাদী কবিতা সমষ্টির প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে বলেছিল 'আমরা' অথবা 'আমাদের' কথা, কখনো 'আমি' সেখানে উপস্থিত হলেও এই 'আমি'র ভেতরে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সমাজকাঠামোর অসম বিন্যাস ও শ্রেণিচেতনার যূপকাষ্ঠে পতিত অগণিত মানুষের অভিজ্ঞান, সমর সেনকে সুতীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ করতে দেখি নিজের মধ্যবিত্ত সত্তাকে, যে সত্তা কোনো একক অস্তিত্ব নয় বরং শ্রেণিচরিত্রের অংশ। দেশবিভাগোত্তর বাংলাদেশের কবিতা পূর্বজ ধারানুযায়ী গীতিকবিতা ও সমাজ-সচেতন কবিতার দ্বৈরথে নতুন ভূখণ্ডে যাত্রা শুরু করে; অন্যদিকে চল্লিশের দশকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির প্রয়োজনে ফররুখ আহমদের হাতে ইসলামি ঐতিহ্য-চেতন যে কবিতাধারা সৃষ্টি হয় তারই চর্চা অব্যাহত রাখেন একদল কবি, ফলে বাংলা কবিতার ভেতরে জন্মায় ত্রিধাবিভক্তি। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন পরবর্তীকালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবল পরাক্রমের মুখে তৃতীয় কাব্যধারাটি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার

যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলে ক্রমশ। বাংলাদেশের কবিতার প্রধানতম দুটি প্রবণতার মধ্যে সমাজবাদী কবিতায় 'আমি'র আধিপত্য সৃষ্টি অসম্ভব ছিল, কেননা এ ধরনের কবিতার জন্ম হয়েছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদে স্নাত হয়ে, যেখানে শ্রেণি-সচেতনতাই শিল্পসৃষ্টির মৌল প্রেরণা। গীতিধর্মী কবিতার যে ধারাটি অবশিষ্ট রইল, সেখানে আত্মজৈবনিক এবং আত্মস্বীকারোক্তি-মূলক কবিতাসৃষ্টির সম্ভাবনা-ক্ষেত্র ছিল, সেই সম্ভাবনা কোনো কোনো কবির হাতে বাস্তবরূপ লাভ করেছে। দেশবিভাগোত্তরকালে পঞ্চাশের প্রতিনিধিত্বশীল বাংলা কবিতায় যারা নেতৃত্ব প্রদান করেন, হাসান হাফিজুর রহমান তার মধ্যে অন্যতম। তিনি স্বদেশ ও সমকাল তাড়িত এবং শ্রেণিবৈষম্য-পীড়িত কবি, ফলে তাঁর কবিতায় আত্মমগ্নতার তুলনায় স্বদেশ ও সমকাল প্রাধান্য পেয়েছে। পঞ্চাশের আরও একজন শক্তিশালী কবি শামসুর রাহমান, যার হাতে উন্মোচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথসুলভ এক বিপুল কবিতাবিশ্ব। কবিতার নানামাত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যস্ততায় শামসুর রাহমানের কলমে তৈরি হয় আত্মজৈবনিক ও আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতার নতুন ভূমি। পঞ্চাশের শেষ লগ্নে বাংলা কবিতায় খোদিত হয় আরেকটি নাম– শহীদ কাদরী, তাঁর কবিতায় আধুনিক নাগরিক যন্ত্রণাবোধ ছিল, নৈরাশ্যকাতরতা অনেক সময় আত্মজৈবনিকতা ও আত্মস্বীকারোক্তিতাড়িত হয়ে কবিতারূপ পেয়েছিল; এছাড়া আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, আবুল হাসানের কবিতায় এই প্রবণতা ক্রিয়াশীল ছিল। দেশবিভাগোত্তর অস্থিতিশীল দেশ-কালের ভেতরে আত্মরতি বা আত্মসত্তার গহিনে ডুব দিয়ে কবিতার পথ নির্মাণ ছিল দুরূহ কাজ, তারচেয়ে সহজ ছিল ঘটমান বর্তমান থেকে কবিতার উপাদান সংগ্রহ। বাংলাদেশের কবিরা সচেতনভাবে, আবার অনেকে ঘটনাচক্রে জড়িয়ে গিয়েছিলেন রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে, ফলে তাদের কবিতায় সবচেয়ে বেশি শোনা যায় সমকালের নিনাদ। তুলনামূলকভাবে পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি ছিল স্থিতিশীল, ফলে সেখানে কবির ব্যক্তিসত্তার নানামাত্রিক উন্মোচন সম্ভব হয়েছিল, আত্মজৈবনিক ও আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতার জন্য তাঁরা পেয়েছিলেন সুবর্ণ অবকাশ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'আমার প্রতিটি কবিতাই আমার জীবনযাত্রার প্রতিফলন, সেই জন্যেই আমি একাধিক জায়গায় বলেছি, আমার কবিতাগুলি স্বীকারোক্তিমূলক। শামসের আনোয়ার, ভাস্কর চক্রবর্তী, বেলাল চৌধুরী প্রমুখ কবির কবিতা অনেক সময় পেয়েছে আত্মজৈবনিক ও আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতার চারিত্র্য : 'আত্মজৈবনিকতার সূত্রপাত ঘটেছিল পশ্চিম বাংলায় পঞ্চাশের দশকে এটা যেমন সত্য, তেমনি বাংলাদেশের পঞ্চাশের কবিদের সহযোগিতায় ষাটের কবিরাই তাকে নানাভাবে করে তুলেছেন অনেক বেশি প্রাগ্রসর' (মাসুদুজ্জামান, ১৯৯৩ : ২৬৭)।

বাংলাদেশের কবিতাধারায় শামসুর রাহমান বহুপ্রসূ কবি, সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে তিনি স্পর্শ করতে সক্ষম হন কবি রবীন্দ্রনাথের পরিসংখ্যানকে। ষাটের অধিক কাব্যগ্রন্থের বিষয়বিন্যাসে তিনি বহুমাত্রিক, জীবনের নানা প্রান্ত থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে তাঁর কবিতায়। কবির সৃষ্টিশীল সত্তা, কবির যাপিত জীবন, কবিতার নির্মাণপ্রক্রিয়া– কবি ও কবিতাসংক্রান্ত ইত্যাকার বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নিয়ে মুখর তাঁর কবিতার প্রেক্ষাপট, এ বিষয়ে তিনি বিরলপ্রজ, বাংলাদেশের অন্য কোনো কবির কলমে আত্মপ্রতিকৃতি অঙ্কনের স্পৃহা এত প্রবলভাবে ধরা পড়েনি : 'আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মকথনে তিনি বাংলা ভাষায় সম্ভবত অদ্বিতীয়; –আপন প্রসঙ্গ, অনুষঙ্গ, ব্যক্তিগত জীবন ও প্রতিবেশ, আত্মীয়-বান্ধব এবং নিজের সাথে সম্পর্কিত প্রায়-সমস্ত কিছু ঢুকেছে তাঁর কবিতায়' (আজাদ, ১৯৮৩ : ২২)।

শামসুর রাহমানের যাপিত জীবন এবং কবিজীবনের মধ্যে ব্যবধান ছিল সূক্ষ্ম, যাপিত জীবনকে তিনি গচ্ছিত রেখেছেন তাঁর কাব্যের অন্তরালে, তবে এই গচ্ছিত রাখার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে নানা রকমে– কখনো পারিপার্শ্বিকতা থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে নিজেকে প্রতিস্থাপন করে লিখেছেন বিবরণধর্মী কবিতা, কখনো তাঁর নিজস্ব জীবনাভিজ্ঞতা ও আত্মপ্রতিকৃতির ভেতরে পুঞ্জীভূত হয়েছে পারিপার্শ্বিক, আবার কখনো নিজের জীবনের নানা সংকট, ব্যর্থতা ও মানসিক বিকার পরিণত হয়েছে আত্মস্বীকারোক্তিতে। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি সমালোচক-প্রকাশক-শুভানুধ্যায়ীদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে প্রণয়ন করেন আত্মজীবনী-মূলক গদ্যগ্রন্থ *কালের ধুলোয় লেখা*, আত্মজীবনীটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ২০০৪ সালে, কবির জীবনাবসানের মাত্র দুবছর পূর্বে। *কালের ধুলোয় লেখা*তে যে শামসুর রাহমানকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়, সেটি তাঁর কেনো অভিনতুন প্রতিকৃতি নয়, এই আত্মপ্রতিকৃতি এবং আত্মপরিক্রমার সঙ্গে পাঠকের পূর্বপরিচয় ঘটে গিয়েছিল কবিতার সুবাদে। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন পুরোনো ঢাকায়, এ প্রসঙ্গে আত্মজীবনীতে তাঁর বিবৃতি : '... ১৯২৯ সালে আমি সর্বপ্রথম পৃথিবীর আলো দেখেছিলাম পুরোনো ঢাকার মাহুৎটুলির এক সরু গলির ভেতর, আমার নানার কোঠাবাড়িতে। কোঠাবাড়ি বলে দিচ্ছে, রূপোর চামচ মুখে নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করিনি' (রাহমান, ২০০৪ : ৯)। উদ্ভট *উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ* কাব্যগ্রন্থের 'সে এক মাটির ঘর' কবিতায় তিনি মাহুৎটুলির সেই সরু গলি এবং কোঠাবাড়িটিকে নির্দেশ করে বলেন : 'আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম এই শহরের অখ্যাত গলির/ এক মাটির ঘরে'। গদ্যে তিনি নিজের যাপিত জীবনের সত্যনিষ্ঠ ভাষ্য একনিষ্ঠতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন, একইভাবে কবিতাতেও তিনি বিরামহীনভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের নানা চালচিত্র। আত্মজীবনীতে উল্লিখিত 'রূপোর চামচ মুখে নিয়ে' জন্মাননি এই প্রবাদপ্রতিম বাক্যটি নির্দেশ করে কবির পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থাকে, 'আত্মচরিত' কবিতায় বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করেন এভাবে :

> উনিশ শো ঊনত্রিশ সালে অক্টোবরে
> জন্মেছি ঢাকায় আমি ছায়াচ্ছন্ন গলির ভেতরে
> ভোরবেলা নিম্নমধ্যবিত্ত মাতামহের নিবাসে।
> (*এক ফোঁটা কেমন অনল*)

নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবৃতি প্রদানে তিনি অকুণ্ঠ, এ কারণে নির্দ্বিধায় তিনি স্বীকার করেন মাটির কোঠাবাড়ি এবং নিম্নমধ্যবিত্ত অবস্থানের বাস্তবতা। 'রূপোর চামচ মুখে নিয়ে' না জন্মানোর রূঢ়-সত্য তাঁর পরবর্তী জীবনের নকশা বদলে রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তিনি শৈশবেই আলোড়িত হয়েছিলেন চিত্রশিল্পের রঙিন কলা-কাঠামো দেখে, বিশেষ করে ইমাম হোসেনের 'দুলদুল' ঘোড়া, যে ঘোড়াটি কারবালা প্রান্তরে তীরবিদ্ধ হয়েছিল। রক্তাক্ত 'দুলদুল' পরিণত বয়সেও তাঁর কবিমানসকে আবেগের ঝড়ে কম্পিত করেছে, অনেক কবিতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে বিক্ষত দুলদুলের চিত্রকল্প, 'দুলদুল' কবির আত্মজৈবনিকতার এক বিশেষ অংশ। পুরোনো ঢাকার তৎকালীন বাবু বাজারের সস্তা ছবির দোকান ও নিম্ন আয়ের ছন্নছাড়া শিল্পীদের দেখে তিনি চিত্রশিল্পী হওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হন। শেষাবধি কবির চিত্রশিল্পী হওয়ার সংকল্প বাস্তবায়িত হয়নি, তাঁর প্রথম পেশাজীবনের শুরু বেকার জীবনের হতাশার নিষ্পেষণ থেকে, জীবনবাস্তবতার প্রয়োজনে সাংবাদিক আর আন্তর-খোরাকের প্রয়োজন থেকে তিনি হলেন কবি। যদিও কবির পিতা ছিলেন কবিতাচর্চার বিপক্ষে, তার একান্ত ইচ্ছা ছিল পুত্রকে কোনো

জাদরেল পেশাজীবীর ভূমিকায় দেখার, কিন্তু শামসুর রাহমানের শিল্পগ্রাহী মন জাগতিক জীবনের সুখ-সম্ভাবনার দ্বার রুদ্ধ করে বেছে নিয়েছিল শিল্পসৃষ্টির দুর্গম ও যন্ত্রণাকাতর পথ :

এবং আমার কথা ছিল
ছবি আঁকবার,
যদিও আমার জনকের বিবেচনা
ছিল বিপরীত কিছু, ভাবতেন তিনি স্বপ্নঘোরে –
আমি হবো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

('এতদিনে জেনে গেছি', *নায়কের ছায়া*)

সহজাত শিল্পবোধ থেকে তিনি উপলব্ধি করেন এক নিগূঢ় সত্য– শিল্পের কোনো জাত-পাত নেই, সব শিল্পই প্রাণকে সঞ্জীবিত করে বিপুল প্রাণরসে, শিল্পের অমরাবতীতে প্রবেশের জন্য একেকজনের সামনে খুলে যায় একেকটি দরোজা, তাই শৈশবের সংকল্পকে তিনি বাস্তবরূপ দেন কবিজীবনের ঐকান্তিকতায় : 'আমি ছবি লিখি অক্ষরে অক্ষরে' ('এতদিনে জেনে গেছি', *নায়কের ছায়া*)। শামসুর রাহমানের কবিতাচর্চার প্রতি তাঁর পিতার বিরুদ্ধাচারণ এবং বিপ্রতীপ অবস্থানের সংবাদ পাওয়া যায় আরও কিছু উৎস থেকে : 'শামসুর রাহমানের বাবা শামসুর রাহমানের কবিতা লেখা খুব অপছন্দ করতেন। তিনি চাইতেন শামসুর রাহমান সিএসপি দিক বা ব্যারিস্টারি পড়ে আসুক বা বিজনেসে বসুক। শামসুর রাহমান কোনোটাতেই রাজী হননি' (জ্যোতিপ্রকাশ, ২০১৬ : ১০৫)। কর্মজীবন যেন তাঁর কবিসত্তাকে গ্রাস করতে না পারে সেজন্য তিনি বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পেশাজীবন তৈরি করেন, শিল্পবান্ধব পেশা বিবেচনায় তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে স্বদেশ, সমকাল ও ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের মুখোমুখি কবি উপলব্ধি করেন শিল্পের সুষমা দিয়ে সমাজ-পরিবর্তন অথবা দুঃসময়কে শাসন অসম্ভব, এক বিফল কবির আর্তনাদসত্তায় ধারণ করে তিনি পিতার সেই অমোঘ বাণী স্মরণ করে বলেন :

তোমার কথাই ঠিক আব্বা, তোমার কথাই ঠিক–
আমার সকল বেলা বিফলে গিয়েছে নিশিদিন।
দাঁড়িয়ে রয়েছি একা নিরুপায়, অশ্বেতর আর
গাধার ব্যাপক খুরে হচ্ছে পিষ্ট, হায়, ধ্রুবপদ।

('তোমার কথাই ঠিক', *আমি অনাহারী*)

শামসুর রাহমানের জন্ম ও বেড়ে ওঠা রক্ষণশীল পারিবারিক গণ্ডিতে, শিল্পের সুবাতাস তাঁর পারিবারিক আবহে কোনোদিন অবাধে প্রবেশ করতে পারেনি, 'সে এক মাটির ঘর' কবিতায় জন্মবৃত্তান্তের সময় সে-কথা জানিয়ে দেন তিনি অকপটে। পারিবারিক রক্ষণশীলতার বাইরে উন্মুক্ত ছিল পুরোনো ঢাকার জনজীবনের বিশালতা; মেরাসীনদেন গান, ভিস্তিওয়ালা, বাতিওয়ালা, জীর্ণ ঘোড়া-সহিস-আস্তাবল, হার্নি সাহেবের বাড়ি, মর্নিং স্কুল, চিন্তাহরণ মাস্টার – শামসুর রাহমানের মানসগঠনে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছিল। পরবর্তীকালের ঢাকা কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা, মধুর ক্যান্টিন এবং নিজের গ্রাম পাড়াতলীর পিছুটান– এসবই কবিতায় চিত্রিত হয়েছে আত্মজৈবনিকতার অংশ হিসেবে।

শামসুর রাহমানের আত্মজৈবনিক কবিতার তালিকা দীর্ঘ– পুরোনো ঢাকা এবং বুড়িগঙ্গা নদীর স্মৃতিকাতরতা নিয়ে লেখেন 'শহুরে সংলাপ' (*ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ*), কালের আঘাতে পরিবর্তিত চিরচেনা ঢাকার চারিত্র্য বদলেছে কবির চোখের সামনে। 'রোমান্টিক বেদনা আর বিপন্ন অস্তিত্বের পাশাপাশি শামসুর রাহমান আত্মপ্রতিকৃতি অঙ্কনে কখনো চলে গেছেন নস্টালজিয়া-আক্রান্ত পুরানো ঢাকার স্মৃতিময় শৈশবে' (ঘোষ, ২০১০ : ১২৩)। পুরোনো ঢাকার নানা অনুষঙ্গ তাঁর কবিতার বিষয় হিসেবে বিন্যস্ত হয়েছে, আত্মজৈবনিক কবিতার রসদ জুগিয়েছে :

সন্ধ্যার গলির মোড়ে কাঁধে মই বওয়া বাতিওয়ালা,
হার্নি সাহেবের হল্‌দে পুরোনো দালান,
খড়বিচালির গন্ধভরা মশা-গুঞ্জরিত
বিমর্ষ ঘোড়ার আস্তাবল, মেরাসীনদের গান
ধরে আছে সময়ের সুদূর তরঙ্গমেশা আমার শৈশব।
('দশ টাকার নোট এবং শৈশব', *যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে*)

'তোমাকে ঘিরে আমার কোনো কোনো সাধ' (*তুমি নিঃশ্বাস তুমি হৃদস্পন্দন*), 'ওরা চলে যাবার পর' (*আমার ক'জন সঙ্গী*) কবিতার প্রেক্ষাপটে রয়েছে কবির নিজ গ্রাম পাড়াতলী; কবির শেষ বয়সের দয়িতা, প্রেরণাদাত্রী 'গৌরী' এবং প্রিয় মোমেনা খালাসহ পারিবারিক জীবনের অনেক ব্যক্তি ও ঘটনা হুবহু সংগ্রহ করেছেন নিজের জীবন থেকে উল্লিখিত কবিতাদ্বয়ে। শামসুর রাহমান ছিলেন ঢাকা কলেজের ছাত্র, নস্টালজিয়া আক্রান্ত কবির 'ঢাকা কলেজকে নিবেদিত পঙ্‌ক্তিমালা' (*ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ*)। কবিতাটিতে তরুণ ছাত্রদের মানসগঠনে ঢাকা কলেজের ভূমিকাকে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অসুস্থ কবির হাসপাতালে ভর্তি এবং অস্ত্রোপচার-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া নিয়ে রচনা করেন 'অস্ত্রোপচারের পরে' (*খুব বেশি ভাল থাকতে নেই*)। আধো-ঘুম, আধো-জাগরণের ভেতর যেসব চিত্রকল্প খেলা করে কবির চৈতন্যে তারই আবহ ফুটে উঠেছে কবিতাটিতে : 'স্যালাইন নল দ্রাক্ষালতা,/ মদির জীয়ন রস চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে শিরায়; কে আছে/ দাঁড়িয়ে শিয়রে নাগা সন্ন্যাসীর মতো?' জীবনের বিচিত্র ধরনের অভিজ্ঞতাকে কাব্যরূপ দেবার অভিপ্রায় থেকে তিনি চলার পথের দৃশ্যাবলি, দিনযাপনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলোকেও সযত্নে লালন করেন এবং সময় বিশেষে সেই অভিজ্ঞান প্রয়োগ করেন কবিতায়। 'একটি প্রশ্ন' (*মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই*) কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন ফ্লোরিডার কিসিমি শহরে বসে, এ কবিতায় মেজো কন্যা ফাওজিয়াসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এসেছে নাম-পরিচয়সহ, মূলত কবি এখানে মৃত্যুচিন্তার রূপকার। এ কাব্যের 'একটু পরেই যাত্রা' কবিতাটিও কিসিমি শহরের প্রেক্ষাপটে রচিত।

বেদনা থেকে আদি কবিতার জন্ম, শামসুর রাহমানের সৃজনশীলতার সূচনাও ছোটো বোন নেহারের মৃত্যুজনিত বেদনার আঘাতে। 'কোমল গান্ধার' কবিতায় বলেন : 'স্ফটিক সকালবেলা সে কী জন্ম কান্না দশদিক/ জাগানো আমার–' (*মঞ্চের মাঝখানে*)। এই কান্নার সূত্রে জানা যায় একজন শিল্পীর জন্মকথা, 'কোমল গান্ধার' কবিতাটি শিল্পী হিসেবে শামসুর রাহমানের জন্ম এবং ছোটো বোন নেহারের মৃত্যুর দ্বৈরথে বাঁধা। এভাবে ব্যক্তিগত বেদনা-মন্থনে, প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথার কাতরতা নিয়ে যে কবির যাত্রারম্ভ, তাঁর কবিতাভূমিকে আমৃত্যু উর্বরতা দিয়েছে

আত্মজৈবনিক চেতনা, কবিতার শরীরজুড়ে তিনি ছড়িয়ে দেন আত্মজৈবনিকতার ঘ্রাণ। পরিবারের কোনো সদস্য বা তাঁর নতুন কোনো কবিতার জন্মের আনন্দ, কারও মৃত্যুর বিষাদ অথবা কবিতা লিখতে না-পারাজনিত ব্যর্থতা, স্বদেশ-সমকালের নানা ঘটনা, বিদেশ যাত্রা– নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর কবিতা পেয়েছে গতি। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পৌত্র-পৌত্রী সবাইকে ঘিরে যে পারিবারিক জীবনবলয়, সেই বলয় ঘুরেও কবিতা সংগ্রহ করেছে তার বিষয়, যদিও আবেগমথিত এসব ব্যক্তিগত উচ্চারণ অনেক সময় ছাড়িয়েছে শিল্পের সীমা।

এক অর্থে সব কবিতাই আত্মজৈবনিক, পারিপার্শ্বের যাবতীয় অভিজ্ঞতা কবির চেতনায় সঞ্চিত হয়, তাঁর অনুভূতির রসায়নে আহরিত অভিজ্ঞতা রূপান্তরিত হয় কবিতায়। এ কারণে কবিতায় রেখায়িত অনুভূতিমালার কোনোটি কবির নিজস্ব, আর কোনোটি অন্যের জীবন থেকে সংগৃহীত সে-বিষয়ে দ্বিধা থেকে যায়, এই দ্বিধা ও রহস্যঘনতার ভেতরে বেঁচে থাকে কাব্যের প্রাণ, না হলে কবিতা পর্যবসিত হতো সাধারণ দিনযাপনের আলাপে। শামসুর রাহমানের আত্মজৈবনিক কবিতার আর একটি বড়ো উপকরণ মৃত্যু; রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন প্রিয় মানুষগুলোর মৃত্যু, নিজের মৃত্যুর বাস্তবতাকে তিনি রোমান্টিক চেতনায় মুড়ে বলেছিলেন 'মরণ রে তুহু মম শ্যামসমান', শামসুর রাহমানের কবিসত্তাও তেমনি অনেক প্রিয়জন-বিয়োগের বেদনায় স্নাত, তবে মৃত্যুকে তিনি ভীতিকর এবংরুদ্ধদ্বার চেতনার অন্ধকার হিসেবেই দেখেছেন, মৃত্যু নিয়ে নেই তাঁর কোনো রোমান্সঘন উপলব্ধি। ছোটো বোন নেহারের মৃত্যুর পর আরেকটি মৃত্যু শামসুর রাহমানকে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত করে– তাঁর প্রিয় পুত্র মতিনের মৃত্যু। মতিনকে নিয়ে তিনি একাধিক কবিতার জন্ম দিয়েছেন, যেখানে শিল্পিতা পেয়েছে এক শূন্য পিতৃহৃদয় :

এ আমার ছোটছেলে, যে নেই এখন,
পাথরের টুকরোর মতন
ডুবে গেছে আমাদের গ্রামের পুকুরে
বছর তিনেক আগে কাকাডাকা গ্রীষ্মের দুপুরে।

('একটি ফটোগ্রাফ', *এক ফোঁটা কেমন অনল*)

অনুতাপের উত্তাপে উষ্ণ এই উচ্চারণ, মানসিক ভারসাম্যহীন মতিনকে গ্রামে নিরাময়ের প্রত্যাশায় পাঠিয়ে দেওয়ার ভুল সিদ্ধান্ত কবিকে রক্তাক্ত করেছে। পাড়াতলী গ্রাম ও পুকুরসংক্রান্ত স্মৃতিকাতরতার সঙ্গে প্রাপ্তির আনন্দ ও হারানোর বেদনা যুগপৎ জড়িত, লেন-দেনের এক অদ্ভুত বৈপরীত্য নিয়ে কবির স্মৃতিতে উদ্ভাসিত পাড়াতলীর পুকুর :

মনে পড়ে
একাত্তরের এপ্রিলে দুপুরে
কবিতা লিখেছিলাম নাক্ষত্রিক আলোড়নে আর
এই পুকুরের পিপাসার্ত জল আমার অসুস্থ
আত্মজকে অনুরূপ দ্বিপ্রহরে করেছিল গ্রাস।

('বহুদিন পর পাড়াতলীতে আবার', *টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো*)

শামসুর রাহমানের কবিতার আরেকটি প্রভাববিস্তারী চরিত্র কবির মা। মাকে নিয়ে শামসুর রাহমান অনেক কবিতা লিখেছেন, কখনো সে মা দেশের প্রতিকল্প, কখনো মমত্বের চিরন্তন প্রতিরূপ, কখনো আবার কবির ব্যক্তিজীবনকে ঘিরে থাকা জন্মদাত্রীর প্রতিচ্ছবি। শহীদ কাদরী 'অগ্রজের উত্তর' কবিতায় প্রতিবিম্বিত হয়েছিলেন বড়ো ভাই শাহেদ চৌধুরীর বিবৃতিতে : 'জানি না কোথায় যায়, কি করে, কেমন করে দিনরাত কাটে/ চাকুরিতে মন নেই, সর্বদাই রক্তনেত্র, শোকের পতাকা/ মনে হয় ইচ্ছে করে উড়িয়েছে একরাশ চুলের বদলে!' (*উত্তরাধিকার*)। 'মা তাঁর ছেলের প্রতি' কবিতায় শামসুর রাহমান নিজের প্রতিকৃতি আঁকেন মায়ের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে : 'সন্ধ্যার/ সোনালি-কালো প্রহরে ভাবছি, বাচ্চু,/ কতদিন তোর সঙ্গে আমার দেখা নেই' (*অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই*)। মা তাঁর ডাক নাম 'বাচ্চু' বলে সম্বোধন করেছেন, মায়ের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে কবিতাটি নির্মিত, যে দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করেছেন শামসুর রাহমান নিজে, তাঁর স্বকীয় বিশ্বাসের প্রতিনিধি মায়ের বয়ানে শৈশব-কৈশোরের যাপিত জীবনের নানা প্রান্ত উদ্ভাসিত হয় আত্মজৈবনিক এষণায়। শামসুর রাহমানের কবিসত্তা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল মায়ের মৃত্যুর বেদনায়। *কালের ধুলোয় লেখা*তে কবি বলেছেন : 'মা মারা যান ১৯৯৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি। সেই বছরের ৭ মার্চ আমি লিখে উঠতে পারি 'মার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে' কবিতাটি – 'কী ক'রে যে তোমাকে শুইয়ে দিতে পেরেছি এখানে/ শীতল মাটির নিচে?' (রাহমান, ২০০৪ : ২৬৩)। মায়ের স্মৃতি এবং মৃত্যু নিয়ে আবেগমথিত অনেক কবিতা তিনি লিখেছিলেন, 'আমার ডান হাত' (*স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি*), 'তোমার কাছ থেকে' (*নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে*) কবিতাগুলো মাতৃস্মৃতি-মথিত। শামসুর রাহমানের জীবনসঙ্গিনী ছিলেন জোহরা বেগম, জীবনের নানা সংকটে একই ছাদের তলায় প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সমীকরণ মিলিয়েছেন তারা যুগের পর যুগ। জোহরা প্রসঙ্গে কবিতা :

> একজন জোহরা আমার মশারি টাঙ্গিয়ে
> ভাত নিয়ে মধ্যরাত অব্দি জেগে থাকে, প্রতীক্ষার আলপিন
> ক্রমাগত ফুটতে থাকে ওর সত্তায়।
> ('আমার কবিতা আজ', *শিরোনাম মনে পড়ে না*)

শামসুর রাহমান আড্ডাপ্রিয় কবি ছিলেন, আড্ডা শেষে গভীর রাতে বাসায় ফেরার পরের অভিজ্ঞতা এবং জোহরা বেগমের মনস্তত্ত্ব কবিতাটিতে ধরা পড়েছে। যাপিত জীবনে জোহরা কবির সংকটের সহযাত্রী, ইতিহাসের অনেক কালো পর্ব তিনি অতিক্রম করেছেন জোহরা বেগমের সঙ্গে। একাত্তরের পঁচিশে মার্চের কালরাত বিবৃত করতে গিয়ে শামসুর রাহমান বলেছেন : 'আমার সীমাহীন অবসাদ, নিষ্ক্রিয়তা আর পাথুরে ঘুম আমার শয্যাসঙ্গিনীর মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল। মাঝে মাঝে ভয়ানক শব্দ শুনে চমকে ওঠা ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকা ছিল না আমাদের। ঘুমন্ত আমরা টের পাইনি, কী ভয়াবহ এক সকাল অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে' ('কালঘুম', *অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই*)। কবির পুরোনো ঢাকা যখন জ্বলছিল হানাদারদের তাণ্ডবে সেই আতঙ্কিত সময়ের রেখাচিত্র শামসুর রাহমানের 'তুমি বলেছিলে' কবিতাটি (*বন্দি শিবির থেকে*)। বাইরের আগুন পোড়াচ্ছিল নয়াবাজারকে, ভেতরে দগ্ধ হচ্ছিল বাঙালির মূল্যবোধ, বাঙালি জাতিসত্তা, নয়াবাজারে আগুন দেবার ঘটনার ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন কবি স্বয়ং, পাশে ছিলেন কবিপত্নী।

মা এবং স্ত্রী ছাড়াও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের স্বনামে সম্বোধন করে কবিতার বিষয় করে তুলেছেন। 'নয়না এবং আমি' (*টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো*) কবিতায় মৃত্যুচেতনা-তাড়িত কবি পার্থিব জীবনের পিছুটান অনুভব করেন, পৌত্রী নয়নাকে কেন্দ্র করে ঘনবদ্ধ হয় তাঁর আবেগ, জীবনাকাঙ্ক্ষা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শামসুর রাহমানের চৈতন্যকে গ্রাস করেছে মৃত্যুভীতি, একসময়ের সেই সাহসী কবি শামসুর রাহমান যিনি প্রথম মৃত্যুর দায় স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে শিল্পের জগতে এসেছিলেন দ্বিতীয় জীবনের উত্তরাধিকার নিয়ে, সেই কবি পার্থিব মৃত্যুর চিন্তায় প্রবলভাবে আক্রান্ত হন। তিনি তাঁর জীবনকাতরতা, পার্থিবতাকে, বয়সোচিত কারণে ক্ষয়ে যাওয়া শরীরের নানা অক্ষমতাকে অকপটে উন্মোচন করেন কবিতায়। ফলে, তাঁর কবিতা আত্মজৈবনিকতার সরল পথ ছেড়ে আত্মস্বীকারোক্তির স্বভাবকে আয়ত্ত করে :

আমাকে এখন থেকে আরেকটু বেশি, আরেকটু
ভালো করে দেখে নাও। কতটা বিবর্ণ হয়ে কত
ক্ষয়ে গেছি, চামড়া কুঁচকে গেছে কত, কত চুল হলো লীন দূরের হাওয়ায়,
কেমন স্খলিত দাঁত, আমার নিভৃত
দৃষ্টিশক্তি কত শোচনীয় ক্ষীণ আজ ভালো করে দেখে নাও।
('আমাকে এখন থেকে', *ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ*)

'আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতা নির্মাণের জন্য প্রয়োজন হয় দুঃসাহস, স্পর্ধা : 'আত্মজৈবনিক কবিদের সততা ও সাহসের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা স্বীকারোক্তিমূলক কবিতায়' (গুপ্ত, ২০১১ : ১৯৯)। কবিজীবনের প্রথমার্ধে তিনি নিষ্কলুষ আত্মজৈবনিকতাকে উপজীব্য করেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মজৈবনিকতা পর্যবসিত হয় আত্মস্বীকারোক্তিতে। খিষ্টধর্মে যেমন যাজকের পৌরহিত্যে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটে; আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতায় পাঠককে পুরোহিত মেনে কবিকে দাঁড়াতে হয় কঠিনতম সত্যের মুখোমুখি, ব্যক্তিগত জীবনের কোনো অন্ধকারময়তার উচ্চারণ হয়ে ওঠে কবিতা, পাঠক কবির অন্তর্জীবনের একান্ত কথনের অনুগামী হতে পারে। কনফেশনাল কবিতা প্রসঙ্গে বলতে গেলে একজন বাঙালি কবির নাম সবার আগে স্মরণের তালিকায় চলে আসে, তিনি কবিতার জন্য নিজের ভাষা, রুচি, সংস্কার, ধর্ম, দেশ সব ত্যাগ করেছিলেন, কবি হিসেবে এটি ছিল তাঁর ভুল, তাঁর শৈল্পিক স্খলন। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় কবিতা লিখে তিনি এই স্খলনের প্রতিবিধান করেছিলেন। সেইসব কবিতায় আছে অনুশোচনা, আছে স্বীকারোক্তি :

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন–
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
('বঙ্গভাষা', *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বাংলা কবিতার আধুনিক পুরুষ যাঁকে বলা হয়, তিনি উপলব্ধি করেন দেশ ও বাংলা ভাষা ত্যাগ করে পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভের লোভ তাঁর গুরুতর অপরাধ ছিল। তাঁর বিখ্যাত সনেটে বিবৃত মোহতাড়িত আসক্ত মনের অনুশোচনাবোধ ও স্বীকারোক্তি পাঠকের সহানুভূতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল, ফলে পরবর্তীকালে বাংলা

সাহিত্যে তিনি একটি পাকা আসন দখল করেন। কবি ও নাট্যকার হিসেবে স্বদেশ, স্বভাষা ও আপন সংস্কৃতির সঙ্গে এই স্বীকারোক্তির ভেতর দিয়ে তাঁর পুনর্মিলন ঘটে। 'বঙ্গভাষা' কবিতায় 'অবোধ', 'ভিক্ষুক', 'পর-ধন-লোভে মত্ত' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছে যে স্বীকারোক্তি দেখা যায় তা কি কনফেশনাল নয়? তাঁর যেসব কবিতায় স্বদেশপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলোর বেশিরভাগ সনেট। অবশ্য *মেঘনাদবধ কাব্যের* স্বদেশপ্রেম প্রতীকী তাৎপর্য পেয়েছে, তবে দেশপ্রেমমূলক সনেটগুলোতে তিনি নিজেকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সরাসরি বিদ্ধ করেছেন। মাইকেলের ব্যক্তিগত জীবনের মানচিত্রের ভেতরে রয়েছে তাঁর উদ্দেশ্যের অন্ধকার, কবিতাকে ব্যবহার করে আত্মপরিচয় বদলে ফেলার বৃথা চেষ্টা। সেই সত্য যখন পাঠককে জানিয়ে দেন অকপটে, তখন একথা বলা যায় যে, তাঁর 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি বাংলা স্বীকারোক্তিপ্রবণ কবিতার আদি নমুনা।

আধুনিকতার পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ মধুসূদন দত্ত-পরবর্তী বাংলা কবিতাধারা গীতল হয়ে উঠেছে বিহারীলাল চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে। সেইসব গীতিকবিতায় আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, ক্ষোভ, মানসিক যন্ত্রণা– সবই স্বীকার করা হয়েছে, মানবসত্তার চিরন্তন আবেগের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে কবির একান্ত অনুভূতির। নিজের একান্ত এই অনুভূতিগুলোর স্বীকারোক্তি অন্যরকম– সারদা দেবীকে যেমন বিহারীলাল বলেছেন : 'তোমা হারা হলে আমি গতিহারা হই'– এখানে কবির অনুভূতি সত্য, কিন্তু সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে স্বীকার করে নেবার দায় নেই, কেননা এসব স্বীকারোক্তি কলুষমুক্ত, এই সত্যকে সবার সামনে উন্মুক্ত করতে দ্বিধা নেই। যেমন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যপ্রেরণার উৎসকে শনাক্ত করেছেন জীবনদেবতা নামে, সে এক গোপনতম বিমূর্ত সত্তা, তিনি জীবনদেবতাকে বলেন : 'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী...' এই উচ্চারণ বয়ে নিয়ে আসে তাঁর উপলব্ধির সত্যতা; তিনি স্বীকার করে নেন, কেউ একজন যেন তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়। এই স্বীকারোক্তির ভেতরে কোনো গ্লানি নেই, নেতিবাচকতার ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই, নেই কোনো দয়িতা-সমাচার। এ এক এমন সাধারণ গোপন সত্য, যা প্রকাশ করলে মনের গ্লানিমুক্ত হওয়া যাবে এমন ব্যাপার নয়, বরং সর্বাঙ্গসুন্দর, পরিমার্জিত অনুভূতির প্রকাশ এটি। পরবর্তীকালে তিরিশি আধুনিকতা কবিতার সুচিন্তিত রাবীন্দ্রিক নান্দনিকতা ছেঁটে দিয়ে, কবিতাকে জীবনের আরও কাছে টেনে আনল। তখন মানুষের ক্ষমাহীন পাপ-পঙ্কিলতা, গোপনতম কামনা-বাসনা সব কবিতার দ্বারস্থ হলো প্রথমবারের মতো। ফ্রয়েডের মনোবিকলন-বিষয়ক তত্ত্ব, বোদলেয়ারের 'ক্লেদজ কুসুম', এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' আরও উস্কে দিল আধুনিক কবিতাকে। দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা, ক্লেদ, গ্লানি, হতাশা সবকিছুকেই স্বীকার করে নিল কবিতা। জয় গোস্বামী 'নিজের জীবন, বীজের জীবনে' বলেছিলেন : 'স্বীকার করব, আমি আত্মজীবনীই লিখতে চেষ্টা করি। এই পৃথিবীতে, পৃথিবীর বাইরেও আমার জীবদ্দশায় যা কিছু ঘটবে, সবই আমার আত্মজীবনী' (চট্টোপাধ্যায়, ২০১১ : ২২৯)। এভাবে তিনি কবির আত্মজৈবনিকতাকে তাঁর ব্যক্তিসত্তার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে শিল্পের সীমাহীন প্রান্তরে বুনে দেন। ফলে ব্যাপারটি এমন দাঁড়াল যে, আধুনিক কবিতা মানেই এক ধরনের স্বীকারোক্তি, আত্মজৈবনিকতা। কবির সত্তায় মিশে যায় বহু মানুষের জীবন-বাসনা, তাঁর চেতনার তারে বাজে অগণিত মানুষের আনন্দ-বেদনার বিচিত্র সুর। কবির আত্মজৈবনিকতাকে শনাক্ত করা সহজ নয়, এজন্য শামসুর রাহমান স্বীকার করেছিলেন, 'সবচেয়ে আশ্চর্য তুমি হে আমার আপন প্রতিমা' ('আশ্চর্য', *মাতাল ঋত্বিক*)। কবি

আত্মময়তায় বিবশ হয়ে ব্যক্তিগত ভাবনার রূপায়ণ ঘটাতে গিয়ে উপলব্ধি করেন, 'আমি' বলে কোনো একক বা বিশুদ্ধ সত্তার প্রতিরূপ সৃষ্টি কবির কলমে সুকঠিন :

যখনি টেবিলে ঝুঁকে আত্মকথনের
মদে বুঁদ হই, দেখি, আমার নিজের মুখ দ্রুত
কেমন বদলে যায়, আমার মুখের ভাঁজে ভাঁজে
বসে যায় সুগভীর অজস্র মুখের রেখাবলী।
('আত্মজীবনী বিষয়ক', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)

এ কারণেই কবির আত্মজীবনীতে কবিকে খুঁজে পাওয়া যায় না, *কালের ধুলোয় লেখা* আত্মজীবনীগ্রন্থ নিয়েও অনেকের এ ধরনের অভিযোগ ছিল। কবির সত্তায় পরজীবিতা গ্রহণ করে পুরাণ, স্বদেশ, সমকাল, বিশ্ব; কাল থেকে কালান্তরে, ভূগোলের সীমাচিহ্ন ছাড়িয়ে কবির মানসলোক, চেতনার বিস্তার। এ কারণে 'আমি' বা 'আমার' শব্দ-বন্ধনীর ভেতরে আবদ্ধ বাণী বেশিরভাগ সময় সর্বজনীন রূপ নিয়ে বিকশিত হয়। আত্মপরিক্রমাপ্রিয় কবির যে প্রতিকৃতি নির্মিত হয় কবিতায়, কবির প্রতিকৃতি হিসেবে তাকে চেনা যায় না, আবার সে প্রতিকৃতি এই পরিচিত প্রতিবেশের বাইরের কোনো ভিনগ্রহ থেকে সংগৃহীত নয় বলে অচেনাও থাকে না, চেতনার এমনই এক দ্বৈরথে প্রতিনিয়ত কবি বাঁধা পড়েন, কবিতাকে বাঁধেন; স্থান, কাল, পাত্রের মিথস্ক্রিয়ায় তৈরি কবির ব্যক্তিসত্তা এমনকি শরীরী কাঠামোও দখলীকৃত ভূমির মতো পরাধীন :

এই যে দেখুন,
আমার দু'চোখে দগ্ধ গ্রাম বেশুমার,
আমার ললাটে
আহত শহরগুলো ব্যান্ডেজসমেত
শুয়ে আছে।
... ...
আমার চিবুকে কতো ভগ্ন সেতু বারুদের গন্ধে
ভরপুর কতো যে পরিখা,
আমার চোয়ালে লগ্ন লক্ষ্মীবাজারের
সুহাসিনী দেবীর রক্তিম শাড়ি, যেন স্বাধীনতার পতাকা।
('আমি তো মেলারই লোক', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)

কবি কি সবসময় 'মেলারই লোক', তাঁর একান্ত-লোক বলে কি কিছু নেই? সমষ্টিসত্তা থেকে কবিকে বিচ্ছিন্ন করে যা কিছু একান্ত এবং নিজস্ব, যা কিছু অবচেতনে-অবদমনে-বিকারের ঘোরে মনের গহিনতম প্রদেশে লুকিয়ে থাকে, তাকেই কবিতার খাতায় তুলে আনার সুযোগ করে দিলেন আত্মস্বীকারোক্তিপ্রবণ কবিরা। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের দায় স্বীকার করে কবির ভেতরেও ব্যক্তিস্বরূপের উপলব্ধি ঘটতে পারে : 'গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণী আমি, তবু/ হঠাৎ ব্যক্তিস্বরূপ জাগে;' (*'মধ্যবিত্তের পাঁচালি', উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*)। তখন আত্মজৈবনিক

অনুভাবনা-তাড়িত কবির সমষ্টিসত্তা ও শ্রেণিচরিত্র থেকে বিযুক্ত করে নিজেকে একাকী নিরীক্ষণের অবকাশ ঘটে :

শামসুর রাহমান বলে আছে একজন, যার
প্রতি ইদানীং
বিমুখ নারীর ওষ্ঠ, শিল্পকলা, বাগানের ফুল।
('পারিপার্শ্বিকের আড়ালে', *শূন্যতায় তুমি শোকসভা*)

ব্যক্তিসত্তার ভেতর থেকে কবিসত্তার অস্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করে ছুঁড়ে দেন কবিতার তীব্র আলোয়, দক্ষ শল্যবিদের মতো নিজেকে স্বনামে সম্বোধন করে চালাতে থাকেন অস্ত্রোপচার প্রক্রিয়া, 'শামসুর রাহমান' তাঁর কবিতার নিরীক্ষালয়ে পড়ে থাকেন অসহায় অনুজীবের মতো। সময়ের সাথে সাথে নিজেকে উন্মোচনের স্পর্ধা শামসুর রাহমানের আরও বেড়েছে, তাঁর আত্মজৈবনিক কবিতাধারার ভেতরে ক্রমশ বিকশিত হয়েছে স্বীকারোক্তির ব্যাকুলতা। স্বীকারোক্তির দায় থেকেই তিনি তাঁর অস্তিত্বের অংশ কবিতাকে নির্দ্বিধায় দাঁড় করিয়ে দেন আত্মস্বীকারোক্তির কাঠগড়ায় :

কেন তুমি মুখ নিচু করে থাকো সারাক্ষণ? কেন
লোকলোচনের অন্তরালে থাকতে চাও?
তোমার কিসের লজ্জা? কোন্ পাপবোধে আজকাল
তোমাকে অমন দীন ছায়াচ্ছন্ন করে রাখে?
... ...
না, তুমি লজ্জায় মুখ আঁধার-নিবাসে
রেখো না লুকিয়ে আর থেকো না অমন
নতজানু হয়ে,
যেমন ভয়ার্ত পাপী ধর্মযাজকের প্রকোষ্ঠের
সম্মুখে একাকী হাঁটু গেড়ে বসে কাঁপায় অধর।
('কেন তুমি', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)

'কনফেশন' প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা রাখতেন শামসুর রাহমান, এ কারণে কবিতার কনফেশনপ্রবণ চারিত্র্যকে তিনি সহজেই চিহ্নিত করতে পারেন। কবিতার অবয়বে এই অপরাধবোধ, অনুশোচনার ছায়া কেন? এর সঙ্গে স্বদেশ, সমকাল, ইতিহাস এবং শামসুর রাহমানের কবিজীবনের গভীর সম্পৃক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। একাত্তরে শামসুর রাহমান অস্ত্রের পরিবর্তে হাতে নিয়েছিলেন কলম, তাঁর জীবদ্দশার ক্রান্তিকালে তিনি বারবার কবিতার ভাষাতেই তৈরি করেছেন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। দুঃশাসনের কেন্দ্রে বসে দুঃসময়কে রূপদানের জন্য যে দুঃসাহস প্রয়োজন হয়, শামসুর রাহমানের কবিসত্তায় সেই স্পর্ধা ছিল। এ কারণে একাত্তরের রক্তাক্ত গর্ভে বসে তিনি যেসব কবিতার জন্ম দিয়েছিলেন সেগুলো ছিল অস্ত্রের মতোই ভয়ংকর, কবির জীবন ছিল যোদ্ধা জীবনের মতোই অনিকেত, বিপদসংকুল, মৃত্যুর ইশারাময়। সে-সময় কবিতার ডায়েরিকে বাঁচানোর জন্য তিনি জীবন বিপন্ন করেছেন, বিনিময়ে কবিতার কাছে কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা কবির ছিল, কিন্তু কবিতা দিয়ে স্বাধীনতাকে ফলপ্রসূ করে তোলা যায় না, রুদ্ধ করে দেয়া যায় না মানবতা-বিধ্বংসী বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের

নিরন্তর প্রবাহ। নিষ্ক্রিয়, নির্বাক কবিতাকে তাই কবি কাঠগড়ায় দাঁড় করান, যেমন প্রতিনিয়ত নিজের কবিসত্তাকেও চুলচেরা বিশ্লেষণ করে গেছেন কবিতার উন্মুক্ত প্রান্তরে, নিজের সৃজনক্ষমতা, সৃষ্ট কবিতার ওপর প্রয়োগ করেছেন সমালোচনার ধারালো অস্ত্র। নিজের অস্তিত্বকে এক অদ্ভুত নির্দয় পরিহাসের পাত্র করে তোলেন কবিতায় :

আমি, শামসুর রাহমান, অবশেষে
কাফকার গ্রেগর শামসা হয়ে যাব? আমি বড়
বেশি ছোট হয়ে যাচ্ছি, মনে হয়; কীট পতঙ্গের
মতোই আমি কি তবে দেয়ালে বসবো? মৃত্তিকায়
খাবো লুটোপুটি কিংবা নোংরা শুঁড়ে নিয়ে নিরুদ্বেগ
নর্দমার ধারে উড়ে যাবো আবর্জনা ভালোবেসে?

('চেয়ার অস্বস্তিকর', *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি*)

'গ্রেগর শামসা' চরিত্রটি কাফকার সৃষ্টি, *দি মেটামরফসিস* উপন্যাসে গ্রেগর শামসা হঠাৎ একদিন বিকট ঘুণপোকায় রূপান্তরিত হয়ে যায়, নতুন এক জীবসত্তার সঙ্গে অভিযোজনের লড়াই শুরু হয় তার। কবি মূলত এক রূপান্তরশীল সত্তা, প্রতিনিয়ত রূপান্তরের ভেতর দিয়ে কবি প্রবেশ করেন নতুন নতুন জীবনাভিজ্ঞতায়, সজীব করেন চৈতন্যকে। কবিতার জন্য কবির এই নিরন্তর রূপান্তর-প্রক্রিয়া : 'তোমার জন্যে টুকরো টুকরো সত্তাটাকে নিংড়ে নিয়ে/ রূপান্তরের গভীরে যাই, ...তোমার জন্যে যখন তখন নিজেকে খুব বদলে ফেলি, আমূল আমি/ বদলে ফেলি' ('বদলে ফেলি', *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি*)। নিজের মধ্যে বহুকে ধারণ, বহুর মধ্যে নিজেকে বণ্টন, এভাবেই রূপান্তর-সমাচার দিয়ে ঘেরা কবির অন্তর্জগৎ। এ কারণে কবিকে দুঃখ দিতে বারণ করেন কবি, কারণ কবির দায় অনেক, কবি হলেন সেই ব্যক্তি যার একান্ত নিজস্ব বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে না : 'নিজস্ব জীবন রেখেছে সে/ গচ্ছিত সবার কাছে নানান ধরনে অকপট' ('কবিকে দিও না দুঃখ', *আমি অনাহারী*)। শামসুর রাহমান তাঁর 'গচ্ছিত' কবিসত্তাকে সর্বসমক্ষে প্রতিনিয়ত যাচাই করেছেন এবং ব্যর্থতার দায় থেকে নিজেকে অব্যাহতি দেননি। কবিসত্তার মতো নিজের ব্যক্তিসত্তাকেও অনেক সময় দাঁড় করিয়েছেন কনফেশনের সুকঠিন ভূমিতে। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর থেকে গোপন আবরণ উন্মোচনের প্রয়াস শামসুর রাহমানের কবিতায় অপ্রতুল নয়; যদিও তাঁর কবিতা আত্মস্বীকারোক্তিমূলক— কবি সিলভিয়া প্লাথ বা রবার্ট লাওয়েলের কবিতার মতো সর্বাঙ্গে আত্মস্বীকারৌক্তিক নয়। 'বাক্স উপাখ্যান' কবিতায় জোহরা বেগমের সঙ্গে যাপিত দাম্পত্যের ভেতরে হঠাৎ এক গভীর অসুখের রাতে মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে দয়িতা :

... এবং জোহরা নাম্নী মহিলার
সঙ্গে থাকি; প্রণয় মরণশীল জেনেও সুদূর সুচেতার সঙ্গে বেশ
ভালোবাসাবাসি হয় প্রধানত কল্পনায়।

('বাক্স উপাখ্যান', *নায়কের ছায়া*)

কবি এই দয়িতাকে স্বনামে সম্বোধন করা থেকে বিরত থাকেন, 'সুদূর সুচেতা' বলার পর আরও সতর্কতার সাথে জানান দাম্পত্য-বহির্ভূত এ প্রণয় মূলত কাল্পনিক, 'প্রধানত কল্পনায়' শব্দদ্বয়ের

চাতুর্যে এখানে সৃষ্টি হয় স্বীকারোক্তির দ্বিধা; কবিতার বাকি অংশ আত্মজৈবনিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল।কবিতায় সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তির অভাব কবিতায় দুটো কারণে ঘটতে পারে : কবির মনোজাগতিক রহস্য এবং কবিতার শিল্পসৌন্দর্য অটুট রাখা অথবা স্বীকারোক্তির দায় বহনের দুঃসাহসের অভাব। দয়িতা-সমাচারে কপট হলেও নিজেকে উন্মোচনে শামসুর রাহমান প্রায়শই নিঃশঙ্ক :

ক. বাষট্টির এই ছন্নছাড়া ধূলিঝড়ে
কোথায় খুঁজব ডেরা? নিজের শরীর থেকে মুঠো
মুঠো ছাই উড়িয়ে, ফুরিয়ে আয়ুর রেণু
টলতে টলতে আজ এই তো আমার পথ চলা।'
('ছন্নছাড়া ধূলিঝড়ে', *আকাশ আসবে নেমে*)

খ. কখনও বা মনে হয়
বেকুব দাঁড়িয়ে আছি বেখাপ্পা মিনারে, সঙ্গীহীন।
কালের মাজাকি, প্রীতি, খুনসুটি, হিংস্রতা ইত্যাদি
সয়ে সয়ে কেমন গণ্ডার হয়ে গেছি।
('আত্মজীবনী বিষয়ক', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)

গ. ...আজ আমি বড় একা,
বন্ধুরা যে-যার মতো পথে পর্যটক, কোনোখানে
জমে না তেমন আড্ডা। মেয়েরা স্বামীর ঘর করে,
ছেলেটা এড়িয়ে চলে সকল সময়।
('আত্মচরিত', *এক ফোঁটা কেমন অনল*)

ঘ. বস্তুত আমার জীবন ভুলে কণ্টকিত বলেই নিয়ত
জোড়হাতে ক্ষমাপ্রার্থী অনেকের কাছে
('আমার কেন যে শুধু', *নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে*)

পঞ্চাশ পেরোনোর পর থেকেই শামসুর রাহমান শরীরী বিকারের প্রসঙ্গ ক্রমাগত তুলে এনেছেন কবিতায়, তাঁর মৃত্যুভীতিতে আক্রান্ত মনের ভেতর বাসা বেঁধেছে মানসিক বিকার। মন ও শরীর থেকে তারুণ্য ও চাঞ্চল্য ক্রমাগত বিদায় নিয়েছে, কবি প্রতিনিয়ত প্রবেশ করেছেন নিঃসঙ্গতার একান্ত ভুবনে, তাই এক সময়ের গভীর রাতের ঢাকাকে শাসন করে বেড়ানো, আড্ডাবাজ কবিকেও বলতে হয় বন্ধু ও পরিবার-পরিজন থেকে দূরের এক নৈঃসঙ্গমথিত জীবনের কথা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্তন অপরাধের স্বীকারোক্তিও জরুরি হয়ে ওঠে, কবি 'জোড়হাতে ক্ষমাপ্রার্থী' হন অনেকের কাছে। 'অপ্রেমের কবিতা'তেও শামসুর রাহমানের অনুশোচনাদগ্ধ সত্তার উন্মোচন ঘটেছে : 'আমার বেহুদা/ বেশরম কলম, অতিরঞ্জনে বেজায় দড়, তোমাকে/ পর্বে পর্বে বিব্রত করেছে' (*হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো*)। দয়িতাকে ছদ্ম আবরণে রেখে প্রেমের কবিতা লিখেও কবি-দয়িতা লোকসমাজের কটাক্ষের শিকার হয়েছেন। ফলে 'অপ্রেমের কবিতা' লিখে কবিকে স্বীকারোক্তি দিতে হয়,

নানা পর্বে তাঁর কবিতায় উচ্চারিত দয়িতা-সংক্রান্ত 'একটি মুক্তোও সাচ্চা নয়'– উচ্চারণের ভেতর দিয়ে দয়িতাকে কেন্দ্রে রেখে কনফেশনের প্রান্তরে নতমুখী হয়েছেন। *রূপের প্রবালে দগ্ধ সন্ধ্যারাতে* কাব্যের 'দুঃস্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে' কবিতায় কবির প্রেমিকসত্তা অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য উন্মুখ : 'হয়েছি বিদ্ধ ক্ষমাহীন অপরাধে... প্রেমের অতনু দেবতাকে বলি শোনো,/ শপথ তোমার শুদ্ধ হতেই চাই।' এ কাব্যের 'হন্তারক' কবিতায় দেখা যায় একই ভাবের সম্প্রসারণ, দয়িতাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করার অপরাধে কবি নতজানু : 'আমি/ আজ কাঠগড়ায় দাঁড়াই অসঙ্কোচে অবেলায়।'

'আমি' নামক ব্যক্তিসত্তার আবরণহীন সত্য স্বীকার করে নিয়ে পথচলাই হচ্ছে আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতার মূলমন্ত্র। এই সত্য স্বীকারে অবশ্য ঝুঁকি রয়েছে পাঠক-সমর্থন হারানোর। একজন কবি তাঁর কবিতার ভেতর দিয়ে পাঠকের কাছে নিজস্ব ভাবমূর্তি তুলে ধরেন, কবির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে পাঠকের যে অস্পষ্ট ধারণা থাকে তা বেশিরভাগ সময়েই হয় উচ্চমার্গের। সেক্ষেত্রে একজন কবি যদি তাঁর ভেতরের ভীরুতাকে স্পষ্ট করে তোলেন, কবির নায়কোচিত যে ছায়াচিত্র পাঠকের মানসলোকে গড়ে ওঠে সেই ছবিটি ভেঙে যেতে পারে। শামসুর রাহমান নির্ভয়ে ক্রমাগত আত্মোন্মোচন-প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন,কবিতা ও যাপিত জীবনের মাঝখানে নেই কোনো দেয়াল। তাই শামসুর রাহমানকে আত্মস্বীকারোক্তির আরও গভীরে প্রবেশ করতে দেখি, নিজেকে তাঁর ডাকনাম 'বাচ্চু' বলে সম্বোধন করে 'দুঃসময়ের মুখোমুখি' কবিতাটি শুরু করেন, তারপর সেই 'বাচ্চু'র 'শামসুর রাহমানে' রূপান্তর পর্যন্ত বিবৃত করেন আক্রুহীন :

এখন আমিও খুব সহজে ঠকাতে পারি, বন্ধুর নিন্দায়
জোর মেতে উঠতে লাগে না দু-মিনিটও; কখনোবা
আত্মীয়ের মৃত্যুকামনায় কাটে বেলা, পরস্ত্রীর
স্তনে মুখ রাখার সময় বেমালুম ভুলে থাকি
গৃহিণীকে।

('দুঃসময়ের মুখোমুখি', *দুঃসময়ের মুখোমুখি*)

'বাচ্চু' নামে নির্মল শৈশব কাটানো এগারো বছর বয়সের বালকের মুখোমুখি তিনি, দাঁড়ানো নয়। অনেকটাই নতজানু হয়ে তিনি উচ্চারণ করেছেন আত্মস্বীকারোক্তিমূলক পঙ্‌ক্তিমালা। বাচ্চুর পরিণত রূপ 'শামসুর রাহমান', এখানে 'শামসুর রাহমান' শুধু নামবাচক শব্দ নয়, এই নামটির ভেতরে তিনি আত্মপরিচয় উন্মোচনে প্রয়াসী : 'আমি শামসুর রাহমান, সাংবাদিক, ক্ষিপ্র ভাষ্যকার;/ আমি শামসুর রাহমান, মানে কবি...' ('দুঃসময়ের মুখোমুখি', *দুঃসময়ের মুখোমুখি*)। শামসুর রাহমানের আত্মজৈবনিক কবিতায় স্বনামে নিজেকে সম্বোধনের প্রবণতা রয়েছে। তবে সম্বোধনধর্মী সব কবিতাই কনফেশনাল নয়, যেমন আত্মজৈবনিকতা মানেও কনফেশনালিজম নয়। 'আমার পূর্বপুরুষগণ' কবিতায় তিনি যখন বলেন :

আমার বাবাকে দেখেছি
মাথা উঁচু করে পথে দীঘল ছায়া ফেলে যখন
হেঁটে যেতেন,
... ...

এখন তিনি ঘুমিয়ে আছেন পাড়াতলী গ্রামে
('আমার পূর্বপুরুষগণ', *শুনি হৃদয়ের ধ্বনি*)

'আমার পূর্বপুরুষগণ' শিরোনাম যুক্ত করে কবিতায় বংশপরম্পরার যে রেখাচিত্র কবি আঁকেন, সেটি নিঃসন্দেহে আত্মজৈবনিক। অন্যদিকে নিজেকে নির্দেশ করে বলেন :

উত্তরচল্লিশ আমি; পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি কিংবা
তারও কম উচ্চতা আমার। চুলের শ্বেত পতাকার
কী বাহার ইদানীং, নানান ব্যাধির গলাগলি
এ শরীরে এবং আয়ুর ভেলা নিত্য কম্পমান।
('স্বীকারোক্তি', *এক ধরনের অহংকার*)

এই 'স্বীকারোক্তি'র ভেতরে কেবল আত্মজৈবনিকতা নয়, রয়েছে স্বীকারোক্তি-প্রবণতা, বয়সের আঘাতে বিপর্যস্ত শরীরী-কাঠামোর উন্মোচন। বার্ধক্য অনেক সময় কবির মানসলোকে হানা দিয়েছে ব্যাধির মতো, ব্যাধের মতো : 'আজকাল বড় বেশি ভয়ে ভয়ে থাকি দিনরাত।/ বয়স বেড়েছে বলে এই ভয় আমাকে কেবলি/ তাড়িয়ে বেড়ায় না কি কুকুরের মতো?' ('ভয়ে ভয়ে থাকি', *এসো কোকিল এসো স্বর্ণচাঁপা*)। তবে এইসব স্বীকারোক্তি কবির চূড়ান্ত পর্যায়ের স্বীকারোক্তি নয়, নিজের প্রতিকৃতি অঙ্কন করতে গিয়ে যে স্তরে পৌঁছান কবি, সেখানে নিষ্কলুষ আত্মজৈবনিকতার পরিবর্তে আত্মধিক্কৃত এক কবির স্বীকারোক্তি ধ্বনিত হয় :

নিজেই অবাক মানি আজকাল, কী নির্লজ্জ আমি।
জনসমক্ষেই তুলি আমার মনের চিটচিটে
খুশ্‌কি ইতস্তত আর ব্যক্তিগত রাখি না কিছুই–
দিয়েছি প্রকাশ্যে মেলে অন্তর্গত সব ডালপালা।
('স্বীকারোক্তি', *এক ধরনের অহংকার*)

কবি হিসেবে 'খ্যাতি' ও 'মুদ্রা' লাভের আকাঙ্ক্ষায় শুধু নিজের জীবন নয়, সাধারণের জন্য কবিতায় উন্মুক্ত করেছেন 'প্রিয়ার চোখ, চুল, বুক' ইত্যাদি।

শামসুর রাহমানের কবিতার কনফেশন প্রবণতার স্বরূপ উদ্ধারের ক্ষেত্রে অবশ্য সতর্ক থাকতে হয়, কারণ নিজেকে উন্মোচন করতে গিয়েও কবিতার শৈল্পিক প্রহেলিকার অন্তরালে এক রহস্যঘনতাও তিনি তৈরি করেন কোনো কোনো কবিতায়। তাই প্রশ্ন জাগে, তাঁর কবিতার সব 'আমি'-ই কি আত্মজৈবনিক অথবা আত্মস্বীকারৌক্তিক 'আমি'? এ ক্ষেত্রে কবিতায় সর্বনামের ছলনা বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হয়। স্বীকারোক্তিমূলক কবিতায় 'আমি'র ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়, কিন্তু প্রথম পুরুষে বর্ণিত সব কবিতাই কি সেই 'আমি'র স্বীকারোক্তি? নাকি সেই 'আমি'র মধ্যেও কথা বলে উঠতে পারে অন্য কোনো জন। অনেকের মধ্যে নিজেকে প্রোথিত করার অথবা নিজের মধ্যে অন্যকে রোপণ করার শৈল্পিক এই গুণ প্রসঙ্গে শহীদ কাদরী বলেছেন :

> ব্যক্তিগত জীবন অবশ্যই লেখায় ছায়া ফেলে। কখনো কখনো ছদ্মবেশী অবস্থায় থাকে, কখনো কখনো সরাসরি প্রভাব ফেলে। তবে একজন লেখক যখন প্রথম পুরুষে কথা বলেন – 'আমি

> আমি' করে, তার মানে এই না উনি নিজের কথাই বলছেন।...নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার ছাপ থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় – কীটস যে ক্ষমতাকে বলেছেন নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি, তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় অন্য কণ্ঠস্বরে কথা বলার। যেমন, একটা মেয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীকে দেখার। রবীন্দ্রনাথের 'বেলা হলো মরি লাজে' – এটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ না।' (দত্ত, ২০১৬ : ১০৭)

শামসুর রাহমানের ব্যক্তিসত্তা সবসময় 'আমি' সর্বনামকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়নি, সর্বনামের সবগুলো রূপের ভেতরে তাঁর ব্যক্তিসত্তার বিস্তার। সর্বনামের জটিল খেলার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে তাঁর অনেক কবিতায়, 'এই এক সময়' (*টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে*) কবিতার 'যারা' এবং 'তারা' দুই প্রতিপক্ষ, এই দুদলের মধ্যে তিনি নিজেকে 'তারা'র গোষ্ঠীভুক্ত করেন; এই 'তারা'র সমষ্টি-চেতনার অন্তরালে প্রবহমান এক প্রবল 'আমি'র অস্তিত্ব। কবির অন্তর্জীবন বিচিত্র অনুভব-অভিজ্ঞতায় আলোড়িত, বিচারের সাধারণ মানদণ্ড প্রয়োগ করে কবির অন্তর্লোক আবিষ্কার করা সুকঠিন। এজন্য কবি অনেক সময় বিক্ষুব্ধ চেতনা নিয়ে বলেন : 'এই আপাদমস্তক বাণিজ্যিক উটকো সমাজে,/ বেঢপ সাংস্কৃতিক চণ্ডীমণ্ডপে/ আমাকে বোঝে না কেউ' ('আত্মা ছুঁড়ে দিই', *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*)। কবি নিজেও কি নিজের আত্মস্বরূপের সঠিক সন্ধান রাখেন? পুঁজিবাদী সমাজ, অস্থিতিশীল রাষ্ট্রীয় কাঠামো, মানবতার বিপর্যয়– কবির মানসভূমিকেও সংশয়ে দোদুল্যমান করে তোলে, দ্বান্দ্বিক সময়ের নিষ্পেষণে দ্বিধান্বিত কবিচিত্ত আত্মস্বরূপ খুঁজতে গিয়ে বিভ্রান্তিতে ভোগেন, 'প্রকৃত কে আমি' কবিতার জিজ্ঞাসার ভেতরে আত্মানুসন্ধানে ব্যাপৃত হন কবি। অনেক সময় সচেতনভাবে নিজেকে সর্বনামের আড়ালে লুকিয়ে রাখেন শৈল্পিক চাতুর্যে : 'এই যে দেখছো যাকে সে নেহাত স্তিমিত পুরুষ' ('অপদার্থের গান', *অবিরল জলভ্রমি*)। এখানে ব্যবহৃত 'যাকে', 'সে' এবং 'স্তিমিত পুরুষ' তিনটি শব্দই কবির আত্মপ্রতিকৃতি নির্দেশ করছে। অথবা মায়ের সেই কণ্ঠস্বর, জিজ্ঞাসা : 'বাচ্চু, তুই এত রাত জেগে লিখছিস?' – এখানে 'বাচ্চু' এবং 'তুই' শব্দের উৎস-বিন্দু শামসুর রাহমান নিজে। নিজেকে বিচিত্রভাবে কবিতায় তিনি নির্মাণ করেছেন, আত্ম-নির্দেশক সর্বনামের প্রচুর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে তাঁর কবিতায় : '– বাঙলা ভাষার সর্বনাম-ঐশ্বর্য তিনি নিঃশেষে ব্যবহার করেছেন নিজেকে নির্দেশের জন্যে : শুধু 'আমি' নয়, 'আপনি', 'তুমি', 'তুই', 'তিনি', 'সে' সবই তাঁর চাপে প্রথম পুরুষের সর্বনাম হ'য়ে উঠেছে' (আজাদ, ১৯৮৩ : ২৩)।

মূলত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশকে আধুনিক কবিতার যে চারিত্র্য অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তাকে অস্বীকার করে কবিতাকে নৈর্ব্যক্তিক করে তোলার যে প্রচেষ্টা তারই বিপরীতে স্বীকারোক্তিমূলক কবিতার জন্ম, যেখানে কবিই কবিতার বিষয়ী। জীবনের নিষিদ্ধ দিক – যেমন মানসিক বিকার বা দৈহিক উপযুক্ততার অভাব, মাদকাসক্তি, যৌনতা, ভয়ঙ্কর ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতা ইত্যাদি এ ধরনের কবিতার বিষয়ের আসন দখল করে। এখানে কবি নিজেকে মুখোশবিহীনভাবে চিহ্নিত করেন। অবশ্য শৈল্পিক নৈপুণ্য রক্ষা করাটা এই কবিতা কলা- কৌশলের একটি বড়ো অংশ। জীবনের ফাঁক ও ফাঁকিগুলোর রূপান্তর ঘটে কনফেশনাল কবিতায়। ধর্মীয় পরিভাষা থেকে এ কাব্যপ্রকরণটির নামকরণ হয়েছে বলে খ্রিষ্টধর্মের 'কনফেশন'-প্রক্রিয়ার সঙ্গে এর একটা যোগসূত্র অবশ্যম্ভাবী। কনফেশনাল কবিতায় ব্যক্তিগত জীবনস্নাত যে সত্য প্রকাশ পায়, সেইসব সত্য উচ্চারণের দুঃসাহস পূর্বের কবিতাধারায় কমই দেখা যায়। সত্য, সুন্দর, কল্যাণের সমন্বয় ভেঙে দিয়েছিল তিরিশি

আধুনিকতা, এ পর্বের আধুনিক কবিরা জীবনের অন্ধকার ছেঁকে যে সত্যকে তুলে ধরেছিলেন সেটি তাঁদের নিজের জীবনজাত নয়, যদি হয়েও থাকে তাহলে নিজের বিকারগ্রস্ততার বয়ান এসেছে অন্য চরিত্রের মুখোশ পড়ে। ব্যক্তিসত্তাকে অস্বীকার করার সেই প্রবণতাকে অতিক্রমের স্পর্ধা নিয়ে কনফেশনাল কবিরা মুখোশবিহীন মুখোমুখি হলেন পাঠকের। বাংলাদেশের কবিতার আত্মজৈবনিক ধারাটি শামসুর রাহমানের হাতে সমৃদ্ধ হয়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাঁর আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতা স্বীকারোক্তির প্রশ্নে বিতর্কিত। 'আপনি', 'আমি', 'তুই', 'তুমি', 'সে'– সর্বনামের সর্বগ্রাসী ব্যবহার; নিজের জন্ম ও বংশ-পরিচয়,পারিবারিক-দাম্পত্য জীবন, দয়িতা সমাচার, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও কবিতা ইত্যাদি নানা বিষয়ের বহুল বিবৃতি সত্ত্বেও 'তাঁর গোপন জীবন দরোজা খোলেনি' (আজাদ, ১৯৮৩ : ২৩)। বলে তিনি অভিযুক্ত। তারপরওশামসুর রাহমান তাঁর যেসব কবিতায় অন্তর্জাগতিক ক্ষত, কবিজীবন ও কবিতার ব্যর্থতার দায়, বার্ধক্যজনিত শরীরী ক্ষয় এবং মানসিক বিকারেরআত্মনিষ্ঠ বিবৃতি প্রদান করেন, সেসব কবিতা পেয়েছে আত্মস্বীকারৌক্তিক চারিত্র্য। পঞ্চাশের দশকে আত্মজৈবনিক ও আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিতাধারার উন্মেষ ও বিকাশকালের কবি হিসেবে শামসুর রাহমান গুরুত্বপূর্ণ।

টীকা

১. আত্মস্বীকারোক্তিমূলক কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন– রবার্ট লয়েল, সিলভিয়া প্লাথ, এ্যানি সেকসটোন প্রমুখ।

২. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "স্বীকারোক্তি, স্মৃতি, স্বপ্ন", *কবিতার জন্ম এবং অন্যান্য*, পৃ ৪৯-৫০, (উদ্ধৃত, মাসুদুজ্জামান, ১৯৯৩ : ১৩৪)

৩. 'বাবুর বাজারে কয়েকটি ছবির দোকান ছিল।...একটি দোকানে দেখেছিলাম দুলদুলের ছবি। কাচের আড়ালে তীরবিদ্ধ রঙিন দুলদুল।...তখন স্কুলে যাওয়ার পথে কতদিন সেই ছবির দিকে তাকিয়ে থেকেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা।' (রাহমান, ২০০৪ : ২৩)

৪. 'নিজের বেকারত্বের জন্যে এক ধরনের বেদনাবোধ এবং হতাশা আমাকে খুব কাতর করে তুলেছিল সত্য। আমার এই মনোভাব কোনও বন্ধু, এমন কি জীবন সঙ্গিনীর কাছেও প্রকাশ করিনি।' (রাহমান, ২০০৪ : ১৩৬)

৫. প্রসঙ্গক্রমে শহীদ কাদরী উল্লেখ করেছেন : 'তারা বেশ ধনীই ছিলেন।' কিন্তু আত্মজীবনীতে শামসুর রাহমান জানিয়েছেন তিনি প্রথম সন্তানের দুধ কেনার পয়সা জোগাড়ের অপারগতা থেকে চাকরির জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিলেন।

৬. পরবর্তীকালে তাঁর এই ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়, তিনি স্বীকারোক্তি দিয়েছেন : 'সাংবাদিকতা সাহিত্যের জাতশত্রু, এই সত্য উপলব্ধি করতে আমাকে অপেক্ষা করতে হলো *দৈনিক পাকিস্তান* পত্রিকার জন্মলগ্ন পর্যন্ত।' (রাহমান, ২০০৪ : ১৫১)

৭. 'এ কেমন বৈরী তুমি' (*ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*) কবিতায় 'শামসুর রাহমান' বলে নিজেকে সম্বোধন করলেও নামের সূত্র ধরে কবিতায় কোন আত্মজৈবনিকতা বা স্বীকারোক্তিমূলক প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়নি।

৮. শামসুর রাহমানের মতোইনিজের নাম-পরিচয়, স্বভাব-প্রবৃত্তি উল্লেখ করেন অকপটে,'আমি তাঁর ছেলে প্রথমে হলাম বেকার,/ তারপর বেল্লিক,/ তারপর বেকুব/ এখন লিখি কবিতা/...আমার নাম শহীদ কাদরী/ ছোটো, বেটে – ঝোড়ো নদীতে/ কাগজের নৌকোর মতোই পল্কা/ কাগজের নৌকোর মতোই পল্কা।' ('একটি উত্থান-পতনের গল্প', *কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই*)

সহায়কপঞ্জি

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (২০১৬)। 'নির্বাসন চিরকালই তো দণ্ড'। *অভিবাদন শহীদ কাদরী*, (সম্পাদক : শামসুজ্জামান খান)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৬)। 'রাহমানের পঙ্‌ক্তিমালা : কবির কথা কবিতার কথা'। *কালি ও কলম* (সম্পাদক : আবুল হাসনাত), শামসুর রাহমান স্মরণ সংখ্যা, তৃতীয় বর্ষ : নবম সংখ্যা, অক্টোবর।

মণীন্দ্র গুপ্ত (২০১১)। 'ষাট দশকের কবিতা'। *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, (সম্পাদক : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়)। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

মাসুদুজ্জামান (১৯৯৩)। *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শহীদ কাদরীর কবিতা (২০০৭)। সাহিত্যপ্রকাশ, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (২০০৪)। *কালের ধুলোয় লেখা*। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (২০০৫)। *শামসুর রাহমান কবিতাসমগ্র*-১। অনন্যা, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (২০০৬)। *শামসুর রাহমান কবিতাসমগ্র*-২। অনন্যা, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (২০০৭)। *শামসুর রাহমান কবিতাসমগ্র*-৩। অনন্যা, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (২০০৭)। *শামসুর রাহমান কবিতাসমগ্র*-৪। অনন্যা, ঢাকা।

সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় (২০১১)। 'সত্তর দশকের কবিতা'। *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, (সম্পাদক : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়)। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৩)। 'দু'চোখে দুর্গম শিখর'। *শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গ শেরপা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সতীনাথ ভাদুড়ীর *চিত্রগুপ্তের ফাইল* : ব্যক্তি ও রাজনীতি

মাখন চন্দ্র রায়*

[সারসংক্ষেপ : সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬–১৯৬৫) একজন রাজনীতি সচেতন কথাশিল্পী। *জাগরী* (১৯৪৫) কিংবা *ঢোঁড়াই চরিতমানসের* (১৯৪৯–১৯৫১) মতো তাঁর তৃতীয় উপন্যাস *চিত্রগুপ্তের ফাইল*-এও (১৯৫৬) রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও আর্থ-সামাজিক-ব্যক্তিক টানাপোড়েনের চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। স্বীয় রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও জীবনদৃষ্টির গভীরতার সমন্বয়ে সতীনাথ ভাদুড়ী ব্যক্তিজীবনে রাজনীতির প্রভাবকে চিহ্নিত করেছেন। সমকালীন রাজনীতির নানা বাস্তবতাকে এই উপন্যাসে যথার্থভাবে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ বিপুলভাবে সাধারণ মানুষের জীবনচেতনাকে বিবর্তিত করেছে। বৃহত্তর বিহারের এ রকম কতিপয় রাজনৈতিক কর্মীর অস্তিত্বের সংগ্রামই পরিস্ফুট হয়েছে *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসে। ব্যক্তিক ও সামাজিক অধিকার সচেতনতা ও সমকালীন অনিবার্যতায় বদলে যাওয়া জনজীবনে রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রতিঘাতের স্বরূপ অনুসন্ধানই এই প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।]

ভারতবর্ষের এক রাজনৈতিক ক্রান্তিকালের কথাশিল্পী সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬–১৯৬৫)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অব্যবহিত কালাবর্তে বিধ্বস্ত স্বদেশ, সংকটদীর্ণ সময় ও টালমাটাল রাজনৈতিক বাস্তবতার যুগে সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর দীপ্র আবির্ভাব। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী সতীনাথ ভাদুড়ী স্বাধীনতা উত্তরকালে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছিলেন সাহিত্যচর্চায়। আজীবন বিহারের পূর্ণিয়াবাসী এই লেখকের সৃষ্টিকর্মে অমর হয়ে আছে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ ও তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও জীবনাদর্শ। বঞ্চিত, অবজ্ঞাত ও প্রান্তিক জনপদের জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতার চিত্র-রূপায়ণে তিনি ছিলেন ঐকান্তিক। সমাজ-সচেতন লেখকের প্রায় সব রচনাই তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও দায়বদ্ধতার ফসল। রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ তাঁর সৃষ্টির ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। সমকালীন বাস্তবতার সামগ্রিক প্রভাবে সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্যে সামাজিক অব্যবস্থার ভয়াল চিত্র, কলুষিত রাজনীতি, মধ্যবিত্তের জটিল মনোবৃত্তি প্রভৃতি অনিবার্য অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। লেখার মধ্য দিয়ে নিরলসভাবে ভারতাত্মার সন্ধান করেছেন তিনি। জীবনসন্ধিৎসু এই লেখক দেশ-কাল-মানুষের স্বরূপ খুঁজতে গিয়ে এই সত্যে উপনীত হয়েছেন যে, 'মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে; পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে' (সতীনাথ, ২০১২ : ১১৩)। সাহিত্য সৃষ্টি তাঁর কাছে সচেতন শিল্পকর্ম। ফলে তাঁর প্রতিটি রচনাতেই গভীর নিরীক্ষা ও সুনিবিড় পর্যবেক্ষণের ছাপ থাকে। সমাজ-সংস্কারক না হয়েও সামাজিক অসঙ্গতি, মিথ্যাচার আর প্রচলিত সংস্কারকে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন তিনি, তাঁর শানিত ব্যঙ্গের আবরণে স্বতন্ত্র স্বর ও ভাষ্যে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী* (১৯৪৫) ও *ঢোড়াই চরিতমানসের* (১৯৪৯–১৯৫১) মতো *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসটিতেও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। *চিত্রগুপ্তের ফাইল* প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। উপন্যাসটি প্রথমে *চিত্রগুপ্তের ফাইল* নামে 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আরম্ভ করে ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। কিন্তু পত্রিকাটি অল্পদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই পত্রিকায় উপন্যাসটির সম্পূর্ণ অংশ প্রকাশ হতে পারেনি। পরে 'মাসিক বসুমতী'তে ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র সংখ্যায় এবং ১৩৫৬-র বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশকালে উপন্যাসটির নাম পরিবর্তন করে 'মিনাকুমারী' নামটি সাব্যস্ত করা হয়। লেখক পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধেই সে সময় পত্রিকাতে প্রকাশকালে গ্রন্থটির নাম পরিবর্তনে সম্মত হয়েছিলেন। বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় অবশ্য তিনি উপন্যাসটির নিজের দেওয়া 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' নামটিই ব্যবহার করেন। এ সম্পর্কে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটক সতীনাথের ঘনিষ্ঠ 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে চিঠিতে লেখেন :

> সতীনাথ ভাদুড়ী মহাশয়ের *চিত্রগুপ্তের ফাইল* অগ্রহায়ণের মাসিকে শুরু হবে। সর্বাগ্রে প্রয়োজন এর একটি পরিবর্তিত নাম। আর প্রুফ দেখানোর সময় লেখককে অনুরোধ করবেন যেন প্রথম প্রকাশিত পরিচ্ছেদের ভাষা যৎকিঞ্চিৎ পালটে দেন। (স্বস্তি, ২০১০ : ৪৫)

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পটভূমিতে সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী* ও *ঢোঁড়াই চরিতমানস* উপন্যাস দুটি রচিত। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসঙ্গ আসেনি। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলো গণ-আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার। *'চিত্রগুপ্তের ফাইল* শ্রমিক জনজীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত। উপন্যাসটির মূল সুর যুগের জনজাগরণেরই সুর' (ভবানী, ২০০৬ : ৩০৬)। এ উপন্যাসের চরিত্রগুলো তাৎমা-ধাঙরদের মতো বঞ্চিত বা পশ্চাৎপদ নয়, অভিজ্ঞতায় ও রাজনৈতিক দীক্ষায় তারা অনেকটাই প্রাগ্রসর। সতীনাথ ভাদুড়ীর অন্যান্য রচনার মতো *চিত্রগুপ্তের ফাইল*ও বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রচিত। উপন্যাসের চরিত্র অভিমন্যু, শিউচন্দ্রিকা প্রভৃতি রাজনৈতিক চরিত্র। এ উপন্যাসে সতীনাথের শ্রমিক জীবনের সঙ্গে সাহচর্যের অভিজ্ঞতা প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসকে ঘিরে স্বার্থান্বেষী কপট দেশসেবকদের ভিড় দেখে বিব্রত হয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ী। চিত্রগুপ্তের ফাইল উপন্যাসটিতে সেই সময়ের চালচিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। স্বাধীনতার পর সাধারণ মানুষের প্রবঞ্চিত হওয়া দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। চার মাস কোনো দলে যোগ না দিয়ে শেষ পর্যন্ত কৃষক-শ্রমিক সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির বাসনা নিয়ে তিনি যোগ দেন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে। 'এ উপন্যাসে যে ট্রেড ইউনিয়নের ছবি পাওয়া যায় তা ১৯৪৮-এর বিহার কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত' (স্বস্তি, ২০১০ : ৪৫)। তিনি ভেবেছিলেন সাধারণ মানুষের মধ্যেই রয়েছে সমাজের উন্নতির হাতিয়ার। ধারণা করা যায় গণ-অভ্যুত্থানের আদর্শ লেখকের মনে সে সময় রাশিয়া ভ্রমণের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিহারের 'কাটিহার জুটমিল'-এর শ্রমিক মালিকের বিরোধে অংশগ্রহণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই উপন্যাসটিতে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। ধর্মঘটের সময় মালিকপক্ষের হীন চক্রান্ত, শ্রমিক কল্যাণের নামে মুনাফালোভী কর্তৃপক্ষের শ্রমিকশোষণ প্রভৃতি তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন লেখক। শ্রমিক শ্রেণির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে ঘটনার বিশ্লেষণধর্মী নিপুণ বর্ণনা, প্রতিটি ঘটনার কার্যকারণ সন্ধানের মাধ্যমে বাস্তবের সুসংহত বিন্যাসে তিনি রচনা করেছেন *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসটি। কারণ রাজনীতি-সচেতন সতীনাথ ভাদুড়ী বিশ্বাস করতেন আধিয়ার-শ্রমিক ঘনিষ্ঠতাই গণজাগরণ ঘটাবে। শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো, মর্যাদার সঙ্গে তাদের

কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক আন্দোলন দমনে শোষক মালিক শ্রেণির ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র প্রভৃতি উত্তেজক উপাদান নিয়ে *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। উপন্যাসটির কাহিনিকাল যদিও স্বাধীনতা প্রাপ্তির কয়েক বছর পূর্ব থেকে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পরদিন পর্যন্ত বিস্তৃত, তথাপি এই উপন্যাসের আবেদন চিরকালীন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর সকল উপন্যাসেই পরিবেশন-কৌশলে অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাস রচনার প্রচলিত ভাবনার বৃত্ত ভেঙে তিনি নির্মাণ করেন নতুন নতুন আখ্যান। *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসটিও আরম্ভ হয় আকস্মিক এক পৌরাণিক আবহের অবতারণায় :

> তাঁর দপ্তরের আত্মহত্যা বিভাগ থেকে জরুরি ফাইল টেনে নিয়ে বসেন চিত্রগুপ্ত, মিনাকুমারীর ঘটনাবহুল জীবনের ফাইল। আত্মহত্যায় মরতে হবে মিনাকুমারীকে– এ তাঁর প্রাথমিক নির্দেশ। তার জীবনের নাট্য আরম্ভ হওয়ার আগেই এই অমোঘ নির্দেশ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এর আর নড়চড় হওয়ার জো নেই। মিনাকুমারীদের জীবনের পুতুলনাচের সুতোটা তাঁর হাতে। চিত্রগুপ্তের নির্লিপ্ত চোখে মানুষগুলো তাঁর নির্দেশ পূরণ করবার উপকরণ– রক্ত-মাংসে গড়া, সুখে-দুঃখে ভরা মানুষ। লোকে ভাবছে যে ঘটনাচক্রই জীবনের কাহিনি গড়ে তুলছে; বুঝছে না যে এ চাকা ঘোরাচ্ছেন চিত্রগুপ্ত। পুতুলের উপর মিনা করেন কারিগর; আর জীবনের উপর মিনা করেন তিনি। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৫৯)

এই চিত্রগুপ্ত হিন্দুবিশ্বাস মতে পরলোকে যমরাজের সচিব মনে করে সূচনার দুটি পরিচ্ছেদ পড়ে ধাঁধায় পড়ে যায় পাঠক। চরিত্রটি অবতারণার তাৎপর্য নিয়ে সংশয় জাগতেই পারে। কিন্তু লেখক এ ব্যাপারে বেশিদূর অগ্রসর না হয়ে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করেন।

চিত্রগুপ্তের ফাইল উপন্যাসের পটভূমি বিহারের মফস্বল শহর বলীরামপুর ও শিরনিয়া। বলীরামপুর জুটমিলের শ্রমিক ইউনিয়ন-এর সেক্রেটারি শিউচন্দ্রিকা এবং তার অন্তরঙ্গ সহকর্মী অভিমন্যু এই উপন্যাসের প্রধান দুই পুরুষ চরিত্র। শিউচন্দ্রিকা এই শ্রমিক সংগঠন তৈরির পূর্বে আরও দু-একজন রাজনৈতিক কর্মী শ্রমিকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন তৈরি করেছিল। শ্রমিকদের ঠকিয়ে অর্থ আত্মসাতের হীন উদ্দেশ্যে সৃষ্ট এই সংগঠনগুলোর নেতারা কাজ হাসিলের পর সরে পড়ে। এইসব কারণে শ্রমিকদের মজদুর ইউনিয়নের নেতাদের উপর আস্থা ছিল না। শিউচন্দ্রিকার আগে শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারি ছিল প্রথমে ইসরাইল মিয়া ও তারপর আমীরচন্দ। কিন্তু মজুররা তাদের কারও উপরেই শেষ পর্যন্ত আস্থা রাখতে পারেনি। শিউচন্দ্রিকা শক্ত হাতে ইউনিয়নের হাল ধরে সুশৃঙ্খল কর্মপদ্ধতি ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে শ্রমিকদের আস্থা অর্জন করে। লেখকের বর্ণনায় :

> রাজনীতি আর পার্টির কাজই শিউচন্দ্রিকার জীবন; আর কিছু সে জানে না; অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোকেও সে একটা অনাবশ্যক বিলসিতা মনে করে। এই একমুখী চিন্তা তার সারা জীবনকে চালিত করে নিয়ে বেড়ায়। যে কোনো প্রশ্ন তার সম্মুখে আসুক, সে তার পার্টির সুবিধা-অসুবিধার মাপকাঠি দিয়ে সেটাকে মাপবে। অদ্ভুত তার কর্ম-প্রেরণা, আশ্চর্য তার নিষ্ঠা। তার কর্মজীবনের সম্মুখে যে কোনো বাধাই আসুক তাকে আটকাতে পারবে না। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৬৪)

যুক্তিবাদী শিউচন্দ্রিকার সকল চিন্তা-চেতনা পার্টির ভালো-মন্দের বিবেচনায় কেন্দ্রীভূত। পূর্ববর্তী নেতাদের অপকর্মের বিষয়ের দিকে লক্ষ রেখেই সে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেত। কর্মনিষ্ঠ এই শ্রমিক নেতার মধ্যে কেউ কোনোদিন ভাবাবেগ লক্ষ করেনি, পার্টিই তার জীবনের

ধ্যানজ্ঞান ছিল। সাহেব মালিকদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলা ও শ্রমিক আইনের সমস্ত খুঁটিনাটি সময় মতো তুলে ধরার জন্য শিউচন্দ্রিকার নেতৃত্ব সম্পর্কে কারো দ্বিধা ছিল না। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই শিউচন্দ্রিকার মতো একজন যথার্থ রাজনৈতিক কর্মীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী।

শিউচন্দ্রিকার ঠিক বিপরীত চরিত্র ছিল অভিমন্যু। কৈশোরের ভাবপ্রবণ মনে উদ্বেলিত হয়ে রোমাঞ্চকর রাজনীতির স্বপ্ন-উন্মাদনায় রাজনৈতিক জীবনকে সে বেছে নিয়েছিল। এই উন্মাদনা একদিন কেটে গেলেও গতানুগতিকতার চাপে ও কর্মী-বন্ধুদের সান্নিধ্য হারাবার ভয়ে শেষ পর্যন্ত সে রাজনীতি ত্যাগ করতে পারেনি। তার স্বভাব হালকা প্রকৃতির। কোনো জিনিস তলিয়ে দেখার মতো তার ধৈর্য ছিল না। শিউচন্দ্রিকার মতো নিয়মের বাঁধা জালে আবদ্ধ থাকলে অভিমন্যু হাঁপিয়ে উঠতো। তবে অভিমন্যুর উপর শিউচন্দ্রিকার কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আত্মভোলা প্রকৃতির জন্য পার্টির অন্যান্য সদস্যরা অভিমন্যুকে ভালোবাসত। স্বভাবতই লঘুচিত্ত অভিমন্যু সব কিছুকেই হেসে উড়িয়ে দিতে চাইত। ঔপন্যাসিক তার স্বভাবকে বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> যাচ্ছে-যেতে-দাও গোছের শান্ত মন্থর জীবনে, মধ্যে মধ্যে দু'কূল-ভাঙা প্লাবন আসবে, আর সেই সময় বানের মুখে গা এলিয়ে দেবে দ্বিধাহীন মনে, এই রকম জীবনই তার খেয়ালের সঙ্গে খাপ খায়। তার ভাবপ্রবণতার মধ্যে কৃত্রিমতার ভেজাল নেই; যে ভাবের বন্যায় সে যখন ভাসে, তখন তা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত করে না। জীবনের উপর তার মায়া নেই, সারা জগৎকে সে বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে– কাল কী হবে সে কথা নিয়ে আজ মাথা ঘামাতে চায় না। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৬৫)

স্বভাবের পার্থক্য সত্ত্বেও বয়ঃকনিষ্ঠ অভিমন্যু শিউচন্দ্রিকার সবচেয়ে বেশি অন্তরঙ্গ বন্ধু হবার মর্যাদা পেয়েছে। কারণ সে জানে অভিমন্যুর মতো এত সাবলীলভাবে আর কেউ কারখানার মজুরদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না। শুধু প্রকৃতিতে নয়, আকৃতিতেও দুই বন্ধুর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। অভিমন্যু ঋজু অথচ নমনীয়, ছয় ফুট লম্বা এবং সুন্দর মুখশ্রীর জন্য সে সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। একজন মজুরের তিনটি আঙুল কেটে যাওয়ায় ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে শিউচন্দ্রিকা অভিমন্যুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। নতুন ম্যানেজার ম্যাকলীন সাহেব শিউচন্দ্রিকাকে উপেক্ষা করে সুদর্শন অভিমন্যুকেই ইউনিয়নের সেক্রেটারি মনে করে। অবশ্য সাহেবের ভুল ভাঙতে দেরি হয় না। শিউচন্দ্রিকার চেহারা যেমনই হোক তার ইস্পাত-কঠিন চরিত্র উপলব্ধি করতে সাহেব দেরি করেনি। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ আঙুল দিয়ে মেপে কী করে ঠিক হয়– আইনের সূক্ষ্ম মারপ্যাচগুলি অভিমন্যু বুঝতে পারে না। তবে সংসারে উদাসীন ভাব থাকলেও জীবনের প্রতি তার আসক্তি ছিল। দুজনের ব্যক্তিত্বের ধরন আলাদা, কিন্তু মৌল স্বভাবে দুইজনই সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ। শ্রমিকরা উভয়কেই বিশ্বাস করে। শিউচন্দ্রিকার জন্য তাদের মনে রয়েছে অসীম শ্রদ্ধা– হয়তো সে তার গাম্ভীর্যের কারণে। অন্যদিকে অভিমন্যুর প্রতি তাদের প্রাণভরা ভালোবাসা। কারণ অভিমন্যু তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে পারে অনায়াসে :

> অভিমন্যুকে মজুররা যত আপন বলে ভাবতে পারে, শিউচন্দ্রিকার বেলায় তা পারে না। শিউচন্দ্রিকা মজুরদের অন্তর থেকে ভালবাসে, তাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু একটা

> মজুরের সঙ্গে গলা-জড়াজড়ি করে নিছক মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে যাক তো? সে পারে অভিমন্যু। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৬৭)

সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসসমূহে ভারতবর্ষের রাজনীতির উপর মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব সুচিহ্নিত করেছেন। *জাগরী* উপন্যাসে চারটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরিবারের উপর গান্ধীজির আদর্শের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। বিহারের অনগ্রসর জনপদে গান্ধীজি কীভাবে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তার বাস্তবোচিত বিবরণ পাওয়া যায় *ঢোঁড়াই চরিতমানস* উপন্যাসে। আর *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসে শ্রমজীবী মানুষের আধুনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অধিকার সচেতন হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত রয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্র যে ভাবপ্রবণ মানুষের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয় তা এই তিন উপন্যাসের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন সতীনাথ ভাদুড়ী। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করলেও *জাগরী*র বিলু, *ঢোঁড়াই চরিতমানসে*র ঢোঁড়াই এবং *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসের অভিমন্যুর মানসিক গঠন অভিন্ন উপাদানে নির্মিত। ঔপন্যাসিক এই চরিত্রগুলোকে আদর্শবাদের ভারবাহী যন্ত্রে পরিণত না করে জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসটি মূলত শ্রমিক সংগঠনের উপর ভিত্তি করে রচিত হলেও ঔপন্যাসিক স্বাধীন ভারতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কটিও নিখুঁতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। শ্রমিক-মালিক বিরোধের পাশাপাশি অভিমন্যু ও মিনাকুমারীর মৌন প্রেমের আখ্যানটি কাহিনিতে স্নিগ্ধ করুণ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। মিলের অদূরে অনাথালয়ে হতভাগ্য অনেক শিশুর সঙ্গে মিনাকুমারী ও রুকণী বড়ো হয়েছে। মিল কর্তৃপক্ষই অনাথালয় পরিচালনা করত। রুকণীর সঙ্গে মিলের সহকারী ম্যানেজার জয়নারায়ণের একটা গোপন সম্পর্কের কথা অনাথালয়ের অনেকে জানে। 'কেসরপাক' নামের এক ধরনের মিষ্টির কারবার নিয়ে অনাথালয়ে যাতায়াতের সুবাদে মিনাকুমারীর সঙ্গে অভিমন্যুর পরিচয় হয়। রুকণী অনাথালয়ের ছেলেমেয়েদের রান্না-খাওয়ার তদারক করে, আর মিনাকুমারী হিসাব-নিকাশ তত্ত্বাবধান করে। অনাথালয়ের মেয়েদের চাল চলন সম্পর্কে স্থানীয় লোকজনের ভালো ধারণা ছিল না :

> অনাথালয়টাকে অধিকাংশ মজুর প্রায় গণিকালয় বলেই ভাবে। তাও আবার যে-সে ধরনের নয়– এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার চালায়, ম্যানেজার আর হাকিমদের জন্য; মিলের অন্যান্য বড় চাকুরেরাও পাতকুড়ুনো এঁটোটা-কাঁটাটা পায়।... দেখিস না, মিলের ভিতর কোয়ার্টার করে দিয়েছে। কেন বাপু, অনাথালয় খুলেছ, বর জুটিয়ে দাও মেয়েদের, বিয়ে দিয়ে দাও যেখানে পারো। তা নয়! ... আর লক্ষ্য করেছিস ঐ পটের বিবি দুজনের রোজ মিল থেকে অনাথালয় যাওয়া চাই– সন্ধ্যার পর।... (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৭৭)

শ্রমিক ইউনিয়নের চরম আর্থিক দুরবস্থার দিনে অভিমন্যুর মাথায় এক বুদ্ধি এসেছিল। সে তার বৈদ্য কাকার কাছ থেকে 'কেসরপাক' তৈরি করতে শিখেছিল। চিনি বা গুড়, চিনাবাদামের কুচি, ছোলার বেসন, কর্পুর, ছোটো এলাচ, খয়ের ও কিছু শিকড় বা ছাল দিয়ে তৈরি হালুয়ার মতো এই পদার্থের শক্তি বর্ধক হিসেবে খ্যাতি ছিল। অভিমন্যু সেই কেসরপাক তৈরি আরম্ভ করেছিল ইউনিয়ন অফিসের উঠোনে। এগুলো সে দিয়ে আসতো স্থানীয় অনাথালয়ে। সেখান থেকে ছেলেরা এগুলো ফেরি করে বেচতো রেলগাড়িতে। আর এই আয় থেকে খানিকটা অনাথালয়কে কমিশন দিয়ে বাকিটা জমা হতো ইউনিয়নের খাতায়। চাঁদা বা অন্য সূত্রে তেমন কোনো আয় না থাকায় এভাবে ইউনিয়নের জন্য বাধ্য

হয়েই অর্থ সংগ্রহ করতে হতো। কেসরপাকের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব মিনাকুমারীর ওপর ন্যস্ত ছিল। এই সূত্রেই অভিমন্যুর সঙ্গে মিনাকুমারীর পরিচয়। এই পরিচয় আরও নিবিড় হয় যখন মিলের ক্যান্টিনের হিসাব রাখার কাজে মিনাকুমারী এবং রুকণী নিযুক্ত হয়। বাস্তববাদী মানুষ শিউচন্দ্রিকা শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত থেকে তাদের মনস্তত্ত্ব সহজেই অনুধাবন করতে পারত। এই কারণে অনাথালয়ের মেয়ে মানুষদের সঙ্গে মিলের কোন সম্পর্ক থাকুক তা সে চাইত না। স্বচ্ছন্দ স্বভাবের জন্যই অভিমন্যু ও মিনাকুমারী সহজ আবেগে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়। মিনাকুমারী অভিমন্যুর সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। মিনাকুমারী অনাথালয়ের পুরনো খাতা থেকে জেনেছে সে আসলে জন্ম-পরিত্যক্তা। বলীরামপুর জংশন স্টেশনের প্লাটফর্ম থেকে তার আশ্রয় হয়েছিল এই অনাথালয়ে। কেউ কখনও তার খোঁজ নিতে আসেনি। অন্য অনেকের বিয়ে হয়ে গেলেও রুকণী বা মিনাকুমারীর বিয়ের উদ্যোগ নেয়নি কেউ। কারণ অনাথালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট জয়নারায়ণ প্রসাদ জানে তারা দুই জন চলে গেলে অনাথালয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলবে না। এর ফলে মিনাকুমারীর অনুধাবন নিম্নরূপ :

> বড় হওয়ার পর মিনাকুমারী প্রতিদিন অনুভব করেছে যে অনাথালয়ে থাকলে পরিচয় হয় জগতের আঁধার আর উষর পিঠটার সঙ্গে। স্নেহ-ভালবাসা, আদর-আবদার এসবের জায়গা কোথায় এখনাকার আবহাওয়ায়? স্বার্থের রুক্ষতার ছোঁয়াচ লেগে সব শুকিয়ে যায় এখানে। নিজের মা-বাবা যে মেয়েদের ভালবাসতে ভুলেছে, তাদের মনের স্নেহ পাওয়ার জায়গাটুকু থেকে যায় একেবারে খালি। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৭৯)

এই শূন্যতাবোধ থেকে বাঁচতে চেয়েছিল মিনাকুমারী। তার বুভুক্ষু মন এমন এক জীবনসঙ্গী চায় যার কাছ থেকে সে গভীর ভালোবাসা পাবে– 'এত গভীর যে তার রুক্ষ বাল্য-জীবনের সব বাকী-বকেয়া উসুল করে নেওয়ার পরও যেন পুজিতে হাত না পড়ে' (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৮০)। মিনাকুমারী আকাঙ্ক্ষা করেছিল একটা নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। বাস্তব অভিজ্ঞতার কাঠিন্যই তাকে হিসেবি হতে শিখিয়েছিল। ভাবের আবেগে নিজেকে ভাসিয়ে না দিয়ে হিসেব কষে অত্যন্ত সন্তর্পণে পা ফেলতে অভ্যস্ত ছিল মিনাকুমারী। এরই মধ্যে তার জীবনে আসে আত্মভোলা অভিমন্যু। যে লোকটির অকৃত্রিম সৌজন্য দেখে মিনাকুমারী মুগ্ধ হয়েছিল, ক্রমেই সে দেখল যে মোটেই সে উদাসীন স্বভাবের নয়– সব ব্যাপারেই উৎসাহী, আচার-আচরণে ভদ্র। মিনাকুমারী অচিরেই বুঝতে পারে অভিমন্যুকে কেবল দূর থেকে ভালো লাগে না, কাছ থেকেও ভালো লাগে। অভিমন্যুও দ্রুত জড়িয়ে পড়ে সম্পর্কের জালে। মিনাকুমারীকে বিবাহ করার ব্যাপারে অভিমন্যুরও ছিল প্রবল আগ্রহ। এ বিষয়ে লেখকের বিশ্লেষণ :

> এই ভাল লাগালাগির পথে, অন্য লোক যেখানে হেঁটে চলে, অভিমন্যু সেখানে ছুটে চলে, চোখ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পক্ষীরাজের পিঠে সওয়ার হয়ে যে রাজপুত্তুর মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলে, তার কি মাটিতে হোঁচট খাওয়ার কথা মনে আসে? মনের নদীতে বান ডেকেছে; দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে যাবেই যাবে। তাতে বাধা দেবার কে মনের রাজ্যের বাইরের লোকেরা? আর বাইরের লোকরা এ নিয়ে মাথা ঘামায়ও নি। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৮১)

মিনাকুমারী অভিমন্যুকে একান্ত করে পেতে চায়। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মী অভিমন্যুর অনিশ্চিত জীবনে প্রবেশ করতে তার কিছুটা দ্বিধা ছিল। সতীনাথ ভাদুড়ী মিনাকুমারী চরিত্রটি বাস্তবোচিত ভাবে রূপায়ণ করেছেন। মিনাকুমারী নিরুদ্বেগ সাধারণ জীবন চায়। অনাথালয়ে পালিতা

মিনাকুমারী অভিমন্যুর মতো একজন সন্ন্যাসী প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে কেবল আবেগের বশে সংসারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। কারণ থানা-পুলিশ, অভাব-অনটন, অনিশ্চয়তা রাজনৈতিক কর্মীদের জীবনের নিত্যসঙ্গী। গার্হস্থ্য জীবনের জন্য অভিমন্যু রাজনীতি ত্যাগ করবে তারও নিশ্চয়তা নেই। হিসেবী মিনাকুমারী অভিমন্যুর কাছ থেকে তার বিষয়ে সবকিছু খুঁটিয়ে জেনে নিতে চায়। অভিমন্যুর সংসারে থাকার মতো আছে এক কাকা-কাকীমা, তাও রাজনীতি করার জন্য কাকা-কাকীমা তার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখেনি। রাজনীতি ত্যাগ করে অভিমন্যু যে অন্য কোন চাকরি করবে এ ধারণা করাও ভুল। তাই এভাবে জীবনকে বেঁধে ফেলার মধ্যে বিপদের ঝুঁকি থেকে যায়। তবু অভিমন্যুকে পাবার লোভটাও তার কাছে কম নয়। এই দোটানার মধ্য দিয়েই মিনাকুমারী অভিমন্যুর খুব কাছেই এসে পড়েছিল। শিউচন্দ্রিকা শ্রমিক সংগঠন নিয়েই ব্যস্ত। বহু পরিশ্রমের পর ইউনিয়নের শক্তি বাড়তেই সে অনাথালয়ের সঙ্গে 'কেসরপাকে'র পাট চুকিয়ে দিয়েছে। কেসরপাক বিক্রির মাধ্যমে টাকা তোলার ব্যাপারটা সে কোন দিনই খুব একটা পছন্দ করেনি। তবু আয়ের কথা ভেবেই সে জয়নারায়ণ প্রসাদের কেসরপাক সংক্রান্ত খোঁচাও একসময় সহ্য করেছিল। এই নির্দেশে অবধারিত ভাবেই মুষড়ে পড়ে অভিমন্যু। কারণ কেশরপাকের কল্যাণেই মিনাকুমারীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমেই তার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল নিবিড় মধুর সম্বন্ধ। স্বাভাবিকভাবেই মিনাকুমারীও এ খবরে মনে মনে ক্ষুণ্ন হয়। এরপর তারা পরস্পরের খবরাখবর নিতে থাকে ক্রেশের দাই রহমন বিবির মাধ্যমে। মিল থেকে অনাথালয়ের দূরত্ব মাইল দুয়েক। মাঝখানে পথের দুইধারে ঝোপঝাড় জঙ্গল ও দীক্ষিতদের আমবাগান। অনাথালয়ে যাবার পথে সেই আমবাগানে পায়ে হেটে এসে অভিমন্যুর সঙ্গে এক সন্ধ্যায় দেখা করবে– এই মর্মে রহমত বিবির মাধ্যমে এক চিঠি পাঠায় মিনাকুমারী। অনেক দিনের ব্যবধানে দেখা হয় দুই জনের। এই দিনগুলিতে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে মিনাকুমারী অনেক ভেবেছে। পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা অনিশ্চয়তার কথা ভেবেও অভিমন্যুর প্রতি তার নিগূঢ় আকর্ষণকে কোনো মতেই সে উপেক্ষা করতে পারেনি। সেদিনটার বর্ণনায় লেখক আশ্চর্য সূক্ষ্ম এক পরিমণ্ডল নির্মাণ করেছেন :

> সারা জগৎ আজ বেহিসাবী হয়ে উঠেছে। দীক্ষিতদের আমবাগানে আমের মুকুলের হিসাব নেই, মৌমাছির গুঞ্জনের বিরাম নেই, পশ্চিমের বাতাসে পাতা-ঝড়ার শেষ নেই। আজকের দিনে মিনাকুমারী নিজের ভাণ্ডার উজাড় করে বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য করবে না। কিন্তু কেবল আজকের দিনটার জন্য, আঁধারের কাছ থেকে চুরি করা এই সময়টুকুর জন্য।
>
> এক ঝাঁক ফড়িং এর মতো ছোট-ছোট পোকা ফড়-ফড় করে উড়ে তাদের জ্বালাতন করে মারল। সত্যিকার বেহিসাবী অভিমন্যুর উষ্ণ নিশ্বাস লাগছে হিসেব করা বেহিসেবী মিনাকুমারীর সিঁথির চুলে। আমের মুকুল থেকে দুজনের দেহে টপ-টপ করে মধু-ঝরার বিরাম নেই। দুটি দেহের দুয়ারে রসের ফোঁটার টোকা পড়ছে, কিসের যেন সংকেত করে। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৮৫)

অভিমন্যু ও মিনাকুমারীর ব্যক্তিগত গোপন সম্পর্ক এক দিকে যখন নিবিড় হয়ে উঠেছে, অন্য দিকে কারখানার পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হতে শুরু করে। মজুরি বৃদ্ধির দাবি, ক্যান্টিনে অব্যবস্থার প্রতিকার, ক্রেশের খাদ্য নিয়ে দুর্নীতির তদন্তের দাবি– এইসব নিয়ে পরিস্থিতি দিন দিন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নের পাশাপাশি গজিয়ে ওঠে মালিক পক্ষের মদদে তৈরি রামভরোসা সর্দারের নতুন ইউনিয়ন। ভাড়া না দেওয়ার অভিযোগে মিলের ব্যারাক থেকে কয়েকটি মজুর পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়। শিউচন্দ্রিকাও

নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকে না। মিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ধনিরামকে দিয়ে মামলা রুজু করে। মজুরদের উপর জুলুমের প্রতিবাদে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম যায় পাটনায়। ধর্মঘটের চরমপত্র পাঠানো হয় লেবার কমিশনারের কাছে। শিউচন্দ্রিকা নিজে পাটনায় গিয়ে শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলে, তিনি তার দরখাস্ত লেবার কমিশনারকে পাঠিয়ে দিয়ে দ্রুত বলীরামপুর যেতে নির্দেশ দেন। লেবার কমিশনার দুই পক্ষকেই বৈঠকে ডাকেন ডাক বাংলোতে। শিউচন্দ্রিকা রীতিমতো প্রস্তুত হয়ে অভিমন্যুকে সঙ্গে নিয়ে কমিশনার সাহেব, ডি.এস.পি, এস.ডি.ও, জয়নারায়ণ প্রসাদ ও ম্যাকলীন সাহেবের মুখোমুখি হয়। কথাবার্তা শুরু হলে শিউচন্দ্রিকা যে সব অকাট্য যুক্তি-তথ্য পেশ করতে থাকে তাদের দাবির সপক্ষে, তাতে মিল কর্তৃপক্ষ পিছু হটতে থাকে। জয়নারায়ণ শিউচন্দ্রিকা ও অভিমন্যুর বিরুদ্ধে নানা কটূক্তি করলে সমবেত মজুররা তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে। কর্তৃপক্ষ ও ইউনিয়নের দর-কষাকষির কলহোন্মুখ পরিবেশে হঠাৎ করে জয়নারায়ণ প্রসাদ তার ট্রাউজারের পকেট থেকে নাটকীয় ভাবে একখানা চিঠি বের করে লেবার কমিশনারে হাতে তুলে দেয়। 'ত্যাগী সন্ন্যাসীদের নৈতিক চরিত্রের একখানা প্রমাণপত্র দেখুন'– বলে মিনাকুমারীকে লেখা অভিমন্যুর চিঠিটি ইউনিয়নের লড়াইকে জয়ের উপান্তে এনে ভেস্তে দেওয়ার জন্য ব্রহ্মাস্ত্রের মতো কাজে লাগায় জয়নারায়ণ প্রসাদ। চিঠিতে লেখা ছিল :

> মিনা,
>
> তুমি কি আমার সঙ্গে দেখা করবে না একদিনও? তুমি এমন কেন? সব কাজের মধ্যেও চব্বিশ ঘণ্টাই তোমার কথা মনে হয়। লক্ষ্মীটি, আমার মনের অবস্থা বুঝে দেরি কোরো না।
>
> তোমারই
> অভিমন্যু
> ১৩–৬–৪৭
> (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৮৬)

মিনাকুমারীর প্রতি অভিমন্যুর দুর্বলতা এবং রুকণীর ঈর্ষাকে কার্য উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে মিল কর্তৃপক্ষ। মিনাকুমারীকে লেখা চিঠিখানা অভিমন্যু দিয়েছিল রহমতের বিবির হাতেই। কিন্তু টাকার খেলায় চিঠিখানা মিনাকুমারীর হাতে না পড়ে, পড়ে রুকণীর হাতে। অর্থের লালসা, মিনাকুমারীর প্রতি ঈর্ষা ও অভিমন্যুর প্রতি প্রতিশোধ-স্পৃহা থেকে রুকণী অভিমন্যুর সেই চিঠি জয়নারায়ণ প্রকাশের হাতে তুলে দিয়েছিল। এই চিঠির বিষয়ে মিনাকুমারী একেবারেই জানতে পারে না। মালিক-মজুরের সভায় শিউচন্দ্রিকার অকাট্য যুক্তিতে নাজেহাল যখন মিল কর্তৃপক্ষ, তখন জয়নারায়ণ অভিমন্যুর চরিত্র হননে এই চিঠির অব্যর্থ প্রয়োগ করে শ্রমিক নেতাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে শ্রমিকদের ক্ষিপ্ত করে তোলে। শিউচন্দ্রিকা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে সভা থেকে বেরিয়ে আসে। অভিমন্যু ইচ্ছা করলেই তাকে লেখা মিনাকুমারীর চিঠিখানা সভার মধ্যে দেখিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারতো; কিন্তু জনসমক্ষে মিনাকুমারীর প্রসঙ্গ এনে সে তার ভালোবাসার অমর্যাদা করতে চায়নি। মিনাকুমারীকে লেখা চিঠি কী করে কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে পারে, মিনাকুমারী তার সঙ্গে কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? অন্তরে অভিমান নিয়ে সে এসব কথা ভেবেছে। বাইরে অপেক্ষমাণ মজুর জনতা বিচলিত হয়। তারা ভাবে অভিমন্যুর জন্য আজ তাদের জয়ের সুযোগ হাত ছাড়া হয়েছে। অভিমন্যুর এই অপরিণামদর্শিতায় শিউচন্দ্রিকা-অভিমন্যুর সম্পর্কেও কিছুটা চিড় ধরে। সে চায়

অভিমন্যুকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করতে, কিন্তু পার্টির অন্যান্য সদস্যদের অনুরোধে অভিমন্যুকে মজদুর ফ্রন্ট থেকে কিষাণ ফ্রন্টে বদলি করা হয়। তাকে পার্টির পক্ষ থেকে সংগঠিত 'বকাশ্‌ৎ' আন্দোলন চালানোর জন্য শিরনিয়া গ্রামে পাঠানো হয়।

অভিমন্যু সমস্ত কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে নীরবেই চলে যায় মঘৈলী থানার অন্তর্গত শিরনিয়ায়। সতীনাথ ভাদুড়ী যখন *চিত্রগুপ্তের ফাইল* রচনা করেছিলেন তখন তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন ভারতের মোহ অনেকটাই কেটে গিয়েছিল। শাসকের পরিবর্তনে শোষণের কোন রূপই বদলায়নি, কৃষক-শ্রমিকদের অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে গেছে। ঔপন্যাসিক সতীনাথ অভিমন্যু ও শিউচন্দ্রিকার মতো ঐকান্তিক শ্রমিক কর্মীদেরও নানা চক্রান্তের বলি হতে দেখেছেন। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে দুর্নীতি ও শোষণের আসল চেহারা প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন প্রকৃত শিল্পী। জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকে তিনি চরিত্রগুলোকে অঙ্কন করেছিলেন। তাই পরিবেশ-নিরপেক্ষভাবে সৃষ্ট চরিত্রগুলো জীবনধর্মী হয়ে উঠেছে। ভারত স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু শিরনিয়ায় জমিদার অযোধিয়া চৌধুরীর অবাধ দাপট। ধান কাটার মরশুমে রায়তদের বঞ্চিত করে পুরো ধান তুলে নিতে চাইলে অভিমন্যুর নেতৃত্বে রায়তরা সংঘবদ্ধ হয়ে বাধা দেয়। পুলিশ ও জমিদারের লেঠেলদের সঙ্গে রায়তদের সংঘর্ষে অভিমন্যু মারাত্মকভাবে জখম হয়। তার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি হয়। রাতারাতি তাকে গরুর গাড়িতে করে নিয়ে আসা হয় বলীরামপুর মজদুর ইউনিয়ন অফিসে। ভালো চিকিৎসার আশায় শিউচন্দ্রিকার আশ্রয়ে বলিরামপুর নিয়ে আসলেও শিউচন্দ্রিকা আহত ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত অভিমন্যুর চিকিৎসার খরচ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পুলিশের ভয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রাণপণে অভিমন্যুর সেবা করে যায় শিউচন্দ্রিকা। ফেরারি আসামী অভিমন্যুকে দেখতে আসতে ডাক্তার প্রথমে আসতে রাজি হয় না। পরে এলেও অভিমন্যুকে শেষ রক্ষা করা যায় না। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু সংবাদ শোনার আকস্মিক আঘাতে অভিমন্যু যথেষ্ট মর্মাহত হয়। মহাত্মাজীর মৃত্যুতে শোক মিছিলে তার প্রেমিকা মিনাকুমারীকে দেখে উত্তেজনার শিখরে উপনীত অভিমন্যু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পরের দিন– ১৯৪৮ সালের একত্রিশে জানুয়ারি 'বলীরামপুর জুট মিলে'র শ্রমিক নেতা অভিমন্যুর শ্মশানে সৎকারের দৃশ্য দিয়েই উপন্যাসটি শুরু হয়েছিল। শীতের সেই সন্ধ্যায় তার চিতাকে ঘিরে বসেছিল মেয়েদের দল– মিনাকুমারী, রুকণী, বলীরামপুরের আরও অনেক মজুরনী। এই মুহূর্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন :

> পৃথিবীসুদ্ধ লোক আজ নিজেকে দোষী মনে করছে। দোষী মনে করছে নিজেকে ম্যাকলীন সাহেব, দোষী মনে করছে নিজেকে শিউচন্দ্রিকা, দোষী মনে করছে নিজেকে মিনাকুমারী; দোষী মনে করছে নিজেদের রুকণী, রহমতের বিবি, সরযূ সিং, প্রতিটি মজুর-মজুরনী, এমনকি মিলের এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ পর্যন্ত। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৬০)

শিউচন্দ্রিকা শ্মশানে সঙ্গে করে এনেছিল অভিমন্যুর সর্বক্ষণের সঙ্গী 'খদ্দরের আধছেঁড়া আধময়লা একখানা ঝোলা'। তারই মধ্যে সে পেয়ে যায় অভিমন্যুর কোষ্ঠী বিচার– কাশী থেকে করিয়ে আনা ভৃগুর গণনার নকল। আর একখানি চিঠি– অভিমন্যুকে লেখা মিনাকুমারীর চিঠি। শিউচন্দ্রিকা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি কোনো দিন সযত্নে ভাঁজ করে তুলে রাখা এই চিঠির কথা। আর ভৃগুর গণনায় অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে ছিল এই কটি কথা– 'জাতকের কর্মের সহিত জনসাধারণের সম্বন্ধ থাকিবে; জাতক সাধারণত আনন্দপ্রিয়, নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ

হইতে পারেন... ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে মহারিস্ট...' (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৬২)। অভিমন্যুর চিতার আগুনে মিনাকুমারীর সেই চিঠি পড়ে শিউচন্দ্রিকার কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গেল। সরকারি আদেশে শিউচন্দ্রিকাকে বলীরামপুর ছাড়তে হয় অভিমন্যুকে দাহ করার পরদিন। অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যুতে শোকাভিভূত শিউচন্দ্রিকা তার যুক্তি ও মননের বাঁধা পথে নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। অত্যন্ত বিচলিত চিত্তে অভিমন্যুর শেষ স্মৃতিচিহ্ন ঝোলা আর মিনাকুমারীকে অভিযুক্ত করে একটি চিঠি লিখে মিনাকুমারীর কাছে পাঠিয়ে দেয়।

শিউচন্দ্রিকার চিঠি পেয়ে মিনাকুমারী নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। অভিমন্যুকে লেখা তার দুই ছত্রের চিঠি পড়ে ফিরে আসে প্রবল ভালোবাসা। সে অনুধাবন করতে পারে মিল-কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্র। মিনাকুমারী ধারণা করে, তার উপেক্ষা সহ্য করতে না পেরে অভিমন্যু বলীরামপুর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। অনুশোচনায় দগ্ধ মিনাকুমারী অভিমন্যুর মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করে। সে ছুটে যায় দীক্ষিতদের আমবাগানে, যেখানে একদিন অভিমন্যুর সঙ্গে গোপনে মিলিত হয়েছিল। ঔপন্যাসিক সতীনাথ ব্যঞ্জনাপূর্ণ আবেগদীপ্ত ভাষায় মিনাকুমারীর জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলির বর্ণনা দিয়েছেন :

> দীক্ষিতদের আম-বাগান এক দুর্বার আকর্ষণে তাকে টানছে। মৃগনাভির গন্ধ লক্ষ করে পাগল হয়ে মৃগী ছুটেছে। আম-বাগানের দিক থেকে কনকনে পশ্চিমে হাওয়া লাগছে তার সর্বাঙ্গে। গলায় পাক দিয়ে জড়ানো স্কার্ফটার প্রান্তদুটো এই হাওয়াতে উড়ছে। সেই আম-গাছটায় মুকুলভরা নিচু ডালটা দুলে দুলে উঠছে। ডাকছে তাকে হাতছানি দিয়ে। এখানেই সে আজ ফিরে পারে তার অভিমন্যুকে। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২১৮)

মিনাকুমারীর এই আত্মহননের মধ্য দিয়ে একটি অসম্পূর্ণ ভালোবাসার ট্র্যাজেডি রচিত হয়েছে। *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসে 'মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক, শ্রমিক জীবনের বিশ্বস্ত ছবি, শ্রমিকদের লড়াই– সমস্ত কিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে ব্যক্তিমানুষের নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্বের অন্বেষণ' (পিনাকেশ, ২০০৬ : ৮৬)। শ্রমিকনেতা শিউচন্দ্রিকা প্রচলিত নেতৃচরিত্র মাত্র নয়। তার মধ্যেও রয়েছে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব– বিশেষত বন্ধু অভিমন্যুকে নিয়ে প্রথমাবধি সে ছিল অনিশ্চিত ও দ্বিধাগ্রস্ত। অভিমন্যু তার প্রাণের বন্ধুর কাছে প্রায় সব ব্যাপারে অকপট হলেও ভালোবাসার জগতে একা, নিঃসঙ্গ; এমনকি তার প্রণয়পাত্রী মিনাকুমারীকেও সে সব কথা খুলে বলতে পারেনি। মিনাকুমারীও তার গোপন ভালোবাসা প্রচ্ছন্ন রেখেছে অব্যক্ত বেদনায়, শেষ পর্যন্ত তার মাসুল দিয়েছে আত্মহত্যা করে।

চিত্রগুপ্তের হিসেব-ছকটিকে এভাবেই মিলিয়ে নেন লেখক। চিত্রগুপ্তকে নিয়ে উপন্যাসের প্রারম্ভে যে অভিপ্রায়টি তাঁর স্থগিত ছিল গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে এসে আবার সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসেন তিনি। পাঠক সমীপে ফিরিয়ে আনেন চিত্রগুপ্তকেও; কিন্তু আনেন ভিন্ন পরিচয়ে, ভিন্ন ভূমিকায় :

> চিত্রগুপ্ত তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচক। সাহিত্য-সমালোচনায় পয়সা নাই। সেইজন্য লেটারহেড ছাপিয়ে একটা নতুন ব্যবসা খুলে বসেছেন,– ডাকযোগে গল্প লেখা শেখানো। নূতন লেখকদের লেখার দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া, আর তাঁর বিজ্ঞাপন যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে পনেরটি মাত্র পাঠে পুরোদস্তুর লেখক তৈরি করে দেওয়া– 'ইহাই চিত্রগুপ্ত-বাণী-প্রতিষ্ঠান-এর উদ্দেশ্য। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২১৯)

উপন্যাসে রোমাঞ্চের স্থান নেই জেনেই আখ্যান শেষে লেখক পাঠককে চমকে দিয়ে জানালেন যে মিনাকুমারী-অভিমন্যুর প্রেম-কাহিনি কাল্পনিক। উপন্যাসের শেষে মিলন, বিরহ, স্বাভাবিক

মৃত্যু, আত্মহত্যা, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি পনেরটি সংকেত দিয়ে যশোলিপ্সু উদীয়মান লেখকদের আবেগের বিহ্বলতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। চিত্রগুপ্ত নামের মধ্যেও নিহিত রয়েছে লেখকের বক্রকটাক্ষ।

চিত্রগুপ্ত বলতে পাঠক প্রাথমিকভাবে অনুমান করেন জীবনের নথিরক্ষক চিত্রগুপ্তকে। চিত্রগুপ্তের রহস্যভেদ হয়েছে উপন্যাসের শেষে। হিন্দু পুরাণ মতে, চিত্রগুপ্ত যমের কায়স্থ কর্মচারী, সে মানুষের পাপ-পুণ্যের চিত্র-বিচিত্র হিসাব গুপ্ত রাখে। কিন্তু এই উপন্যাসে চিত্রগুপ্ত হিন্দু পুরাণের দেবতা নয়, মাত্র সাড়ে তিনশ টাকায় পনেরটি পাঠে উপন্যাস রচনার পাঠক্রম সরবরাহকারী স্বনামধারী সমালোচক। এভাবেই চিত্রগুপ্তের মুখোশ উন্মোচন করেন লেখক। জীবনের চালক চিত্রগুপ্তের স্থলে লেখকের সাহিত্য রচনার শিক্ষক চিত্রগুপ্তকে বসানোর ব্যঙ্গ ও শ্লেষের অন্তরালে সক্রিয় থেকেছে লেখকের যুক্তি ও মনন। উপন্যাসটির শেষাংশে 'নতুন লেখকদের' প্রতি চিত্রগুপ্তের 'বিশেষ গোপনীয়' কয়েকটি পরামর্শের উল্লেখ রয়েছে :

(ক) একটি গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক ঘটনা গল্পের ভিতরে ঢুকাইয়া দিবেন।

(খ) খানিকটা রাজনীতি (ফিকে গোছের) গল্পের ভিতর যেন স্থান পায়।

(গ) সাধারণ বুদ্ধিতে অবিশ্বাস বা অসম্ভাব্য মনে হইলেও স্থূল নাটকীয় উপাদান বহুল পরিমাণে গল্পের ভিতর দিতে ভুলিবেন না।

(ঘ) শোষক ও শোষিতের সংঘর্ষের কথা যেমন করিয়া হউক গল্পের ভিতর আনিতে চেষ্টা করিবেন। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২২০)

কোনো নাম-পরিচয় দ্বারা চিহ্নিত না হলেও এই অনুচ্ছেদটি ঘটনা প্রসঙ্গ বহির্ভূত স্বতন্ত্র এক পরিশিষ্ট। সাহিত্যে বিশেষ ধারা রচনার লক্ষ্যেই হয়তো লেখকের এই সকৌতুক কটাক্ষপাত। 'চিত্রগুপ্ত' প্রসঙ্গে রহস্যময়তা সৃষ্টির মাধ্যমে সতীনাথের বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক মন সম্ভবত একটু কৌতুক করতে চেয়েছিল পাঠকের সঙ্গে। সতীনাথ নিজে মিনাকুমারীর চিঠি, নায়কের মৃত্যু সম্পর্কে জ্যোতিষীর গণনা, নায়কের মৃত্যু, নায়িকার আত্মহত্যা ছাড়াও লেখার জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্য সমসাময়িক ঘটনা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, শাসক-শোষিতের বিরোধ সবকিছুর সমন্বয়ে ব্যঙ্গ-শ্লেষের মাধ্যমে সময়, সমাজ ও রাজনীতির দ্বন্দ্বে আলোড়িত ব্যক্তির অন্তর্লীন সংকটকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। সতীনাথ বুঝতে পেরেছেন স্বাধীনতার পর লাডলীবাবু, বলিরাম জুটমিলের মালিকরা ক্ষমতাবান হয়েছে। আর ঢোঁড়াই, অভিমন্যু প্রভৃতি সাধারণ মানুষ হয়েছে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার। *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসে সতীনাথের নিজের মনের দ্বন্দ্ব আরও পরিষ্কার হয়েছে। তাই প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে তিনি খুঁজে নিয়েছেন সত্যান্বেষণের পথ।

জাগরী ও *ঢোঁড়াই চরিতমানসের* মতো *চিত্রগুপ্তের ফাইল*ও সতীনাথ ভাদুড়ীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ফসল। রাজনৈতিক আদর্শ ও ব্যক্তিগত আবেগের দ্বন্দ্ব এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। শেষের চমকের চেয়ে আদর্শের ট্র্যাজিক পরিণতি পাঠকের চিত্তকে অধিকতর অভিভূত করে। উপন্যাসটি মোট আটটি তরঙ্গে বিভক্ত। কাহিনি শুরু হয়েছে প্রথম পুরুষে, তারপর ধীরে ধীরে প্রথম তরঙ্গেই শিউচন্দ্রিকার দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন লেখক। উপন্যাসটিতে কাহিনি বর্ণনায় ফ্ল্যাশ-ব্যাক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে শিউচন্দ্রিকার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠা টুকরো টুকরো দৃশ্য প্রধান্য পেয়েছে। শ্মশানে অভিমন্যুর খদ্দরের ঝোলা ও চিঠির অনুষঙ্গে শিউচন্দ্রিকার চোখের সামনে ঘটনাগুলো ভেসে উঠেছে। কেবল মিনাকুমারী

ও অভিমন্যুর পরস্পরকে লেখা চিঠি দুটির ক্ষেত্রে মিনাকুমারী ও অভিমন্যুর দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনি বিবৃত হয়েছে। শেষ তরঙ্গে এসে লেখক 'চিত্রগুপ্ত' ছদ্মনামধারী লেখকের জবানীতে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। একজন শ্রমিক নেতা ও মালিক পক্ষের অনুগৃহীত কর্মীর প্রেম কীভাবে মালিক পক্ষের ঘৃণ্য কূটচালে রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে তলিয়ে গেল– এরূপ মর্মন্তুদ বিয়োগান্তক কাহিনিই এই উপন্যাসের অবলম্বন।

ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসের কাহিনি-বিন্যাসে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে চিত্রগুপ্তের খসড়া ও শিউচন্দ্রিকার বর্ণনা এই দুটি স্তরে কাহিনির বিস্তার ঘটেছে। এখানে লেখক এক নতুন কৌশলে কাহিনির শুরু ও শেষকে একই বিন্দুতে বেঁধে দিয়েছেন। কাহিনিকে নিজের পথে চালিত করে আবার শুরুর মুহূর্তে ফিরিয়ে এনেছেন। কাহিনির প্রারম্ভে চিত্রগুপ্ত ফাইল খুলে নায়িকা মিনাকুমারীর জন্য অপঘাত-মৃত্যুর পরিণতি নির্দেশ করেছেন। তারপর কীভাবে মিনাকুমারীর জীবন সেই পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে সেটা শিউচন্দ্রিকার চিন্তাসূত্র ধরে বিবৃত করেছেন। একেবারে শেষে মিনাকুমারীর আত্মহত্যার দৃশ্যের পরেই জানা গেল যে এই 'চিত্রগুপ্ত' যমরাজের হিসাবরক্ষক নন, তিনি আসলে উদীয়মান লেখকের 'করেসপন্ডেন্স কোর্সের পরিচালক'। তারপর মিনাকুমারীর পরিণতির বর্ণনা চিত্রগুপ্ত নিজেই দিয়েছেন। কাহিনির শেষ দৃশ্যকে প্রথম দৃশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার এই কৌশল অবলম্বনের পেছনে কাজ করেছে লেখকের সব্যঙ্গ হাস্যের মনোভাব। লেখকের বর্ণনা কৌশলে পাঠক যখন গল্পের বিয়োগান্তক পরিণতির সঙ্গে একান্ত হয়ে পড়েছে, মিনাকুমারী-অভিমন্যুর বেদনাদায়ক পরিণতির শোকে মুহ্যমান– ঠিক তখনই লেখক সচেতন পাঠককে নিক্ষেপ করেন বাস্তবতার ভূমিতে। পাঠক অবাক হয়ে লক্ষ করেছে চিত্রগুপ্ত গল্পের কথকমাত্র। পাঠক যেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল সেটা যে আসলে ছকে বাঁধা কল্পকাহিনি মাত্র– এটা বুঝে পাঠক নিজের নির্বুদ্ধিতায় বিমূঢ় হয়েছে। লেখকের এই কৌশল অবলম্বনের কারণ নিছক চমক সৃষ্টি করা নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন প্রত্যক্ষ সংগ্রামী হিসেবে তাঁর এবং অসংখ্য মানুষের যে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, পাঠকের স্বপ্নভঙ্গের মধ্যে তা-ই যেন আভাসিত হয়েছে।

চিত্রগুপ্তের ফাইল উপন্যাসে অভিনব কৌশলে সময়-বিন্যাসের মাধ্যমে কাহিনিতে নাটকীয়তা সঞ্চার করেছেন লেখক। প্রথম স্তরে আপাত সময় কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী। ছদ্মনামধারী লেখক চিত্রগুপ্ত ফাইল খুলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গোছাতে গোছোতে তার এক শিক্ষানবিশ গ্রাহককে গল্পের প্লট সরবরাহ করছেন। এই স্তরে বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে 'চিত্রগুপ্তের' সরবরাহকৃত ঘটনার বর্ণনায় প্রকৃত সময় প্রায় বার দিনের। কেবল প্রথম ও শেষ দিনের ঘটনার সময় উল্লেখ করা আছে। উপন্যাসের শুরুতে প্রথম তরঙ্গে রয়েছে অভিমন্যুর শবদাহের সময়– ৩১/০১/১৯৪৮-এর সন্ধ্যা এবং উপন্যাসের সপ্তম তরঙ্গে চিত্রগুপ্তের প্রসঙ্গে ফিরে যাবার আগেই অভিমন্যুর মৃত্যুর তের দিনের মাথায় মিনাকুমারীর আত্মহত্যার ঘটনা ১২/০২/১৯৪৮ সন্ধ্যা। এই স্তরে কালের ব্যবহার সাধারণ বর্তমান। তৃতীয় স্তর– এই দুই সময় সীমার মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে মিনাকুমারী-অভিমন্যু ও শিউচন্দ্রিকার জীবনের অতীত দুই বছরের ধারাবাহিক ঘটনার বর্ণনা। স্মৃতিচারণার সময়ে বর্তমান কালের ব্যবহার হয়েছে। এই উপন্যাসে অভিনব কাহিনি-বিন্যাস কালের বিন্যাসকে প্রভাবিত করেছে।

চিত্রগুপ্তের ফাইল উপন্যাসে দুটি বিষয় সমান্তরালে এগিয়ে গেছে– একটি মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের রাজনৈতিক বিষয় এবং অন্যটি অভিমন্যু-মিনাকুমারীর প্রেমের চিত্র। লেখক তাঁর ভাষা ব্যবহারের কৌশলে দুটি ভিন্ন বিষয়ের আন্তরিক স্বাদ পাঠককে দিতে সক্ষম হয়েছেন। শ্রমিক ইউনিয়নের আন্দোলন ব্যর্থ করে দেবার জন্য মালিকপক্ষের ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ভাষারূপ গড়ে তুলেছেন লেখক :

> দালালদের দিয়ে আর একটা লোক-দেখানো ইউনিয়ন খোলবার চেষ্টা করছে জয়নারায়ণ প্রসাদ, এই বলে দিলাম। তোমরা যদি নিজেদের ইউনিয়নের চাঁদা দেওয়া মেম্বার না হও তাহলে একদিন কালেক্টর সাহেবকে দিয়ে বলিয়ে দেবে ম্যাকলীন সাহেব যে, ঐ দালাল ইউনিয়নটারই মেম্বার বেশি– সেইটাই আসল ইউনিয়ন। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২১৫)

বর্ণনার গুণে 'বকাশ্‌ৎ' আন্দোলনের পটভূমিকায় শুধু শ্রমিক ইউনিয়ন নয়, কৃষক শোষণের ছবিও ফুটে উঠেছে :

> এ পাঁচ মাস অযোধিয়া চৌধুরীর লেঠেলরা লাঠিতে তেল দিতে ভোলেনি। অযোধিয়া চৌধুরী নিজে মঘৈলী থানার দারোগা সাহেবকে ভেট পাঠাতে ভোলেননি একদিনও। পুলিশ নিমকহারাম নয়, যার নুন খায় তার গুণ গায়। সেই ভরসাতেই অযোধিয়া চৌধুরী জমি থেকে বেদখল করতে সাহস করেছে অগণিত রায়তদের। যারা বংশ পরম্পরায় এই জমিতে অশ্রু ঘামের রস জুগিয়ে এসেছে, নির্মম হাতে তাদের উপড়ে ফেলে দিতে চায় শিরনিয়ার জমিদার বাবু, স্বাধীন ভারতের রসের মধু যেন সে শিকড় না পায়। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২৩৮)

জমিদারের লোভ ও আগ্রাসী মনোভাব এই কয়েকটি বাক্যের মধ্যে স্পষ্টতর হয়েছে। 'লেঠেল', 'রায়ত', 'বেদখল', 'জমিদার বাবু' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার কৃষক-শোষণের অনুষঙ্গ নিয়ে এসেছে। 'অশ্রু ও ঘামের রস', 'উপড়ে ফেলা', 'রসের মধু', 'শিকড়' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার পাঠকের আবেগকে নাড়িয়ে দিয়ে কৃষকের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে। 'যার নুন খায় তার গুণ গায়'– প্রবাদের ব্যবহার ভাষায় যথেষ্ট ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। জনগণের টাকায় যে পুলিশ ও আমলা বাহিনীকে পোষা হয় তারা জনগণের প্রতি নয়, জমিদারের প্রতি অনুগত।

অন্যদিকে শ্রমিকনেতা অভিমন্যুর কল্পনাপ্রবণ মন যখন মিনাকুমারীকে পেতে উদ্বেল হয়ে উঠেছে, সেরূপ রোমান্টিক অনুষঙ্গের ভাষা নিম্নরূপ :

> পক্ষীরাজের পিঠে সওয়ার হয়ে যে রাজপুত্তুর মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলে, তার কি মাটিতে হোঁচট খাওয়ার কথা মনে আসে? মনের নদীতে বান ডেকেছে; দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে যাবেই যাবে। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২১৪)

এখানে 'পক্ষীরাজ', 'রাজপুত্তুর', 'মেঘের মধ্য দিয়ে উড়ে চলা' প্রভৃতি শব্দবন্ধ শ্রমিক সংগঠনের নেতার রোমান্টিক মনের ঢাকনা খুলে দিয়েছে। 'নদীতে বান ডাকা' উপমার ব্যবহারে অভিমন্যুর জীবনের বিদ্রূপ ফুটে উঠেছে। 'বান' শব্দটি একই সঙ্গে দুরন্ত ও ধ্বংসের ইঙ্গিতবাহী। মিনাকুমারী সম্বন্ধে তার প্রবল আবেগ জীবনকে অনিবার্য ভাদুড়ী চরিত্র ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারে ও শব্দ প্রয়োগে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। জীবনের পথে সতর্ক পথিক মিনাকুমারী। কিন্তু দীক্ষিতদের আম বাগানের এক বসন্ত-গোধূলি ও অভিমন্যুর সংস্পর্শ তার চিত্তের সতর্ক প্রহরাকে শিথিল করে দিয়েছে। ঐ সন্ধ্যার অনুভব তার সমস্ত হিসেবের বাইরে। মিনাকুমারীর ঐ বেহিসেবি অনুভূতিকে বিশেষ শব্দের প্রয়োগে লেখক স্পষ্ট করেছেন–

'যে তার সম্পর্কে আসে তারই উপর অভিমন্যুর মন হালকা পরশ রেখে যায়! মিনাকুমারীর উপর রঙের পরশ এত হালকাভাবে লাগেনি' (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২১৪)। এখানে 'স্পর্শ' শব্দের স্বরভক্তি ঘটিয়ে লেখক অভিমন্যু ও মিনাকুমারীর প্রেমের উন্মেষের স্পর্শকাতরতাকে সঠিক মাত্রা দেবার চেষ্টা করেছেন। অনাথ আশ্রমের বর্ণনায় লেখক লিখেছেন :

> বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একখানি নিকানো অঙ্গন; উঠোনের তুলসী মঞ্চটার পাশে একটা উলঙ্গ শিশু খেলা করছে। এই অঙ্গনটা হবে তার একান্ত আপন; নিজেকে নিঃশেষ করা দরদ দিয়ে সে গড়ে তুলবে এই নীড়। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২১৩)

অনাথালয়ে বেড়ে ওঠা মিনাকুমারী নিরাপদ ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখে 'বেড়া দিয়ে ঘেরা' এই শব্দবন্ধ সেই নিরাপত্তার প্রতীক হয়ে উঠেছে। 'ছোট্ট নিকানো অঙ্গন', 'তুলসীমঞ্চ', 'উলঙ্গ শিশু', 'একান্ত আপন', 'নিঃশেষ করা দরদ' প্রভৃতি শব্দবন্ধের প্রয়োগের মাধ্যমে লেখক সেই নিরাপদ জীবনের স্বপ্নকে বাস্তবতার রঙে রাঙিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ও রাজনৈতিক কর্মীর প্রেম-প্রসঙ্গ এক সাথে গাঁথা হওয়ায় *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসে নানারূপ বাক্‌প্রতিমার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। অভিমন্যু-মিনাকুমারীর প্রেমানুষঙ্গে উপমার প্রয়োগ কাহিনিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। যেমন :

১. বিচ্ছিন্ন চিন্তার টুকরোগুলোও শুকনো পাতার মতো মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যে উড়ে চলে যায়, যে ঝড় মনের মধ্যে দিয়ে বইছে তারই ঝাপটায়। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৯০)

২. গ্লানির অন্ধকার হঠাৎ ঢেকে ফেলেছে বলীরামপুরের নিরর্থক জগৎটাকে। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২৫৭)

৩. চিঠির ছত্রগুলো জাঁতার মতো পিষে ফেলেছে মিনাকুমারীকে। এক একটা কথা তো নয়, যেন কারখানার দাঁতওয়ালা চাকার এক একটা দাঁত। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ২৫৬)

কাব্যিক সুষমামণ্ডিত উপমার কোনোটি বিশেষ একটি অনুভূতির আবেদনেই সীমাবদ্ধ, এছাড়াও অনেক উপমার আবেদন পাঠকের গভীরতর অনুভূতির জগতে।

অভিমন্যুর চিতাকে ঘিরে বসে থাকা নিকটজনেরা ভাবছে তাদের জ্ঞানের জগতে অভিমন্যুর মনের যে দিকটি অনালোকিত ছিল, তা আলোকিত হয়ে উঠেছে অভিমন্যুর মৃত্যুতে। অভিমন্যু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে জগতে পৌঁছে গেছে তা তাদের কাছে অগম্য। চিতার পাশে বসে তারা অভিমন্যুর জন্য তাদের দায়িত্ব নির্ণয় করছে। অভিমন্যু মৃত্যুর ওপারে পৌঁছেও তাদের চেতনায় সত্য হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিকের বিবরণ নিম্নরূপ :

> কালো জলে চিতার আগুনের আলো পড়ছে; বৈতরণীর উপর গড়ে উঠেছে গলানো সোনার সেতু। চারিদিকে অগণিত লোকের মেলা। নির্বাক নিশ্চল জনতার ভিড়টা চিতার তিন দিকে জমে চাপ বেঁধে গিয়েছে। একটা ছোট্ট দলের মধ্য থেকে ভেসে আসছে রামধুনের গান, শোকাতুর লোকগুলোর তার সঙ্গে ক্ষীণ সুরের যোগান দেওয়ারও উৎসাহ নেই। (সতীনাথ, ১৪১৮ : ১৮৯)

চিত্রগুপ্তের ফাইল একটি সংকটময় সময়ে রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তির পারস্পরিক সংঘাতময় সম্পর্কের দলিল। রাজনৈতিক দল শৃঙ্খলা রক্ষার নামে ব্যক্তিজীবনের স্বাধীন সত্তাকে গ্রাস করে নিচ্ছে– এমন প্রসঙ্গ নিয়ে উপন্যাস রচনা সতীনাথ ভাদুড়ীর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে বিরল।

মালিকপক্ষের শোষণ বা শ্রমিকদের লড়াই– এসব ছাপিয়ে উঠেছে ব্যক্তি-মানুষের নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্বের অন্বেষণ। চরিত্রকল্পনা ও কাহিনি-সংস্থানের নিজস্ব ভঙ্গিমায় লেখক সচেতনভাবেই ব্যক্তির সংকটকে একটি সার্বিক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ওপরে স্থান দিয়েছেন। মিল কর্তৃপক্ষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে লেখকের নির্মমতা ও কুশলতা তাঁর মানবপ্রেমিক হৃদয়েরই উজ্জ্বল প্রমাণ। ব্যক্তির চরিত্রহনন, তাদের ওপর নেমে আসা কুৎসিত কলঙ্কের ভার কিংবা শ্রমিকশ্রেণির ন্যায্য দাবির বিপরীতে নেমে আসা নিষ্পেষণের চিত্র রূপায়ণে তথা পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকের যথাযথ উপস্থাপনে লেখকের দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। ব্যক্তি ও রাজনীতির অসম দ্বৈরথে স্বাধীনতা-উত্তরকালে শ্রমিক-আন্দোলনের পরিবেশ ও সংকটের বিশ্বস্ত দলিল হিসেবেও *চিত্রগুপ্তের ফাইল* উপন্যাসটি তাৎপর্যপূর্ণ।

সহায়কপঞ্জি

পিনাকেশ সরকার (২০০৬)। 'সম্পর্ক ও নিঃসম্পর্কতার আখ্যান : চিত্রগুপ্তের ফাইল'। *কোরক* (সতীনাথ সংখ্যা), সম্পাদক : তাপস ভৌমিক, কলকাতা।

ভবানী সরকার (২০০৬)। 'সতীনাথ ও তাঁর উপন্যাস *চিত্রগুপ্তের ফাইল*'। *দিবারাত্রির কাব্য* (সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা), সম্পাদক : আফিফ ফুয়াদ, কলকাতা।

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৪১৮)। *সতীনাথ রচনাবলী* ২, (সম্পাদক : শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।

সতীনাথ ভাদুড়ী (২০১২)। 'ঢোঁড়াই'। *পড়ুয়ার নোট ও অন্যান্য*। মনফকিরা, কলকাতা।

স্বস্তি মণ্ডল (২০১০)। *সতীনাথ ভাদুড়ী*। সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা।

বাংলা নাটকে সংগীতের প্রয়োগ প্রসঙ্গ : আদি ও মধ্যযুগ

লায়লা ফেরদৌস*

[সারসংক্ষেপ : ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকের স্বতন্ত্র শৈলীর মধ্য দিয়ে কালপ্রবাহে টিকে থাকা এবং এই টিকে থাকা নাট্য আঙ্গিকের একটি সুস্থিত রূপচিত্র তৈরির পর্যায় হিসেবে বাংলা নাটকের পরিবেশনারীতি বিশেষ করে নাটক পরিবেশনার ক্ষেত্রে সংগীতের প্রয়োগ প্রসঙ্গে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধ। বিশ্ব নাটকের প্রাচীন পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলা নাটকের উৎস অনুসন্ধানে জানা যায়, সুপরিকল্পিতভাবে নয়, বরং বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতি গভীর বিশ্বাসের ভিত্তিতে পালিত আচার-অনুষ্ঠান থেকেই বিশ্ব নাটক তথা বাংলা নাটকের উদ্ভব। আদি মানবের অর্থদ্যোতক দেহভঙ্গিমা তার মূর্তি বা প্রতীক ভাবনা চিত্রে, ভাস্কর্যে ও নিজ দেহের পেশি, কণ্ঠ, মাথা, ঘাড়, বুক, কাঁধ, হাত, কোমর ও পায়ের নানান ভঙ্গিতে রূপায়িত হয়েছিল। অর্থাৎ মানবের আদি প্রচেষ্টায় অনুকরণের বিষয়টি ছিল মুখ্য। হোক সে পশুপাখির শারীরিক অঙ্গভঙ্গির অনুকরণ বা কণ্ঠের। সে বিবেচনায় নাটক ও সংগীতের উদ্ভব পুরাণ-অভিন্ন মনে হলেও সাহিত্যের উক্ত দু'ধারা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও স্বাধীন পরিণতি ঘটিয়ে এদেশে স্বকীয়তা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। উৎপত্তির আদিকাল থেকে অদ্যাবধি প্রবহমান বাংলা নাটকের নাট্যিক উপাদানের বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ধারায় 'সংগীত' (গীত) প্রাচীন ও মধ্যযুগ অতিক্রম করে আজও বাংলা নাটকের মুখ্য অবলম্বন হিসেবেই টিকে আছে। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলা নাটক ও বাংলা সংগীতের উদ্ভব, বাংলা নাটকে সংগীতের প্রভাব ও প্রয়োগ প্রসঙ্গ আলোচনার প্রয়াস থাকবে।]

দেশ কাল প্রতিবেশের ছাঁচে গড়ে ওঠা জীবিকাভিত্তিক জীবনসম্পৃক্ত সাহিত্য মানুষের সর্বপ্রকার ভাব, চিন্তা, কর্ম, আচরণ, শাস্ত্র, সমাজ, লৌকিক বিশ্বাস, সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত। ঐহিক-পারত্রিক বিষয়ে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে ধর্মভাবের উদ্বোধন, প্রচার ও প্রসার, ব্যক্তি ও সমাজের জাগতিক কল্যাণ কামনা প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। তাই বলা যায় বাংলা সাহিত্য হলো লোক সমাজের প্রচলিত ব্রতকথা, শাস্ত্রকথা, লোকবিশ্বাস, আচার, সংস্কার, লোককাম্য, আদর্শ, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির গণবোধ্য হৃদয়বেদ্য সাহিত্যায়ন বা শিল্পায়ন। সাহিত্যের আধুনিক সংজ্ঞায় বাংলা সাহিত্যের সংজ্ঞায়ন তাই সম্ভব নয়। এ সাহিত্য উদ্ভবলগ্ন থেকেই আঙ্গিকে, ছন্দে, বিষয়ে, বক্তব্যে, লক্ষ্যে ও পরিবেশনায় স্বতন্ত্র। এরূপ প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ শাখা সংগীত ও নাট্য সাহিত্যের উৎপত্তি ক্রমবিকাশ, রূপ-রূপান্তর ও আঙ্গিকের বিষয়টি পরিদৃশ্যমান। সংগীতের ভিতর দিয়ে বাঙালির বহুমুখী সৃজনশীলতার যে বিস্তৃত রূপ পরিদৃশ্যমান, তা সুদীর্ঘকাল ধরে সুবৃহৎ প্রেক্ষাপটে বৈচিত্র্যপূর্ণ উপায়ে বিকাশ লাভ করেছে এবং অবশ্যই তা উপাখ্যান, কাব্য, নাট্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মুখ্য অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে সূচনালগ্নেই তা বিশেষ কোনো মাধ্যম পরিগ্রহ করেনি। প্রাথমিক পর্যায়ে তা ছিল মূলত কাব্য, যা সুর সহযোগে গীত হতো। তাই বাংলা নাটকে সংগীতের প্রয়োগ প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে বাংলা নাটক ও বাংলা সংগীতের উদ্ভব ইতিহাস অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যেহেতু বাংলা নাটক ও সংগীত কোনো নির্দিষ্ট স্থান, কাল বা ঘটনা বা বিষয়কে অবলম্বন করে গড়ে ওঠেনি, সেজন্য এর কোনো সুনির্দিষ্ট ইতিহাস বা

* প্রভাষক, রবীন্দ্র অধ্যয়ন বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

ধারাবাহিকতা আছে বলে মনে হয় না। সংগত কারণেই বাংলা নাটক ও সংগীতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিষয়টির অন্বেষণে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক উল্লেখ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলা যায়। এক্ষেত্রে বাংলা নাটক ও সংগীতের উৎপত্তি অন্বেষণের সমান্তরালে বিশ্ব নাটক ও সংগীতের উৎপত্তির প্রাসঙ্গিকতাও পরিলক্ষিত হয়েছে। নাটকে সংগীত প্রসঙ্গটি মানব সভ্যতার উদ্ভব প্রসঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত, তাই নাট্যের ও সংগীতের উৎপত্তি অনুসন্ধানকালে মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনাও জরুরি। বিশ্ব সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের সাথে ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তৃতির ধারাটি লক্ষণীয়। প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতা, মিসরীয় সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা, মায়া, আজটেক, ইনকা প্রভৃতি সভ্যতার পাশাপাশি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা তথা সিন্ধু সভ্যতার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। প্রাচীন মানবের প্রাগৈতিহাসিক কালের জীবনায়নে ক্রমপ্রসারণ ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রকৃত মানব সভ্যতা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছিল। তাই আদিম শিকার যুগের অরণ্যচারী জীবনায়নের দৃশ্যপটে মানবের সংস্কৃতির অস্তিত্ব অনুমান করা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞের ধারণা– 'সর্ব প্রথম মানুষ তার পরিবর্তনক্ষম দেহ ও কণ্ঠস্বর নিয়ে পশু-পক্ষীর অনুকরণ করেছিলো' (গীতাসেন, ১৯৭৫ : ৪)। অর্থাৎ মানবের আদি প্রচেষ্টায় অনুকরণের বিষয়টি ছিল মুখ্য। হোক সে পশু-পাখির শারীরিক অঙ্গভঙ্গির অনুকরণ বা কণ্ঠের। প্রাচীন মানুষের অর্থদ্যোতক দেহভঙ্গিমা তার মূর্তি বা প্রতীকভাবনা চিত্রের, ভাস্কর্যে ও সবার আগে দেহের পেশিতে, কণ্ঠ, মাথা, ঘাড়, বুক, কাঁধ, হাত, কোমর ও পায়ের নানান ভঙ্গিতে রূপায়িত হয়েছিল (সেলিম, ১৯৮৯ : ২৪)। আদি মানবের অনুকরণের প্রয়াস থেকেই বিশ্ব নাট্য ও সংগীতের উদ্ভব বলে ধারণা করা হয়। সে বিবেচনা নাট্য ও সংগীতের উদ্ভব-পুরাণ অভিন্ন। যদিও সাহিত্যের এই দুই ধারা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও স্বাধীন পরিণতি ঘটিয়ে এদেশের স্বকীয়তা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকারগণ নাটকের পরিণতি লাভের কারণ হিসেবে যে তিনটি ধাপ বা স্তর অতিক্রমের কথা বলেছেন, তন্মধ্যে তৃতীয়টি নাট্য, যা নৃত্য-গীত সহ বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় (মন্মথমোহন, ১৯৫৯ : ৩)। তবে উৎপত্তির আদিকাল থেকে অদ্যাবধি বাংলা নাটকের নাট্যিক উপাদানের বিবর্তন ও ক্রমবিবর্তনের ধারাটি অব্যাহত থাকলেও নৃত্য ও গীত (সংগীত) প্রাচীন ও মধ্যযুগ অতিক্রম করে আজও বাংলা নাটকের মুখ্য অবলম্বন হিসেবে টিকে আছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের রচনানিবহে উল্লিখিত সংগীতের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তা কাব্য ও নাট্যের অদ্বৈত আধার রূপেই বিবেচিত। আচার্য অভিনবগুপ্ত রচিত *অভিনবভারতী* গ্রন্থে *নৃত্যাত্মক প্রবন্ধ* নামক এক ধরনের নাট্যাভিনয় সম্পর্কে জানা যায়, যা সংগীত ও নৃত্য সহযোগে মঞ্চস্থ হতো (জামিল, ২০০০ : ৪৯৮–৪৯৯)। এরূপ প্রেক্ষাপটে বাংলা নাটকের বেশ কিছু প্রকরণের প্রসঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষ, যেমন– কাব্য, চিত্ররাগ কাব্য, রাসক, ভানি প্রভৃতি– এসবই স্পষ্টত বাংলার কথানাট্য ও নাটগীত শ্রেণিভুক্ত, যেখানে সংগীতের রয়েছে প্রধান ভূমিকা। কিন্তু তা কাব্য ও নাট্যের অদ্বৈত আধার রূপেই বিবেচ্য। বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রাচীন বাংলা কখনো আর্য-সংস্কৃত নাট্যকলার মূলধারা অনুসরণ করেনি (জামিল, ২০০০ : ৪৯৮–৪৯৯)। এই মতের সমর্থন মেলে ভরত মুণি রচিত 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থসহ পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য ও নাট্যভাষ্যকারদের বর্ণনায়, যেমন– বিশ্বনাথ (সাহিত্য দর্পণ), ধণিকা (দশ রূপক অবলোক), সারদা তানাইয়া (ভার প্রকাশন) প্রমুখ। এরূপ প্রেক্ষাপটে বলা যায়, বাংলা নাটক সংগীত সহযোগে পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করেছিল যেখানে আখ্যানের কাহিনি দর্শক সম্মুখে পরিবেশনের ক্ষেত্রে সংলাপের সহযোগী রূপে

সংগীতের ব্যবহার লক্ষণীয়। বাংলা নাটকের পরিবেশনায় সংগীতের প্রয়োগ ও ব্যবহার এ প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

বাংলা গান বলতে সাধারণ অর্থে বাংলা ভাষায় রচিত গানকেই বোঝানো হয়। সে অর্থে *চর্যাপদ*কে কেবল বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শনই নয় চর্যায় উল্লেখ্য পদগুলো প্রথম বাংলা গীত, যা *চর্যাগীতি* নামেই অধিক পরিচিত। *চর্যাগীতি*র পরিবেশনা সম্পর্কে ধারণা করা হয়, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিশেষ পোশাক পরিধান করে এ ধরনের নৃত্যগীত পরিবেশন করতেন। এ মতের সমর্থন মেলে কাহ্নপা রচিত একটি পদে–

তাণ্ডি বিকণআ ডোম্বি না চাঙ্গেড়া

তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া ॥ (শশিভূষণ, ১৩৭১ : ১২০)

অর্থাৎ, কাহ্নপা বলেছেন– ওগো ডোম্বি, তুমি অবিদ্যারূপ তন্ত্রী এবং চাঙ্গারীরূপ বিষয়াভ্যাস বিক্রয় ও পরিত্যাগ করে থাক। অতএব তোমার জন্য আমি এই সংসাররূপ নটপেটিকা বা অভিনেতাদের পোশাক-পরিচ্ছদ রাখার বাক্সটি ত্যাগ করলাম। উল্লিখিত পদে নটপেটিকা শব্দের প্রয়োগ থেকে ধারণা করা হয় যে, চর্যাকালীন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা চরিত্র অনুযায়ী পোশাক পরিধান করতেন যেগুলো নটপেটিকায় সংরক্ষণ করা হতো এবং এ ধরনের পোশাক পরিধান করে তারা নির্দিষ্ট কোনো ঘটনা নৃত্য-গীত সহযোগে দর্শক সম্মুখে উপস্থাপন করতেন। চর্যা পরবর্তী সময়ের নাথ-গীতি, গীতগোবিন্দ, অষ্টপদী গান, কৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলগান, নামকীর্তন, পদাবলি কীর্তন ও অন্যান্য ভক্তিমূলক অভিজাত গানের পরিবেশনার সাথে *চর্যাগীতি* পরিবেশনের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় (প্রজ্ঞানন্দ, ১৯৭০ : ২৮)। অর্থাৎ *চর্যাগীতি*র অনুপ্রেরণাই চর্যাপরবর্তীকালে অন্যান্য গীতশ্রেণির পাথেয় রূপে স্বীকৃত হয়েছিল। *চর্যাপদ*এর ১৭ সংখ্যক চর্যায় উল্লেখ আছে–

নাচণ্ডি বাজিল গাণ্ডি দেবী

বুদ্ধ নাটক বিসমা হে ভই ॥ (Shahidullah, 1966 : 30)

উপর্যুক্ত পদ থেকে জানা যায়, *চর্যাপদ*-এ বর্ণিত বুদ্ধ নাটক নৃত্য-গীত সহযোগে পরিবেশিত হতো। এতে নারী-পুরুষের মিলিত অংশগ্রহণের কথা জানা যায় *চর্যাপদ*-এর ১০ সংখ্যক চর্যা পাঠে। উক্ত চর্যায় নৃত্যপটিয়সী ডোম্বীর নৃত্য-গীত সহযোগে নাট্য উপস্থাপনের কথার উল্লেখ রয়েছে (লায়লা, ২০১৮ : ৩১)। পরবর্তী সময়ে *নাথগীতিকা*র পরিবেশনায় একই পরিবেশনা রীতির প্রয়োগের কথা জানা যায়।

নাথ পরম্পরার প্রধান গুরু গোরক্ষনাথকে নিয়ে রচিত *গোরক্ষবিজয়* নাথগীতিকার অন্যতম একটি উদাহরণ। *গোরক্ষবিজয়* এর পরিবেশনা সম্পর্কে জানা যায়, তা কেবল ছড়ার আকারে বা পাঁচালির মতো খানিকটা সুর সহযোগে গীত হতো এবং *চর্যাগীতি*র চেয়ে *নাথগীতি*র গায়নপদ্ধতি ছিল সরল (করুণাময়, ১৯৯৩ : ২১–২৩)। কেননা, চর্যার মতো সুবিন্যস্ত ও সুনির্ধারিত প্রবন্ধগীতিতুল্য গায়ন *নাথগীতি*তে প্রযুক্ত ছিল না।

জয়দেব রচিত *গীতগোবিন্দ*'র পরিবেশনা রীতি সম্পর্কে জানা যায় যে, রাজা লক্ষণ সেনের সভায় জয়দেব স্বয়ং *গীতগোবিন্দ* কাহিনি গেয়ে শোনাতেন এবং জয়দেব পত্নী পদ্মাবতী অঙ্গভঙ্গি সমেত তা দর্শক সম্মুখে উপস্থাপন করতেন। অর্থাৎ *গীতগোবিন্দ*'র কাহিনি আসরে গীত হতো। এই একই ধারাবাহিকতায় চণ্ডীদাস রচনা করেছিলেন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। বিশেষজ্ঞের

ধারণা– 'এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরিবেশনায় প্রথম উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গানের মাধ্যমে নাট্য কাহিনিকে এগিয়ে নেয়ার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়' (করুণাময়, ১৯৯৩ : ৩৪–৩৬)। অর্থাৎ, *চর্যাগীতিকা*র পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সুনির্দিষ্ট গায়নরীতি সমেত বাংলা নাটকের সংগীতের যে ধারার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়, *নাথগীতিকায়* এসে তা সরল রূপ ধারণ করে এবং পরবর্তী সময়ে *গীতগোবিন্দ* এবং আরও পরে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* এসে তা উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক কথকতায় রূপান্তরিত হয়, যার উপস্থাপনের মাধ্যম সুর বা গীত। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলেছেন– 'গানের যে একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য, একটি পরিণতি তাহা এদেশে (বঙ্গদেশে) স্থান পায়নি। কাব্য (নাট্য)-কে অন্তরের মধ্যে ভালো করিয়া ধ্বনিত করিয়া তুলিবার জন্যই এদেশে সংগীতের অবতারণা হয়েছিল' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩২ : ২৯৫)। বাংলা গানের উদ্ভব-পুরাণ পর্যালোচনা করে জানা যায়, অতীতে *চণ্ডীমঙ্গল*, *মনসামঙ্গল* এমনকি *অন্নদামঙ্গল*-এর মতো বৃহদায়তন নাট্যও সুর সহযোগে সর্বসাধারণের সামনে উপস্থাপিত হতো। এমনকি বৈষ্ণব কবিদের রচিত পদসমূহও কেবল উপস্থাপনের অনুষঙ্গ হিসেবে গীতকে অবলম্বন করেছিল বলে অনুমেয় (করুণাময়, ১৯৯৩ : ৩)। অর্থাৎ রচনালগ্নে নাট্যকার নাট্যই রচনা করেছিলেন তবে সে নাট্যকাহিনি সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছানোর বাহন ছিল গীত। এই সুর ও কথকতার যুগল মন্থনেই তৈরি হয়েছিল বঙ্গীয় নাট্য ও সংগীতের প্রাথমিক যাত্রাপথ।

জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*'র দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে রাধা-কৃষ্ণ লীলাকাহিনি ও শ্রীচৈতন্যর জীবন অবলম্বনে বাংলায় যে বিপুল পরিমাণ পদ রচিত হয়েছিল, তা পদাবলি নামেই অধিক পরিচিত। ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রে এই 'পদ' শব্দ দ্বারা গান বা গীতকেই বোঝানো হয়েছে। আবার মহাকাব্য *রামায়ণ*, *মহাভারত*েও 'পদ' শব্দ দ্বারা গানকেই সুনির্দিষ্ট করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত পুরাণ সাহিত্যেও গান অর্থে 'পদ' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষজ্ঞের মতে– 'কবি জয়দেব গানের সমার্থক রূপে পদ শব্দটিকে প্রথম ব্যবহার করেন' (সুকুমার, ১৯৭০ : ৩৯৬)। পদাবলির পরিবেশনা সম্পর্কে *চৈতন্য ভাগবতে* উল্লেখ আছে–

শিষ্যগণ বলেন, কেমন সংকীর্তন।
আপন শিখায় প্রভু শচীন নন্দন ॥
... ...
দিশা শিখায়েন প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপন কীর্তন করে শিষ্যগণ লইয়া ॥

উল্লিখিত পদ থেকে ধারণা করা হয়, পদাবলিতে শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনি বা আখ্যান ভক্ত বা দর্শকদের সম্মুখে উপস্থাপনের মাধ্যম ছিল গীত– যা তাল-লয় সহযোগে গায়েন-দোহার কর্তৃক গীত হতো।

বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের শাক্ত দেব-দেবীর মাহাত্ম্যসূচক এক শ্রেণির আখ্যায়িকা প্রচলিত হবার কথা জানা যায়। সুর সমেত গীত আকারে তা পরিবেশিত হতো– বিধায় এই শ্রেণির আখ্যায়িকা তৎকালে মঙ্গল গান বলে জনসাধারণের মাঝে পরিচিত হয়ে ওঠে, যা পরবর্তী সময়ে বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রথমে মঙ্গলকাব্য ও আরও পরে মঙ্গলনাট হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলা সাহিত্যের আদি মধ্যযুগের ইতিহাস ও সাহিত্যের বিবর্তনের ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, *চর্যাপদ* থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্য পর্যন্ত সকল রচনাই

রচনাকালে ছিল আখ্যান অর্থাৎ রচয়িতা কোনো কাহিনি বা আখ্যান রচনা করেছিলেন দর্শক বা ভক্ত সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য। কিছু গীত সহযোগে তা উপস্থাপিত হওয়ায় প্রাথমিক বিবেচনায় জনসাধারণের কাছে তা গান হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে; যেমন *চর্যাপদ*কে আদিতে বলা হতো *চর্যাগীতিকা* আর *মঙ্গলকাব্য* পরিচিত ছিল *মঙ্গলগান* হিসেবে। একই ধারাবাহিকতায় ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের বর্তমান সময়ে প্রচলিত বেশকিছু আঙ্গিক রয়েছে যেগুলো পরিপূর্ণভাবে নাট্যগুণসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও নাট্য ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ক্রমাগত গীত নামেই পরিচিতি পেয়ে এসেছে; যেমন, নাথগীতিকা, কুশান গান, যুগীর গান, মাদার পীরের গান, ভোজপুরী গান, পদ্মাপুরাণ গান, কান্দনী বিষহরীর গান, মানিক পীরের গান, কিচ্ছা গান, নছিমন গান, যাত্রা গান, ভাসান গান প্রভৃতি। উল্লিখিত নাট্য আঙ্গিকগুলোর পরিবেশনাদৃষ্টে লক্ষ করা যায় তা নাট্যের শিল্পশর্ত পরিপূর্ণভাবেই পূরণ করেছে। কিন্তু মূলত আখ্যান শুরু হয় গীত সহযোগে এবং আখ্যান শেষও হয় গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এমনকি আখ্যানস্থিত অধিকাংশ ঘটনা গীত সহযোগে উপস্থাপিত হয়। যেখানে গীতকে আখ্যান থেকে পৃথক করলে গীত ও আখ্যান উভয়ই শিল্পগুণ হারায়।

অতি প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি বাংলা নাটক ও সংগীতে যে অবিচ্ছেদ্য ধারা এদেশে প্রবহমান, অঞ্চলভেদে তার রূপ ভিন্ন হলেও বিশেষ কিছু শিল্পশর্তে তা অভিন্ন। সহস্র বছরের এই নাট্য ইতিহাসের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে এদেশের সাধারণ মানুষের জীবনাভিজ্ঞতা-উৎসব-পার্বণ উদ্‌যাপন, জীবন সংকট মোকাবেলা, রোগ থেকে আরোগ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা, সন্তান কামনা, বাসনা, লৌকিক দেবী বা পির পিরালির মাহাত্ম্য প্রকাশের ইচ্ছা প্রভৃতি। সহস্র বছর আগেই মনুষ্য জীবন-অভিজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যম হিসেবে নাট্য পরিবেশনের ধারা শুরু হয়েছিল যা কখনোই নিরবলম্ব ছিল না। এ ধারার মূল অবলম্বন ছিল গীত। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন *চর্যাপদে*– 'নাচণ্ডি বাজিল গাণ্ডি দেবী/ বুদ্ধ নাটক বিসমা হে ভই' এই বাণীবাক্য সে-কথারই আভাস দেয়।

সহায়কপঞ্জি

করুণাময় গোস্বামী (১৯৯৩)। *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রথম খণ্ড। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

গীতাসেন গুপ্ত (১৯৭৫)। *বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক জিজ্ঞাসা*। জিজ্ঞাসা প্রকাশন, কলকাতা।

জামিল আহমেদ (২০০০)। 'নাটক ও নাট্যকলা'। *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪–১৯৭১*। সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

মন্মথমোহন বসু (১৯৫৯)। *বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৩২)। *সংগীত চিন্তা*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

লায়লা ফেরদৌস হিমেল (২০১৮)। *ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য আলকাপে সংগীত ও নৃত্যের প্রয়োগশৈলী*। আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

শশিভূষণ দাশ গুপ্ত (১৩৭১)। *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*। আনন্দ পাবলিসার্স, কলকাতা।

সুকুমার সেন (১৯৭০)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড। পূর্বার্ধি, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সেলিম আল দীন অনূ. (১৯৮৯)। *নন্দীকেশ্বরের অভিনয় দর্পণ*। কথা প্রকাশন, ঢাকা।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (১৯৭০)। *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা।

Muhammad Shahidullah (1966). *Buddhist Mystic Songs* (Revised and enlarged edition). Bangla Academy, Dhaka.

সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ

মো. রাফাত আলম মিশু*

[সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রকবিতার মহাসরণিতে পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের অবস্থান স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের পূর্ণতাপ্রাপ্তির উৎসবিন্দুও এই বাংলাদেশ। কেবল উপাদান হিসেবে বাংলাদেশ রবীন্দ্রকবিতায় জায়গা করে নেয়নি, বরং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবি হয়ে ওঠার দার্শনিক ভিত্তিটিও নির্মিত হয় এই বাংলাদেশের মাটি-জল-হাওয়ায়। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষ রবীন্দ্রমননে জন্ম দিয়েছিল বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতির বোধ। নদীবিধৌত বাংলাদেশে অবস্থান রবীন্দ্রসৃজনের দিকনির্দেশক অনুষঙ্গ। এই সময়পর্বে রচিত তিন প্রধান কাব্যগ্রন্থ *সোনার তরী*, *চিত্রা*, *চৈতালি*সহ আরও কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের কবিতাপাঠের ফলে সেই গুরুত্বের দিকটি অনুভব করা যায়। কবিতার বিষয়নির্বাচন, প্রকরণগত নিরীক্ষা কিংবা তাত্ত্বিক রূপান্তরের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের প্রকৃতি, মানুষ ও জীবনচেতনার সবিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই তিন কাব্যগ্রন্থ পাঠ ও পর্যালোচনা রবীন্দ্রকবিতায় বাংলাদেশের গুরুত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে পরিচিহ্নিত করে।]

রবীন্দ্রজীবনে ও রবীন্দ্রসৃজনে পূর্ববঙ্গ বলে যাকে চিহ্নিত করা হয়, তা-ই বর্তমানের বাংলাদেশ। রবীন্দ্রসৃজনে 'বাংলাদেশ' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রপাঠক উভয়ের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ ক্রিয়াশীল থাকে না; কিন্তু এই জনাঞ্চলের ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। একাধিক স্থানে রবীন্দ্র-উচ্চারণে এই জনাঞ্চলকে বাংলাদেশ বলে সম্বোধন সেই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়কে সুচিহ্নিত করে। বাংলাদেশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১–১৯৪১) পরম আত্মীয়তা সম্পর্ক ঘোষিত হয়েছে তাঁর রচিত অনেক গানে, গল্পে ও কবিতায়। উনিশ শতকের শেষ দশকে (১৮৯১–১৯০০) বাংলাদেশের শিলাইদহ-সাজাদপুর (শাহজাদপুর)-পতিসরে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান মূলত জমিদারি তদারকিসূত্রে, কিন্তু বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ অল্পকালের মধ্যেই হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীনতার তীর্থভূমি। তাঁর প্রথম জীবনের বেদ-উপনিষদ পরিস্রুত অভিজ্ঞান বাংলাদেশের সংগ্রামশীল মানুষময় উর্বর জমিনে পায় পূর্ণতা। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির কলকাতা শহরে যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জোরদার, রবীন্দ্রনাথ তখন এই নদীময় বাংলাদেশে উদার প্রকৃতি ও প্রাকৃত মানুষের আশ্রয়ে খুঁজে পান জাতীয়তা-অতিক্রান্ত বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবকে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ তাঁকে মুক্তি দেয় কলকাতার ইট-কাঠ-পাথরের সংকীর্ণতা থেকে :

> দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর
> লও যত লৌহ লোষ্ট কাষ্ঠ ও প্রস্তর
> হে নবসভ্যতা! ('সভ্যতার প্রতি', *চৈতালি*)

কারণ নগর কলকাতা তিলোত্তমা হলেও তা যে ঔপনিবেশিক পৃষ্ঠপোষকতা ও দানের নির্মাণ, তা ঔপনিবেশিকতার স্বর্ণযুগে জন্ম নেওয়া রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ফলে বাংলাদেশ-পর্বের কাব্যসৃজনে নগরসভ্যতাবিমুখতা ও প্রকৃতির সান্নিধ্যসন্ধানের পেছনে কবির বি-ঔপনিবেশিক মনন ক্রিয়াশীল ছিল বলে ধারণা করা যায়।

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রবীন্দ্রসৃজনে পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের অবস্থান ও প্রভাব তাই সুদূরপ্রসারী। অপরাপর সৃজনের মতো কবিতাতেও এর প্রকাশ প্রত্যক্ষ ও সবচেয়ে বেশি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কবি রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিতে অঙ্কিত বাংলাদেশ কত রূপে আবির্ভূত হয়েছে ও রবীন্দ্রজীবনে এর প্রভাবের স্বরূপটি কী, তা জানবার প্রধান মাধ্যম রবীন্দ্র-কবিতাপাঠ। রবীন্দ্র-কবিতাপাঠে পাঠককে বিচিত্র অনুষঙ্গ, তত্ত্ব, মতবাদ ও প্রাকরণিক পরিচর্যা মাথায় রাখতে হয় বটে, কিন্তু স্বয়ং বাংলাদেশ বিবেচিত হতে পারে রবীন্দ্রকবিতার স্বতন্ত্র অনুষঙ্গ হিসেবে। বর্তমান আলোচনায় 'বাংলাদেশ-পর্বে' রচিত তিন কাব্য *সোনার তরী*, *চিত্রা* (১৮৯৬), *চৈতালি* (১৮৯৬) ও সংশ্লিষ্ট আরও কিছু কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাদেশ'কে অনুসন্ধান ও অনুধাবন করার প্রয়াস গ্রহণ করা হবে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বাংলাদেশ এসেছে সামূহিক শিল্পচেতনা নিয়ে। বাংলাদেশ রবীন্দ্রমানসে এক নতুন জগৎ, বিশ্বজনীনতার উৎস। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যেই তিনি প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করেন বিশ্বমানব, নদীময় প্রকৃতির ভেতর খুঁজে পান বিশ্বপ্রকৃতিকে। *ছিন্নপত্রে* (১৯১২) রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশের প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মানসিক ও আত্মিক (রবীন্দ্রনাথ, ১৪২২ : ২২৬)। তাঁর কাছে বাংলাদেশের গ্রামপ্রকৃতি ও নদীময় প্রকৃতি ছিল বহু-কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু অজানিত। নগরাশ্রিত জীবন থেকে গ্রামাশ্রিত জীবনে রবীন্দ্রনাথের আগমন অবনমন তো নয়ই, রবীন্দ্রমানসের বড় ধরনের উত্তরণ। রবীন্দ্রতাত্ত্বিক প্রমথনাথ বিশী এ-প্রসঙ্গে বলেন :

> কলকাতায় বসে এ বাংলাদেশকে দেখতে পাওয়া যায় না। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। ধীরে ধীরে কবির মনে বাংলাদেশ ও বাঙালী সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানের ভিত্তি প্রশস্ত হতে থাকে। (প্রমথনাথ, ১৪১৫ : ৪২)

রবীন্দ্রনাথের সৃজন-অভিযাত্রায় বাংলাদেশ সেই মুহূর্ত, যা রবীন্দ্রমানসকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করে ফেলে : একদিকে প্রাক্-পূর্ববঙ্গ; অন্যদিকে বাকি সমস্ত জীবন ও সৃজন। বাংলাদেশ যে রবীন্দ্রসৃষ্টির প্রধান আশ্রয়, এ-বিষয়ে এখন কেউ আর সন্দিগ্ধ নন :

> বাংলাদেশের হৃদয়ের ভেতরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর জীবনে 'বাংলাদেশ' অধ্যায় সাহিত্যসৃষ্টির বিচারে রত্নগর্ভা হয়ে আছে। অজস্র সোনালি ফসলে পূর্ণ এ অধ্যায়। ... 'বাংলাদেশে' না এলে, রবীন্দ্রনাথ এখন যেমন বাঙালির এবং বিশ্বমানবের পূর্ণাঙ্গ, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সার্বভৌম সাহিত্যস্রষ্টা, তা হতেন কিনা বা হলেও তার ধরনটা কেমন হতো তা অনুমান করা কঠিন। (শামসুজ্জামান, ১৪১৮ : ১২১)

একই প্রসঙ্গে আরও একজন রবীন্দ্রগবেষকের মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে :

> পদ্মাপ্রবাহবিধৌত পূর্ববঙ্গের উদার প্রকৃতি এবং বৃহৎ মানবসংসারে দ্বার যখন তাঁর কাছে অবারিত হয়, আত্মীয়তা স্থাপিত হয় চলমান জীবনের সঙ্গে, তখন স্বভাবতই তাঁর নয়নের সামনে থেকে বহুকালের পুঞ্জীভূত অন্ধকার ঘুচে গেলো। অতঃপর দু-একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত, যেখানেই তিনি দৃষ্টিপাত করেছেন, সেখানেই ফুটে উঠেছে আলোর অমলকমলখানি। (মুরশিদ, ১৯৮১ : ১০১)

বাংলাদেশের সঙ্গে রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসার সম্পর্ক। তাই তো রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয় : 'পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণে এবং গভীর ভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪২২ : ৮৯)। সরল প্রকৃতির সরল জীবনায়নে প্রকাশের ধরনেও লক্ষ করা যায় সহজিয়া রূপ।

রবীন্দ্রকবিতায় বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি *সোনার তরী* থেকে। এরপর *চিত্রা*, *চৈতালি*, *ক্ষণিকার* (১৯০০) শরীর ছুঁয়ে পুরো রবীন্দ্রজীবনেই সমুজ্জ্বল হয়ে থাকে বাংলাদেশের বোধ ও নির্যাস। *সোনার তরী*র বহুলপঠিত নামকবিতা 'সোনার তরী'র রয়েছে নানা দার্শনিক ব্যাখ্যা। এর জন্য কিয়দংশে রবীন্দ্রনাথ নিজেই দায়ী। এই কবিতার ব্যাখ্যা তিনি অন্তত তিনবার তিনভাবে দিয়েছেন। কবিতা রচনার পনেরো বছর পর (১৩১৩) বীরেশ্বর গোস্বামীকে লেখা চিঠিতে, সতেরো বছর পর (১৩১৫) 'তরী বোঝাই' শীর্ষক ভাষণে এবং একচল্লিশ বছর পর (১৩৩৯) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে 'সোনার তরী'র ব্যাখ্যা প্রদান করেন রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১১ : ১৬৯–১৭১)। দীর্ঘদিন ছাত্রপাঠ্য থাকার কারণে রবীন্দ্রনাথের প্রথমোক্ত চিঠির ব্যাখ্যাই 'সোনার তরী'র সঙ্গে সেঁটে আছে। শেষোক্ত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন : "আমার মনে 'সোনার তরী'র যে ইতিহাসটা সত্য হয়ে আছে সেটা হচ্ছে সেই শ্রাবণ-দিনের ইতিহাস"। তাই গুরুতর তত্ত্বতালাশ না করে যদি এই কবিতায় নিখাদ একটি প্রকৃতিচিত্রকে অনুভব করা যায় ইন্দ্রিয়ানুভূতির সর্বোচ্চ ব্যবহারে, তার মূল্যও কম নয়। 'সোনার তরী'র এই অংশটি যখন পড়া হয় :

একখানি ছোটো খেত, আমি একলা,
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা–
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা। ('সোনার তরী', *সোনার তরী*)

তখন অন্য সবকিছু বাদ দিলেও বর্ষাস্নাত গাঢ় রঙের একটি গ্রামচিত্রের অঙ্কন দেখতে পাওয়া যায়। এবং এই গ্রাম বাংলাদেশের গ্রাম। এই চিত্রাঙ্কন বাংলাদেশ ছাড়া অন্যত্র সম্ভব নয়। ফলে 'সোনার তরী' কবিতায় বাংলাদেশকে অনুভব করা দুর্লক্ষ্য নয়। কেবল রবীন্দ্রকবিতার উপাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বাংলাদেশ, সামূহিক ও বিচিত্রমাত্রিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি নিয়ে সে কবিতাকে দিয়েছে নতুন পথের সন্ধান, নতুন ভাবনার খোরাক। *মানসী*-পর্বের (১৮৯০) সুদূরের পিয়াসি রবীন্দ্রমানস *সোনার তরী*তে এসে খুঁজে পেলো বাস্তবের মাটি ও জল– 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'। *মানসী*তে যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কল্পলোকের কবি, মানসরাজ্যে প্রতিমা গড়তে ব্যস্ত কবি বাংলাদেশের জলজ হাওয়া ও কর্মচঞ্চল্যের অনুষঙ্গে তিনি পেয়ে যান তাঁর মানসসুন্দরীকে। এই মানসসুন্দরী আর দূরবর্তী কেউ থাকে না, সে যেন অতিচেনা, পৃথিবীর মনুষ্যরূপী। কবির আকাঙ্ক্ষাতেও মানসসুন্দরীর কাছে তাঁর মর্ত্যপ্রীতি ও মানবনিষ্ঠা জেগে ওঠে :

মানসীরূপিনী ও গো বাসনাবাসিনী,
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমি কি গো মূর্তিমতি হয়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী? ('মানসসুন্দরী', *সোনার তরী*)

এছাড়াও এ-কাব্যে যেখানে প্রত্যক্ষত বাংলাদেশ নেই, সেখানেও আছে বাংলাদেশের ভাবনির্যাস। 'দুই পাখি' কবিতায় রূপকের আধারে কবির কলকাতা ও পূর্ববঙ্গ– এই দুই সত্তার দ্বৈরথ অনুভব করা যায়। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার শুরুতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দিচ্ছেন এ-কবিতা

লিখেছেন 'পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া', তা সত্ত্বেও এ-বিশ্বজনীন বোধ যে বাংলাদেশ-উৎসারিত তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর *ছিন্নপত্রের* অমলিন পত্রগুচ্ছে। পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন বলেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন 'বসুন্ধরা' কবিতা, বসুন্ধরাকে সম্বোধন করতে পেরেছিলেন জননী বলে, বলতে পেরেছিলেন :

ইচ্ছা করে, বারবার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে। ('বসুন্ধরা', *সোনার তরী*)

বাংলাদেশের বিশ্বপ্রকৃতিই তাকে করেছে আদিপ্রাণোৎসসন্ধানী। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য :

> কবি মর্তপ্রীতি ও মর্মস্পর্শী আবেদন এবং গভীরতম বিজড়নে *সোনার তরী*তে বসুন্ধরাকে আঁকড়ে ধরেছেন। এত নিবিড় সবল মর্তচেতনায় অভিভূত হয়েছেন যে, বলতেই হয় রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রাণকে, প্রাণময় পৃথিবীকে প্রবল সত্য হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। ... গ্রামবাংলার উদার কর্মময় জীবনচাঞ্চল্য ও প্রকৃতির প্রবহমান সৃষ্টিলীলার পাদপীঠে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন এক প্রাণচঞ্চল বিশ্বজগতের ভাবসত্য। (আকতার, ২০১৯ : ১৫২)

এই জনচঞ্চল প্রকৃতিলোক রবীন্দ্রমননে তৈরি করে এক নিভৃত লোক। প্রকৃতিকে একান্ত করে দেখার ও ভাবার সুযোগ পান তিনি। তাই বাস্তব জগতের এই কাদা-মাটি-মানুষের প্রকৃতি তাকে সহজেই অবগাহন করায় অন্য কোনো লোকে। বাস্তবের প্রকৃতি থেকে তিনি যেমন ধাবিত হতে পারেন অসীমের পথে, আবার এই প্রকৃতি তাকে করে অতীতচারী; কখনও নিয়ে যায় তাঁর শৈশবসন্ধ্যায়। 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতার যে গ্রামচিত্র তা কবির চোখে দেখা সরল-সাধারণ গ্রাম, বাংলাদেশের এক নিভৃত পল্লি :

ওই যে সম্মুখে
প্রান্তরের সর্বপ্রান্তে, দক্ষিণের মুখে,
আখের খেতের পারে, কদলী সুপারি
নিবিড় বাঁশের বন, মাঝখানে তারি
বিশ্রাম করিছে গ্রাম, হোথা আঁখি ধায়।
হোথা কোন্ গৃহপানে গেয়ে চলে যায়
কোন্ রাখালের ছেলে, নাহি ভাবে কিছু,
নাহি চায় শূন্যপানে, নাহি আগুপিছু। ('শৈশবসন্ধ্যা', *সোনার তরী*)

বাংলাদেশের গ্রামচিত্রের এই সহজতা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মধুর শৈশবে ও শৈশবের স্মৃতিময় সন্ধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ-দর্শনের প্রধান অনুষঙ্গ নদী। পদ্মা-ইছামতি-গড়াই-আত্রাই-যমুনা প্রভৃতি নদী রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ-অনুধ্যানের প্রধান সঙ্গী। বাংলাদেশকে তিনি যেমন নদীপথে দেখেছেন, একইসঙ্গে এই নদীর নিজস্ব সত্তাটিও আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। নদীযাত্রায় নদী ও নদীতীরবর্তী প্রকৃতি ও মানুষ কবিসত্তাকে জারিত করেছে নতুন বোধ ও সংবেদনায়। রবীন্দ্রকবিতায় নদীপথ এসেছে তার স্বয়ংরূপ নিয়ে :

তীরেতে তরুরাজি দোলে
আকুল মর্মর-রোলে।
চিকুর চিকিমিকে
চকিয়া দিকে দিকে
তিমির চিরি যায় চলে।
তীরেতে তরুরাজি দোলে। ('নদীপথে', *সোনার তরী*)

বিশেষ বিশেষ নদী হয়ে উঠেছে কবির অর্ঘ্য নিবেদনের স্থান। *চৈতালির* 'পদ্মা', 'ইছামতী নদী' প্রভৃতি কবিতায় প্রকাশিত হয় কবির নিঃসংকোচ নিবেদন ও সমর্পণ :

হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।
একদিন জনহীন তোমার পুলিনে,
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে
সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য অস্তমান
তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরান। ('পদ্মা', *চৈতালি*)

নদীর ঋতুভিত্তিক নানা রূপ যেমন ধরা পড়ে, তেমনি কখনো বা নদীর ওপর আরোপ করেন মানবিক সত্তা, নির্মাণ করেছেন নদীর দার্শনিক ব্যাখ্যা :

বরষার ভরা নদী তৃপ্ত শিশুপ্রায়
নিস্তরঙ্গ পুষ্ট-অঙ্গ নিঃশব্দে ঘুমায়। ('নদীযাত্রা', *চৈতালি*)

নদী রবীন্দ্রমানসের প্রাণসত্তার প্রতীক। উন্মত্ত পদ্মার পাশাপাশি শান্ত ইছামতি কিংবা স্রোতস্বিনী গড়াই কোনো রূপই রবীন্দ্রদৃষ্টি এড়ায় না। তাই নদী জীবনগতির অনিবার্য অনুষঙ্গ হয়ে রবীন্দ্রকবিতায় উপস্থিত থাকে। প্রকাশিত হয় প্রিয় নদীর প্রতি কবির অকৃত্রিম শুভকামনা :

অয়ি তন্বী ইছামতী, তব তীরে তীরে
শান্তি চিরকাল থাক্ কুটিরে কুটিরে –
শস্যে পূর্ণ হোক ক্ষেত্র তব তটদেশে। ('ইছামতী নদী', *চৈতালি*)

আবার, প্রকৃতির সৌন্দর্যচিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে কবির অবচেতনে নির্মিত হয়ে যায় চিরায়ত 'কৃষ্ণ' মিথ :

ঝিলিমিলি করে পাতা, ঝিকিমিকি আলো।
আমি ভাবিতেছি কার আঁখিদুটি কালো।
কদম্বগাছের সার,
চিকন পল্লব তার
গন্ধে-ভরা অন্ধকার
হয়েছে ঘোরালো।
কারে বলিবারে চাহি কারে বাসি ভালো। ('ভরা ভাদরে', *সোনার তরী*)

*সোনার তরী*তে অঙ্কিত ছবিতে কবি ব্যবহার করেন গাঢ় ও প্রগাঢ় রং। জগৎ ও জীবনপ্রীতির উদ্বোধনের কাব্য *সোনার তরী*। রবীন্দ্র-প্রকৃতিদর্শনের প্রারম্ভিক বিন্দুটিও এই কাব্য থেকে শুরু। আর এই প্রকৃতি ও প্রকৃতিবোধ নির্মাণে বাংলাদেশের প্রকৃতির উপস্থিতি ও প্রভাবের স্বরূপ সম্পর্কে উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রসৃজনে *সোনার তরী* নানা অর্থেই বাংলাদেশের কাব্য।

*চিত্রা*র কবিতাগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য এর চিত্রময়তা, অন্তত বাংলাদেশ-দর্শনের দিক থেকে। *চিত্রায়* অধ্যাত্মানুসন্ধানের সমান্তরালে বিকশিত হতে দেখা যায় বস্তুজগতের রূপ-রস-গন্ধ। *সোনার তরী*র বিশ্বচেতন *চিত্রা*তে প্রগাঢ়; *সোনার তরী*র চিত্রবোধ এখানে আরও বাস্তব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই কাব্যদ্বয়ে রবীন্দ্রমননের বস্তুপৃথিবী নির্মাণের এই প্রবণতা প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য :

> 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' কাব্যেই তাহার জীবন নিজের মনের বস্তুহীন কল্পনার মধ্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বস্তুময় বৃহত্তর জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের রূপও এক নূতন সৌন্দর্যময় আনন্দময় রূপে কবির চোখে ধারা পড়িল; শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান সবল কল্পনা ও গভীরতর ভাবরহস্যে সমৃদ্ধিলাভ করিল। (নীহাররঞ্জন, ১৩৬৯ : ৬৩)

মানসসুন্দরীর মধ্য দিয়ে যে আকাঙ্ক্ষার কথা কবি জানান দেন *সোনার তরী*তে, তাকেই *চিত্রা*-পর্বে পেয়ে যান 'জীবনদেবতা'রূপে। এই জীবনদেবতা কবির অধিসত্তাই বটে, যা ছিল কবির বহুকাঙ্ক্ষিত। এই জীবনদেবতার উৎসারণোৎস মাটি-মানুষ ও জীবন। বস্তু-জীবনকে ছেনেই রবীন্দ্রনাথ সন্ধান পান তাঁর অধিজীবনের জীবনদেবতার। একইসঙ্গে কবির পূর্ববঙ্গকে দেখার ক্ষেত্রেও আসে নতুনত্ব। পূর্ববঙ্গ এখানে হয়েছে চিত্রবহুল, বর্ণবহুল। সেই চিত্র হয়েছে স্পষ্ট ও বাস্তবনিষ্ঠ। যেমন, 'সুখ' কবিতায় দেখা যাবে কবির প্রিয় পদ্মা নদী ও পদ্মার চলমান চিত্র। চলমানতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে দৃশ্যচিত্র অঙ্কন করেন, সেখানে ধরা পড়ে কবির চালচ্চিত্রিক পরিচর্যা :

ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে। অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে। ('সুখ', *চিত্রা*)

এই কবিতাতে আরও পাওয়া যায় জলে আকণ্ঠমগ্ন গ্রামবধূদের কৌতুকালাপ, নৌকায় বসে বৃদ্ধ জেলের জালবোনা, উলঙ্গ বালকের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সতেজ চিত্ররূপ, আম্রমুকুলের গন্ধ ও বিহঙ্গের শ্রান্ত স্বর। এসব ইন্দ্রিয়চেতনার সংযোগ ঘটছে রবীন্দ্রনাথের চলমানতার মধ্য দিয়ে। এই বাস্তবচিত্র অঙ্কনের পরপরই সুখ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করছেন :

বিশ্ববীণা হতে উঠি গানের মতন
রেখেছে নিমগ্ন করি নিথর গগন। ('সুখ, *চিত্রা*)

বাস্তবের রূপ অঙ্কন ও তৎক্ষণাৎ মানসপরিক্রমণ ও এ-দুয়ের মিথস্ক্রিয়া রবীন্দ্রসত্তার অনন্য দিক। দৈনন্দিন জীবনের আরও অনেক ইন্দ্রিয়ঘন চিত্ররূপের পরিচয় পাওয়া যাবে চিত্রার একাধিক কবিতায় :

তোমাদের বাসরকুঞ্জের বহির্দ্বারে
বসে আছি – কানে আসিতেছে বারে বারে
মৃদুমন্দ কথা, বাজিতেছে সুমধুর
রিনিঝিনি রুনুঝুনু সোনার নূপুর –
কার কেশপাশ হতে খসি পুষ্পদল
পড়িছে আমার বক্ষে, করিছে চঞ্চল
চেতনাপ্রবাহ।' ('জ্যোৎস্নারাত্রে', *চিত্রা*)

দৃশ্য ও শব্দের সমানুপাতিক অবস্থান *চিত্রা*র বৈশিষ্ট্যকে প্রোজ্জ্বল করেছে। পতিসরে অবস্থানকালে এক সন্ধ্যার রূপ কবি নিরীক্ষণ করছেন এবং পল্লিপ্রকৃতিকে বিশ্বপ্রকৃতির উপমান করে তুলছেন :

আকাশের দূরান্তরে
একে একে অন্ধকারে হতেছে বাহির

একেকটি দীপ্ত তারা, সুদূর পল্লীর
প্রদীপের মতো। ('সন্ধ্যা', *চিত্রা*)

চিত্রা-পর্বে রবীন্দ্রনাথের সুদূরের আকাঙ্ক্ষা ও যাত্রাও যেন জনজীবনলগ্ন। সৌন্দর্যতত্ত্বে যুক্ত হচ্ছে বস্তুপৃথিবীর জীবনায়ন। পৌরাণিক বোধে অনুভব করা যাচ্ছে দৃশ্যগ্রাহ্য সমকালীন জীবন ও জগৎ। তাই প্রাচীন ভারতীয় সুন্দরের প্রতিমা নন্দনবাসিনী উর্বশী নির্মাণে অনুভব করা যায় রক্তে-মাংসে গড়া মাটির পৃথিবীর নারীরূপকে; বিশ্বরূপের সমার্থক হয়েও যে একজন মানবী। রবীন্দ্রলোকে বাংলাদেশের প্রকৃতি সংসার ও অসীমতার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তৈরি করেছে এক ত্রিশঙ্কু অবস্থা। তাই কবিকে বলতে হয় :

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর,
ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়। ('এবার ফিরাও মোরে', *চিত্রা*)

মর্ত্যপ্রীতি কত প্রবল হলে কবি লিখতে পারেন 'স্বর্গ হতে বিদায়', এবং বলতে পারেন : 'স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি–' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪২২ : ৫২), তা সংবেদনশীল কবিতাপাঠকমাত্রই অনুভব করতে পারেন। জীবনের বৃহত্তর ব্যঞ্জনা নির্মাণে কবি আশ্রিত হন বাংলাদেশের প্রকৃতির ক্রোড়ে :

যৌবননদীর স্রোতে তীব্র বেগভরে
একদিন ছুটেছিনু; বসন্তপবন
উঠেছিল উচ্ছ্বসিয়া; তীরউপবন
ছেয়েছিল ফুল্ল ফুলে; ('প্রৌঢ়', *চিত্রা*)

তাই *চিত্রা*র অধিবাস্তববাদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তববাদে সমর্পিত ও সুগঠিত। কারণ *চিত্রা*র জীবনদেবতার ধারণাও নিসর্গোৎসারিত। দৃশ্যমানতার মধ্য দিয়ে বাস্তব পৃথিবীর নিসর্গলোকই সেই অধিবাস্তবিক জীবনদেবতাপ্রাপ্তির মূল শক্তির জায়গা।

পূর্ববঙ্গীয় নিসর্গলোকীয় হয়েও সর্বজনীন ব্যঞ্জনার কাব্যরূপ হয়ে ওঠে *চৈতালি*। বাংলাদেশে তথা পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রাপ্তিযোগ বাংলাদেশের মধ্যাহ্নের সৌন্দর্যসন্ধান। বাংলার প্রকৃতির মধ্যে নিস্তব্ধতা, শান্ততা ও বিপুল বৈরাগ্য নিয়ে যে দুপুর আশ্চর্য সৌন্দর্য নিয়ে প্রতিদিন আবির্ভূত হয়, তার শিল্পিত প্রকাশ প্রথম সম্পন্ন হয় রবীন্দ্রসৃজনে। *ছিন্নপত্রে*র ২৭ সংখ্যক পত্রে বাংলাদেশের দুপুরের নিজস্বতা কবির প্রশ্রয়ে যে সুন্দরতম প্রহরে পরিণত হয়, তারই কাব্যরূপ পায় 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় :

মধ্যাহ্নের অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধচ্ছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি,
মাঝখানে বসে আছি আমি পরবাসী। ('মধ্যাহ্ন', *চৈতালি*)

এই অনুভবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের প্রকৃতির জঠরে আবিষ্কার করলেন নিজের আদি জন্মস্থল। তিনি বলেন :

ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে। ('মধ্যাহ্ন', *চৈতালি*)

যদিও এর ঐতিহাসিক ও তথ্যগত সত্যতাও আছে, কিন্তু কবিসত্তার আদি জন্মস্থলের ঘোষণার কাছে ইতিহাসের প্রামাণিকতা তুচ্ছ। কবির মনোভূমিই জন্মভূমি। অন্য অর্থে বাংলাদেশের মাটি রবীন্দ্রসৃজনেরই উর্বর ভূমি।

বাংলাদেশ-পর্বের কবিতায়, বিশেষত *চৈতালি-ক্ষণিকায়* তো মানুষেরই আনাগোনা। সেই মানুষ নানা পেশার, নানা রূপের; প্রান্তিক মানুষ, সরল মানুষ, কাজের মানুষ। রবীন্দ্রপ্রকৃতিদর্শন জননিরপেক্ষ নয়। মানুষ ও নিসর্গের সমবায়ে গড়ে ওঠে রবীন্দ্রপ্রকৃতিচেতনার পূর্ণ বলয়। চাষি, জেলে, গ্রামবধূ, দুরন্ত বালক, ভৃত্য কোনো কিছুই কবির দৃষ্টি এড়ায় না। নদীতীরবর্তী একান্ত প্রাকৃতজনদের বাস্তবের মানুষরূপেই কবি তাঁর কবিতায় স্থান দিয়েছেন। ফলে রবীন্দ্রকাব্যে মানুষের উপস্থিতি নেই– এমন অভিযোগ যৌক্তিক নয়। 'দিদি' কবিতায় নদীতীরে দেখা মুহূর্তের অনুভবে বাংলাদেশের এক সাধারণ মেয়ের অসাধারণ ছবি আঁকা হয়ে যায়। 'পুঁটু' কবিতায় চৈত্রের মধ্যাহ্নের রূপাঙ্কনের মধ্যে পুঁটু-নাম্নী মহিষ-কন্যা ও মনুষ্য-যুবকের আন্তরিক সম্পর্কের ছবিটিও আঁকা হয়ে যায়। *ক্ষণিকার* 'অকালে' কবিতায় গ্রামীণ হাটের চিত্র– নৌকা হাঁকাহাঁকি, ছুটাছুটি। গ্রামীণ সরল জীবনায়নের এমন অনেক ছোট ছোট পটচিত্র জুড়ে দিয়ে নির্মিত হয় জনলোক ও প্রকৃতিঘনিষ্ঠ বাংলাদেশচিত্রের একটি কোলাজরূপ। *চৈতালি* কাব্যের শিল্পপ্রবণতা সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী বলেন :

> শ্রেণীগত হিসাবে 'চৈতালি' পূর্বের কাব্য দুখানি হইতে স্বতন্ত্র নহে – কেবল ইহা ঐ দুখানি গ্রন্থ হইতে খানিকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পূর্বে যাহা কেবল সামান্যত সত্য ছিল এখানে তাহা বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে ছিল 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি'র জন্য আকাঙ্ক্ষা, এখানে তাহার পরিচয়। (প্রমথনাথ, ১৪১০ : ৮১)

চৈতালির কবিতাগুলো বাংলাদেশের লোকায়ত রূপকে নিজের ভেতর ধারণ করে আরও বেশি প্রাণবান। একইভাবে *কল্পনার* (১৯০০) কবিতার মধ্যে মানুষের তুলনায় প্রকৃতির প্রাচুর্য বেশি। যেমন, 'শরৎ', 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'বর্ষশেষ' প্রভৃতি কবিতার যে প্রকৃতিচিত্র পাওয়া যায়, তা নিখাদ বাংলাদেশরই প্রকৃতি। *ক্ষণিকার* কবিতাগুলোতে আবার প্রকৃতি ও মানুষের সামবায়িক রূপ লক্ষণীয়। আপাত সরল শৈলীবিন্যাসের মধ্যে কবির পূর্ববাংলাকেন্দ্রিক অনুভূতির ছটা প্রকাশিত হয়েছে এই কাব্যে। শিলাইদহ অবস্থানকালে জ্যৈষ্ঠের ২০ তারিখে কবি লিখেছেন 'আষাঢ়' কবিতা : 'নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে, তিল ঠাঁই আর নাহিরে।' বর্ষার চিরায়ত সত্তাটি কবির অনুভবে বাংলাদেশের প্রকৃতির অনুষঙ্গে হয়ে ওঠে অনন্য। বাংলাদেশের প্রতিটি ঋতু স্পর্শিত হয়েছে রবীন্দ্রকাব্যবোধিতে, যেমনভাবে প্রতিটি নদী, নদীর তীর, তীরবর্তী মানুষ, মানুষের কর্ম কবির ভালোবাসার আশ্রয় ও প্রশ্রয়। আপাত সামান্যও কবির চোখে আবির্ভূত হয় অসামান্য ব্যঞ্জনা নিয়ে :

আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জনে
চকাচকীর ঘর। ('দুই তীরে', *ক্ষণিকা*)

'সোনার তরী' কবিতায় প্রাপ্তির যে অসম্পূর্ণতা ছিল তা যেন নয় বছর পরে লেখা 'যাত্রী' কবিতায় পেয়ে যায় পূর্ণতা :

আছে, আছে স্থান!
একা তুমি, তোমার শুধু
একটি আঁটি ধান
নাহয় হবে, ঘেঁষাঘেষি,
এমন কিছু নয় সে বেশি,
নাহয় কিছু ভারী হবে
আমার তরীখান –
তাই বলে কি ফরবে তুমি
আছে, আছে স্থান! ('যাত্রী', *চৈতালি*)

সরল বর্ণনা, সাধারণ গ্রামচিত্রের মধ্যে চলে কবির অসীমতা অন্বেষণ। *ক্ষণিকার* মধ্যদিয়েই রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ-পর্বের বলয়টি পূর্ণ হয়েছে।

কথা (১৯০০) ও *কাহিনী* (১৯০০) কাব্যদ্বয় এবং পরবর্তীকালের *নৈবেদ্য* (১৯০১) কাব্যে রবীন্দ্রমানসের পরিচয় দিতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রভাবের কথা বলা হয়। বিশেষ করে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ ও অনুগমন। এই মাত্রাকে গ্রহণ করে নিয়েও প্রাচীন ভারতমুখিতার পেছনে বঙ্গভূমির উদার প্রকৃতিলোক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজব্যবস্থা রবীন্দ্রমননে ক্রিয়াশীলতাকে সমর্থন করা যেতে পারে। কবির স্থানগত বা কালগত অবস্থানের চেয়ে ওই স্থান ও কালের ভাবগত ব্যাপকতা ও গভীরতা রবীন্দ্রসৃজনে বড় বিষয় হিসেবে এসেছে। এ-কারণে দেখা যায়, বাংলাদেশের স্মৃতি পূর্ববঙ্গে অবস্থানপর্বের পরেও নানা সময়ে নানা কাব্যে ও সাহিত্যে উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে থাকে। *বলাকা* (১৯১৬) কাব্যে কথিত গতিবাদের জন্য দূর-পাশ্চাত্যে না গিয়ে পদ্মার গতি থেকেই তার তত্ত্বনির্যাসটি পাওয়া যেতে পারে। *পুনশ্চের* (১৯৩২) যুগেও রবীন্দ্রমানসে পদ্মা সমুজ্জ্বল :

পদ্মা চলেছে কোথায় দূর আকাশের তলায়
মনে মনে দেখি তাকে। ('কোপাই', *পুনশ্চ*)

স্বয়ংসম্পূর্ণ নদীময় বাংলাদেশের গ্রামচিত্রের এমন অঙ্কন ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রসৃজনের সমগ্রটা জুড়ে। তাঁর জীবনের সায়াহ্নকালে (১৯৪০) *সোনার তরী* (১৮৯৪) কাব্যের সূচনাংশে তিনি লিখেছিলেন :

> বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারি নে বেগানা দেশ; তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ('সূচনা' : *সোনার তরী*)

এর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সত্তায় বাংলাদেশ যে কতটা গভীরভাবে বিরাজমান এবং এর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা কত সুনিবিড় তা-ই ঘোষিত হয়েছে। রবীন্দ্রকবিতার বাংলাদেশ-পর্বের আলোচনায় শেষ পর্যায়ে আরও একটি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। *ক্ষণিকার* 'কর্মফল' কবিতার কবি আত্মঘোষণা করেন :

পরজন্ম সত্য হলে
কী ঘটে মোর সেটা জানি –

আবার আমায় টানবে ধরে
বাংলাদেশের এ রাজধানী।
গদ্য পদ্য লিখনু ফেঁদে,
তারাই আমায় আনবে বেঁধে,
অনেক লেখায় অনেক পাতক,
সে মহাপাপ করব মোচন –
আমায় হয়তো করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন। ('কর্মফল', *ক্ষণিকা*)

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিকর্মের পাপমোচন করতে সংশয়াত্মক পরজন্মে ফিরে আসতে চাইলেন বাংলাদেশের রাজধানীতে। এই রাজধানী সুচিহ্নিত নয়; রাজধানী ঢাকা নিশ্চয়ই নয়। তবুও কবির ঘোষণার মধ্য দিয়ে পাঠকচিত্তে প্রশ্ন উঁকি দিতেই পারে, রবীন্দ্রসৃজন-অনুধ্যানের ভবিষ্যৎ তবে কি বাংলাদেশেই?

রবীন্দ্রকাব্যসৃজনে বাংলাদেশ সেই অধ্যায়, যেখানে পূর্বের অরূপতাকে রূপান্বিত করে কবি ধাবিত হয়েছেন অসীমতার দিকে। বাংলার মুক্ততা ও উদারতা তাঁকে সুযোগ করে দিয়েছে অনেককিছু বলার। অনেক অব্যক্ত হয়েছে সর্বব্যক্ত। কবিতার আকারও পেয়েছে কাঠিন্য থেকে মুক্তি। ক্রিয়াপদের প্রাকৃত ব্যবহারও এই পর্ব থেকেই লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশ রবীন্দ্রসৃজনের বাঁক-নির্ণয়ী কাল, কবির আসমান-জমিনের সংযোগস্থল, বিশ্বমানবিক অভিযাত্রার সূচনা। রবীন্দ্রকাব্য অভিসারের মিলন-পর্ব এই বাংলাদেশ, যার অনিবার্য বিরহ-ভাবসম্মিলনের সম্প্রকাশ দেখা যায় বাকি জীবনের কাব্যসাধনায়।

সহায়কপঞ্জি

গোলাম মুরশিদ (১৯৮১)। *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
নীহাররঞ্জন রায় (১৩৬৯)। *রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা*। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., কলকাতা।
প্রমথনাথ বিশী (১৪১০)। *রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা।
প্রমথনাথ বিশী (১৪১৫)। *শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা।
বেগম আকতার কামাল (২০১৯)। *রবীন্দ্রকবিতার বাতায়ন*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১১)। 'রচনাপ্রসঙ্গ', *সোনার তরী*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪২২)। *ছিন্নপত্র*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।
শামসুজ্জামান খান (১৪১৮)। 'রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ, বাংলাদেশের রবীন্দ্রনাথ'। *উত্তরাধিকার*, সম্পাদক : শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হাটিকুমবুল শিব মন্দিরের পোড়ামাটির চিত্রফলকে সাংস্কৃতিক শিল্পবোধ

মোঃ রিফাত-উর-রহমান*

[সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অবহেলিত বিষয় হলো আমাদের প্রত্নস্থানসমূহ। অতীতের শাসনব্যবস্থা, ধর্মীয় রীতি-নীতি জানার পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বোঝার ক্ষেত্রে একটি প্রত্নস্থানের ভূমিকা অপরিসীম। একটি প্রত্নস্থানে নানা ধরণের প্রত্নবস্তুর মধ্যে পোড়ামাটির চিত্রফলক অন্যতম। বাংলাদেশে পাথর কিংবা ধাতুনির্মিত প্রত্নবস্তুর চেয়ে পোড়ামাটির ফলক বেশি পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে কারণ হতে পারে যে কাঁচামাল হিসেবে মাটির সহজলভ্যতা। এই মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে অনবদ্য মৃৎশিল্প। পোড়ামাটির চিত্রফলকের অলংকরণ এবং নকশা অতীত মানুষের শিল্পবোধ, দক্ষতা এবং নান্দনিকতার বিষয়গুলো তুলে ধরতে সক্ষম। এই গবেষণায় সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার হাটিকুমবুল নামক গ্রামের শিব মন্দিরের পোড়ামাটির চিত্রফলক থেকে সেসময়ের মানুষের শিল্পবোধের পরিচয়কে জনার চেষ্টা করা হয়েছে।]

[কি ওয়ার্ডস : নবরত্ন মন্দির, শিব মন্দির, পোড়ামাটির চিত্রফলক]

পশ্চিমা বিশ্ব তাদের প্রাচীন স্থাপনাকে যেভাবে যত্নসহকারে সংরক্ষণ এবং পুনরায়ন করে থাকে আমরা এখনো আমাদের অতীতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সেভাবে সংরক্ষণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারিনি কারণ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার বয়স খুব বেশি নয়। প্রত্নবস্তু কিংবা প্রত্নস্থান নিয়ে একটা বড় ধরণের সামাজিক সচেতনতা আমাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি ফলে আমাদের দেশের প্রত্নস্থানগুলো অনেকটাই হুমকির সম্মুখীন। তবে সচেতনতা তৈরি না হলেও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে এদেশের অতীত ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধ। প্রায় আড়াই হাজার বছর প্রাচীন উয়ারি-বটেশ্বর থেকে শুরু করে অন্যান্য আবিষ্কৃত প্রত্নস্থল আমাদের সমৃদ্ধ অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। কালক্রমে এ অঞ্চলে নগরের পাশাপাশি স্থাপত্যিক বিবর্তন ঘটেছে। বিভিন্ন স্থাপনার স্থাপত্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সংযুক্ত হয়েছে পোড়ামাটির চিত্রকর্ম। এরকম একটি স্থাপত্য শিল্প নিদর্শন রয়েছে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার হাটিকুমবুল নামক গ্রামে। স্থাপনাটি একটি নবরত্ন মন্দির এবং ধারণা করা হচ্ছে যে এই নবরত্ন মন্দিরটিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত সবচেয়ে বড় নবরত্ন মন্দির। নবরত্ন মন্দিরটির আশেপাশে আরো তিনটি মন্দির রয়েছে হাটিকুমবুল গ্রামে। এরমধ্যে একটি শিব মন্দির হিসেবে পরিচিত। শিব মন্দিরটির পূর্ব দিকের দেয়ালে খুব নান্দনিক কিছু পোড়ামাটির ফলকে দেব-দেবির চিত্র রয়েছে, যা সে সময়ের মানুষের শিল্পবোধের পরিচয় তুলে ধরে। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পোড়ামাটির ফলকগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি ইতোমধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে। কয়েকটি প্রায় ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। বাকিগুলো কোনোভাবে টিকে আছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো টিকে থাকা প্রতিটি পোড়ামাটির চিত্রফলকের আলোকচিত্র নথিবদ্ধকরণ, যেন ভবিষ্যতে চিত্রফলকগুলো নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে গবেষণার সুযোগ থাকে এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পোড়ামাটির চিত্রফলক থেকে সে-সময়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক শিল্পবোধকে বোঝার চেষ্টা করা।

* প্রভাষক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ অধ্যয়ন বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

অবস্থান

বাংলাদেশের উত্তরের একটি জেলা সিরাজগঞ্জ। এই জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার একটি গ্রাম হাটিকুমরুল। এই গ্রামটিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নবরত্ন মন্দিরের অবস্থান। স্থানীয়ভাবে মন্দিরটি দোলমঞ্চ নামে পরিচিত এবং ধারণা করা হয় যে এটাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নবরত্ন মন্দির। মন্দিরটির প্রায় ২০০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি মাঝারি আকারের জলাশয় রয়েছে। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এ জলাশয়ের পশ্চিম পাড়ে একটি শিব মন্দির রয়েছে। এই শিব মন্দিরটির পূর্ব দেয়ালে বেশ কিছু পোড়ামাটির চিত্রফলক রয়েছে। ফলকগুলো দেব-দেবীর কারুখোঁচিত মধ্যযুগীয় শিল্পকর্মে পরিপূর্ণ, বেশ নান্দনিক এবং উন্নতমানের।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি মূলত প্রাথমিক তথ্যনির্ভর গবেষণা। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গবেষণার বিষয়ের উপর তথ্য রয়েছে খুব সামান্য। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সূত্রের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সরাসরি বস্তুগত নিদর্শন অর্থাৎ শিবমন্দিরের পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলোকে। শিবমন্দিরের দেয়ালে সবগুলো পোড়ামাটির চিত্রফলকের আলোকচিত্র আলাদাভাবে সংগ্রহ ও নথিবদ্ধকরণ, সেগুলোর বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং ভবিষ্যতে যেন পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলো সংরক্ষণ এবং পূনরায়নের ক্ষেত্রে আলোকচিত্রগুলো একটি নথি হিসেবে সহায়তা করে মূলত এই উদ্দেশ্যেই গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা।

ঐতিহাসিক পটভূমি

মানব-সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন শিল্পগুলোর একটি হলো পোড়ামাটির শিল্পকর্ম। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতো ভারতীয় উপমহাদেশেও প্রাচীন এই শিল্পের বিকাশ লক্ষ করা যায়। সিন্ধু সভ্যতার বেশিরভাগ প্রত্নস্থল থেকেই পোড়ামাটির বিভিন্ন ধরণের শিল্পকর্মের নিদর্শন পাওয়া গেছে। আমাদের দেশেও অনেক প্রত্নস্থল এবং স্থাপত্যে বিভিন্ন ধরণের পোড়ামাটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেহেতু আমাদের অঞ্চলে পাথর এবং ধাতু অপ্রতুল তাই হয়তো এখানকার শিল্পীরা মৃৎশিল্পের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল। এই অঞ্চলে কাদামাটির সহজলভ্যতা পোড়ামাটির শিল্প বিকাশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে (সোহরাব ২০০৭ : ৪০০)।

নবরত্ন মন্দিরটির নির্মাণকাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে কারণ মন্দিরের নির্মাণ সময় সম্পর্কিত কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয় যে নবাব মুর্শিদকুলি খানের শাসনামলে রামনাথ ভাদুরী নামক তহসিলদার আনুমানিক ১৭০৪–১৭২৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন (যাকারিয়া ১৯৮৪ : ২৩৮–২৩৯)।

মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি খানের শাসনামলে ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে সুবা বাংলাকে ১৩টি চাকলা, ২৪টি সরকার ও ৭৮৭টি মহলে বিভক্ত করা হয়েছিল। অনেকের মতে রামনাথ জমিদার ছিলেন। যেহেতু নবরত্ন মন্দিরটির নির্মাণকাল সঠিকভাবে জানা যায়নি তাই শিব মন্দিরটির নির্মাণ সময়কালও অনুমান করা কষ্টসাধ্য। তবে নির্মাণ সামগ্রীর বিচারে এটা ধরে নেয়া যায় যে নবরত্ন মন্দির এবং শিব মন্দিরের নির্মাণকাল সামসময়িক।

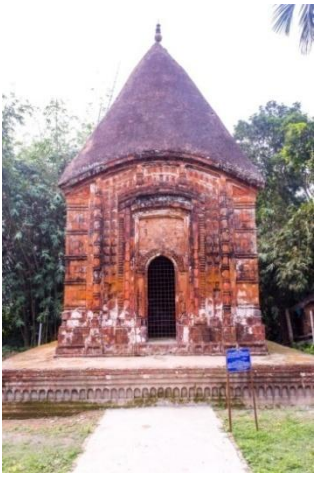


চিত্র ১ : নবরত্ন মন্দির

শিবমন্দিরের দেয়ালে অঙ্কিত পোড়ামাটির কারুকাজ খুবই দৃষ্টিনন্দন। পোড়ামাটি তৈরিতে ছোট ছোট শোভাবর্ধক ইট দিয়ে ফলকগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল। ইটের উপরে পোড়ামাটির চিত্রফলক বসানো হয়েছে। এই চিত্রফলকগুলোতে পুরাণে বর্ণিত বিভিন্ন দেবদেবীসহ উপদেবদেবীর নানান ভঙ্গির চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। নরনারী, যোদ্ধা, শিকারি, গায়ক, বাদক, নর্তক, নর্তকীসহ বিভিন্ন চিত্র অঙ্কিত রয়েছে পোড়ামাটির ফলকগুলোতে। এই চিত্রগুলো তৎকালীন ধর্মীয় মূল্যবোধের পাশাপাশি সামাজিক জীবনের শিল্পবোধের চিত্রকে উপস্থাপন করে।

শিবমন্দিরের পোড়ামাটির চিত্রফলক

শিব মন্দিরটির পূর্ব দিকের দেয়ালে মোট পোড়ামাটির চিত্রফলক রয়েছে ৮৬টি। তবে এগুলো ছাড়াও আরও দুইটা ফলক খিলানের দুইপাশে অঙ্কিত রয়েছে। একটি টেবিলের মাধ্যমে ফলকগুলোর ক্রমবিন্যাস উল্লেখ করা হলো। গবেষণার সুবিধার্থে পোড়ামাটির ফলকগুলোকে ক্রমিক নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।



চিত্র ২ : শিব মন্দির

১	১৭	৩৩	৩৫	৩৭	৩৯	৪১	৪৩	৪৫	৪৭	৪৯	৫১	৫৩	৫৫	৭১
২	১৮	৩৪	৩৬	৩৮	৪০	৪২	৪৪	৪৬	৪৮	৫০	৫২	৫৪	৫৬	৭২
৩	১৯												৫৭	৭৩
৪	২০												৫৮	৭৪
৫	২১												৫৯	৭৫
৬	২২												৬০	৭৬
৭	২৩												৬১	৭৭
৮	২৪												৬২	৭৮
৯	২৫												৬৩	৭৯
১০	২৬												৬৪	৮০
১১	২৭												৬৫	৮১
১২	২৮												৬৬	৮২
১৩	২৯												৬৭	৮৩
১৪	৩০												৬৮	৮৪
১৫	৩১												৬৯	৮৫
১৬	৩২												৭০	৮৬

টেবিল ১ : শিব মন্দিরের দেয়ালে পোড়ামাটির ফলকের ক্রমবিন্যাস

চিত্রফলকগুলোর বর্ণনা

মন্দিরের দেয়ালে অঙ্কিত মোট ৮৬টি পোড়ামাটির চিত্রফলকের মধ্যে ইতোমধ্যে ১৪টি ফলক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। বাকি যে ৭২টি ফলক টিকে আছে, মুদ্রাভঙ্গির ভিত্তিতে সেগুলোকে কয়েকটি বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে।

বর্গের নাম	ফলকের সংখ্যা
নৃত্যের ভঙ্গিমা	২৫
হাতের মুদ্রা সংবলিত নৃত্য	৬
আশীর্বাদের ভঙ্গিমা	৪
বাদ্যযন্ত্র সংবলিত নৃত্যের ভঙ্গিমা	১৬
অস্ত্র সংবলিত ভঙ্গিমা	৪
নৃত্যরত নারীর অবয়ব	৪
পোশাক পরিহিত নৃত্যের ভঙ্গিমা	১
লাঠিতে ভর করে হাঁটার ভঙ্গিমা	২
পা মাথার উপরে রেখে নৃত্যের ভঙ্গিমা	১
বসে থাকার ভঙ্গিমা	২
পোশাক পরিহিত লাঙ্গল সংবলিত নৃত্যের ভঙ্গিমা	১
কাঁধে বসে থাকার ভঙ্গিমা	১
চিহ্নিত করা যায়নি	৫
ধ্বংস হয়ে গেছে	১৪

টেবিল ২ : ফলকগুলোর বর্গ এবং সংখ্যা

নৃত্যের ভঙ্গিমা

নৃত্যের ভঙ্গিমায় সর্বমোট ২৫টি চিত্রফলক দেয়ালে অঙ্কিত রয়েছে। ফলকগুলোর ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী ১, ২, ৩, ৫, ১৮, ১৯, ৩৭, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৬৬, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫ এবং ৭৭ নম্বর পোড়ামাটির ফলক এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নৃত্যের ভঙ্গিমা শিল্পীর নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক চিত্র উপস্থান করে। যে সময়টিতে এই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার সাথে তৎকালীন সামাজিক জীবনপ্রণালির একটা যোগসূত্র থাকার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়া যায় না। কারণ সামাজিক জীবনযাপনের অবস্থান শিল্পকর্মে চিত্রায়িত হয়ে থাকে। তবে এখানে আরেকটি বিবেচ্য বিষয় হলো এই মন্দিরে যে শিবের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা অন্যান্য স্থানের শিবের মোটিফের চেয়ে অনেকটাই ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম এই অর্থে যে সাধারণত শিবকে জটাধারী, গলায় সর্প পেঁচানো, একহাতে ত্রিশূল সমেত যে স্বাভাবিক চিত্র দেখা যায় সেগুলো এই শিব মন্দিরে অনুপস্থিত।



চিত্র ৩ : নৃত্যরত ভঙ্গিমা

হাতের মুদ্রা সংবলিত নৃত্য

পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলোর মধ্যে মোট ৬টি ফলক রয়েছে যেগুলোতে হাতের মুদ্রা সংবলিত নৃত্যের দৃশ্য ফুটে উঠেছে। ক্রমবিন্যাস অনুসারে ৪, ৬, ৯, ২৬, ৪৬ এবং ৪৮ নম্বর ফলকগুলোকে এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ফলকগুলোতে শিবের নৃত্যের মধ্যে হাতের মুদ্রার ছাপ দেখা যায়। নৃত্যের মুদ্রা পর্যবেক্ষণ করলে এটি প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়ে শিবের শিল্পীত্বসত্ত্বার চিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলতে মানুষ বেশি মনোযোগী ছিল। শুধুমাত্র শিল্পীর চিন্তা নয় সাথে সামাজিক ভাবনার জায়গাটি বিশ্লেষণ করলে এটি প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালীন মানুষ ধর্মীয় মূল্যবোধের পাশাপাশি শিল্প-সংস্কৃতিকে তাদের সামাজিক জীবনে চর্চা করতো। শিবকে নটরাজ বলা হয়ে থাকে– তার প্রতিচ্ছবিও এই ফলকগুলোর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।



চিত্র ৪ : হাতের মুদ্রা সংবলিত নৃত্য

আশীর্বাদের ভঙ্গিমা

শিব দেবতা হিসেবে আশীর্বাদের ভঙ্গিমায় অঙ্কিত হয়েছে মোট ৪টি ফলকে। ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী ৭, ২৪, ৩৩ এবং ৮১ নম্বর ফলকগুলো এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে একটি ফলকে আশীর্বাদের ধরন দেখে মনে হচ্ছে যে নৃত্যরত অবস্থায় জটাধারী শিব আশীর্বাদ করছেন।



চিত্র ৫ : আশীর্বাদের ভঙ্গিমা

বাদ্যযন্ত্র সংবলিত নৃত্যের ভঙ্গিমা

শিবের নৃত্যের চিত্রের পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্র সংবলিত ১৬টি ফলক পাওয়া গেছে। ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী ৮, ১০, ১১, ১২, ১৭, ২৭, ২৮, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৭৮, ৭৯ এবং ৮০ নম্বর পোড়ামাটির ফলক এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ফলকগুলো খুব নান্দনিক এবং তৎকালীন সমাজ জীবনের শিল্পবোধের চিত্র এই বর্গের ফলকগুলোতে লক্ষণীয়।

তৎকালীন মানুষ দেবতাকে একজন শিল্পী হিসেবে তুলে ধরেছেন যিনি একইসঙ্গে নৃত্যরত এবং একইসাথে নিজেই বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন। এটি স্পষ্ট যে তৎকালীন মানুষের মধ্যেও শিল্পবোধের বিষয়গুলো নিশ্চয় চর্চা হতো, না হলে তাদের মধ্যে এভাবে দেবতাকে অঙ্কন করার ভাবনাটি আসার কথা নয়।



চিত্র ৬ : বাদ্যযন্ত্র সংবলিত ভঙ্গিমা

অস্ত্র সংবলিত ভঙ্গিমা

মোট ৮৬টি ফলকের মধ্যে মাত্র ৪টি ফলকে অস্ত্র সংবলিত অবস্থায় শিবকে অঙ্কন করা হয়েছে। ক্রমবিন্যাস অনুসারে ২০, ২১, ২২ এবং ৫৯ নম্বর ফলকগুলোতে বিভিন্ন অস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় শিবকে দেখা যায়। ডানহাতে অস্ত্রসদৃশ বস্তু এবং বাম হাতে কাটা মস্তক নিয়ে একটি ফলক অঙ্কিত হয়েছে।



চিত্র ৭ : অস্ত্র সংবলিত ভঙ্গিমা

নৃত্যরত নারীর অবয়ব

শিবের চিত্রের পাশাপাশি ৪টি ফলক থেকে অনুমান করা হচ্ছে যে, সেগুলো নৃত্যরত নারীর অবয়ব। অনুমান করার কারণ হলো দৈহিক গঠন। তবে চারটি মোটিফ যে নৃত্যরত সেটি সুস্পষ্ট। ২৩, ৫৫, ৫৬ এবং ৫৭ সংখ্যক ফলকগুলো এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত।



চিত্র ৮ : নৃত্যরত নারীর অবয়ব

পোশাক পরিহিত নৃত্যের ভঙ্গিমা

মাত্র একটি ফলকে পোশাক পরিহিত অবস্থায় নৃত্যরত শিবকে দেখা যাচ্ছে। ধুতির মতো পোশাকে আচ্ছাদিত এবং নৃত্যরত একটি চিত্র অঙ্কিত রয়েছে ২৫ নম্বর ফলকটিতে।



চিত্র ৯ : পোশাক পরিহিত নৃত্যের ভঙ্গিমা

লাঠিতে ভর করে হাঁটার ভঙ্গিমা

লাঠিতে ভর করে শিব হাঁটছেন এমন চিত্র অঙ্কিত হয়েছে ২টি ফলকে। ক্রমবিন্যাস অনুসারে সেগুলো ৪০ এবং ৬৪ নম্বর ফলকে উপস্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে শিল্পী দেবতার বয়সের দিকটিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকতে পারেন।



চিত্র ১০ : লাঠিতে ভর করে হাঁটার ভঙ্গিমা

পা মাথার উপরে রেখে নৃত্যের ভঙ্গিমা

একটি ফলকে দেখা যাচ্ছে যে শিব তার এক পা মাথার উপরে রেখে নৃত্যের ভঙ্গিমায় রয়েছেন। এটিও নৃত্যের চিত্রকে উপস্থাপন করে। নৃত্যের বহুমাত্রিক মুদ্রার ব্যবহার থেকে অনুমান করা যায় যে তৎকালীন মানুষ তার সাংস্কৃতিক জীবনচর্চায় নৃত্যকে একটি বড় স্থানে রেখেছিল। ৪২ নম্বর ফলকটিতে এই চিত্র অঙ্কিত রয়েছে।



চিত্র ১১ : পা মাথার উপরে রেখে নৃত্যের ভঙ্গিমা

বসে থাকার ভঙ্গিমা

বসে থাকা অবস্থায় শিবের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে ২টি ফলকে। ৪৫ এবং ৭৬ নম্বর ফলকগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে শিব বসে আছেন।



চিত্র ১২ : বসে থাকার ভঙ্গিমা

পোশাক পরিহিত লাঙ্গল সংবলিত নৃত্যের ভঙ্গিমা

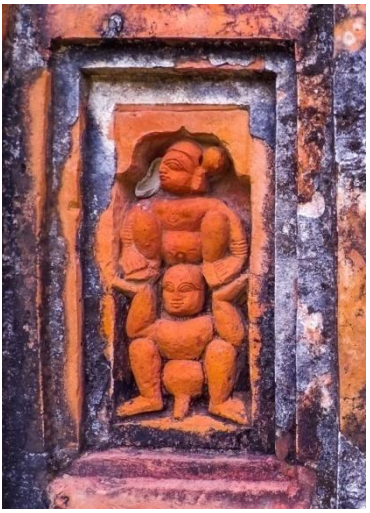
নৃত্যের পাশাপাশি পোশাকে এবং একইসাথে লাঙ্গল নিয়ে শিবের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে একটি ফলকে। ৬০ নম্বর ফলকটিতে দেখা যাচ্ছে তার বাম হাতে লাঙ্গল, তিনি পোশাক পরিহিত এবং একইসাথে নৃত্যের ভঙ্গিমায় রয়েছেন।



চিত্র ১৩ : পোশাক পরিহিত লাঙ্গল সংবলিত নৃত্যের ভঙ্গিমা

কাঁধে বসে থাকার ভঙ্গিমা

পোড়ামাটির ফলকগুলোর মধ্যে মাত্র একটি ফলকে শিবকে দেখা যাচ্ছে তিনি অন্যজনের কাঁধের উপরে বসে আছেন। ফলক নম্বর ৬১ তে এই চিত্র অঙ্কিত রয়েছে।

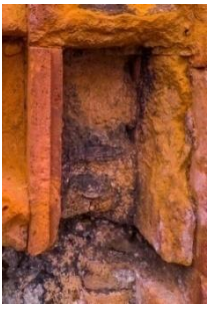


চিত্র ১৪ : কাঁধে বসে থাকার ভঙ্গিমা

শিবমন্দিরের দেয়ালে অঙ্কিত সর্বমোট ৮৬টি পোড়ামাটির চিত্রফলকের মধ্যে ১৪টি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। সেগুলোর মোটিফ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। বাকি যে ৭২টি ফলক আছে সেগুলোর মধ্যেও অনেকগুলো ইতোমধ্যে হুমকির সম্মুখীন। নিচে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়া চিত্রফলকের মধ্যে কয়েকটির আলোকচিত্র সংযুক্ত করা হলো :



চিত্র ১৫ : ফলক ৮২



চিত্র ১৬ : ফলক ৮৩



চিত্র ১৭ : ফলক ৮৪



চিত্র ১৮ : ফলক ৮৬

উপসংহার

প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চার ক্ষেত্রে একটা প্রত্নস্থলকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ না করলে সেগুলো নিয়ে গবেষণার কোনো সুযোগ থাকে না। গবেষণার পাশাপাশি নান্দনিক শিল্পবেধের

বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়ে শিব মন্দিরের মতো প্রত্নস্থলকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ না করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অতীত মানুষের সাংস্কৃতিক চিন্তন সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে না। আমাদের প্রত্নস্থলগুলোকে সংরক্ষেণের জন্য বৃহৎ পরিসরে উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে একটি প্রত্নস্থল একটি সময়ের চিত্র উপস্থাপনে সক্ষম। শিব মন্দিরের দেয়ালে অঙ্কিত চিত্রকর্ম দেখে সহজে অনুমান করা যায় যে এগুলো নির্মাণে তৎকালীন মানুষের মধ্যে শিল্পবোধ ছিল। শিব মন্দিরের চিত্রফলকগুলো বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় যে খুব দ্রুত এগুলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ না করলে সেগুলো অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে। সংরক্ষণের পাশাপাশি যেগুলো ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলোর পুনরায়ন করাটাও অনেক জরুরি। আজ থেকে প্রায় তিনশত বছর পূর্বের মানুষের শিল্পবোধের চিত্র আমরা পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলোতে পাচ্ছি। তাই ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য এগুলোর সংস্কার করাটা অতীব জরুরি।

সহায়কপঞ্জি

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (১৯৮৪)। *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*। দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

তারাপদ সাঁতরা (১৯৯৮)। *কলকাতার মন্দির-মসজিদ : স্থাপত্য-অলংকরণ-রূপান্তর*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সোহরাব উদ্দিন সৌরভ (২০০৭)। 'পোড়ামাটির শিল্প আদি-ঐতিহাসিক যুগ থেকে প্রাক-মধ্যযুগ।' সুফি মোস্তাফিজুর রহমান সম্পাদিত *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

David McCutchion (1983). *Classification of Types in Brick Temples of Bengal* (George Michell ed.). Princeton University Press, New Jersy.

Ramesh S.Gupte, (1992). *Iconography of the Hindus, Buddhists and Jains*. Munshiram Manoharlal Publishers Pvt., New Delhi.

Zulekah Haque (2014). *Terracotta's of Bengal : An Analytical Study*. ICSBA, Dhaka.

সংশপ্তক উপন্যাসে বিপ্লবী চেতনার স্বরূপ

মোঃ আরিফুল ইসলাম*

[সারসংক্ষেপ : বিপ্লবী ধারার বাংলা উপন্যাসে শহীদুল্লা কায়সার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর লেখায় সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষদের কঠিন জীবনসংগ্রামের নিখুঁত চিত্র দেখা যায়। 'সংশপ্তক' তাঁর এই ধারার একটি সফল উপন্যাস, যেখানে শাসকশ্রেণি ও সমাজপতিদের নির্মম নির্যাতনের মুখোমুখি সাধারণ মানুষদের দুঃসাহসী লড়াইয়ের একটি বাস্তব চিত্র দেখা যায়। এসব মানুষেরা শোষকের নিপীড়ন মুখ বুজে সহ্য করে না। তারা প্রতিবাদী হয়ে মুক্তির নেশায় মেতে ওঠে–শোষকের অশুভ শক্তিকে নস্যাৎ করে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। লড়াইয়ের এই নেশা তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে বয়ে আনে নতুন গতি।]

বাংলা সাহিত্যে শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-১৯৭১) এক অনন্য প্রতিভার নাম। ছাত্রজীবন থেকে আমৃত্যু বামধারার বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত মানুষের জীবনসংগ্রাম সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, ধর্মীয় অনাচার, সামাজিক বৈষম্য ও সামন্ত প্রথার নির্মমতায় নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষের দুর্বিষহ জীবনসংগ্রামের এক বাস্তব চিত্র তাঁর *সংশপ্তক* উপন্যাস। সাধারণ মানুষ, যাদের দুবেলা অন্নের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয় তাদের এ পরিশ্রমের ফসলও জমিদারদের হাত থেকে তারা রক্ষা করতে পারে না। ইংরেজ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট জমিদার, মহাজনেরা নানা রকম ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে সাধারণ মানুষের রক্ত শোষণ করে। এই নির্মম শোষণের শিকার মানুষগুলো পড়ে যায় অস্তিত্বের সংকটে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় এসব মানুষদের। তারা ঘুরে দাঁড়াতে চায়, বাঁচতে চায়। সংগ্রাম, বিদ্রোহ, বিপ্লব ও ক্ষোভ শোষিত মানুষদের প্রেরণার উৎসে পরিণত হয়। শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেও ইংরেজ শাসকদের সৃষ্ট জমিদার ও মহাজনদের নির্যাতনের আঘাত সয়ে তারা সামনে এগিয়ে যায়। সমাজপতি ও ধর্মের ধ্বজাধারীদের দোররার আঘাত তাদের পিঠ পর্যন্ত সীমিত থাকে কিন্তু অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা পৃথিবীতেই অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় এবং তার প্রভাব পূর্ব বাংলায়ও পড়ে। প্রকট দারিদ্র্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় দেশ। এই দুরবস্থাকে পুঁজি করে মহাজনেরা তৎকালীন সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষকে ঋণের ফাঁদে ফেলে শোষণের মাত্রাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে ধর্মকেও তারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। শাসকদের সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে একদিকে সাধারণ মানুষ নিঃস্ব হয়, অপরদিকে জমিদার মহাজনেরা অর্থের পাহাড় গড়ে তোলে। শহীদুল্লা কায়সার রচিত উপন্যাসে ফুটে উঠেছে শোষিত মানুষের জীবনালেখ্য ও তাদের প্রতিবাদের চিত্র। *সংশপ্তক* এই ধারার একটি অন্যতম সফল উপন্যাস। এ প্রসঙ্গে রণেশ দাশগুপ্ত লিখেছেন,

> সংশপ্তক উপন্যাসে একটি যুগান্তরের ইতিকথা বিন্যস্ত। ১৯৩৮ থেকে ১৯৫১ সাল। এর মধ্যে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানকল্পে উপমহাদেশের যে মুক্তি-সংগ্রাম চলছিল, তার

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

> দ্বন্দ্বাত্মক গতিধারায় সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার জটিল প্রশ্নের উদ্ভব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষাবস্থা, যুদ্ধাবসান ও কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগ এবং দেশ বিভাগের পরে মুক্তি-সংগ্রামের পালাবদল এবং বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের সূচনা-এই কয়েকটি পর্বের পটভূমিতে বাংলাদেশের দুটি গ্রামের কয়েকটি চরিতকথা সংশপ্তকে উন্মোচিত। (রণেশ, ১৯৭৩ : ২১০)

সুতরাং বলা যায়, নিপীড়িত মানুষের গর্জে ওঠার এক বিশ্বস্ত দলিল এই 'সংশপ্তক'। এর চরিত্রগুলো মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সদাজাগ্রত। রক্তমাংসের এই মানুষগুলো যেন সত্যিকারের সংশপ্তকে পরিণত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনাসমৃদ্ধ উপন্যাসের একটি ধারা লক্ষ করা যায়। এই ধারার উপন্যাসগুলোতে নিম্নবর্গের মানুষদের ওপর শোষকদের নিপীড়নের চিত্র এবং তৎসাপেক্ষে নিপীড়িত শ্রেণির মানুষদের আন্দোলন ও ক্ষোভ উত্থাপিত হয়েছে। যেমন– বেগম রোকেয়ার *সুলতানার স্বপ্ন* (১৯২২), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মা নদীর মাঝি* (১৯৩৬), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পথের দাবী* (১৯২৬), আবু ইসহাকের *সূর্য দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫), মহাশ্বেতা দেবীর *হাজার চুরাশির মা* (১৯৭৪), *অগ্নিগর্ভ* (১৯৭৮); দেবেশ রায়ের *মানুষ কেন খুন করে* (১৯৭৪) প্রভৃতি।

শহীদুল্লা কায়সার রচিত দুটি উপন্যাসের মধ্যে '*সংশপ্তক*' তাঁর প্রকাশিত দ্বিতীয় উপন্যাস (সাকলায়েন সম্পা. *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী*, *২য় খণ্ড*)। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী কাল থেকে শুরু করে যুদ্ধোত্তর ও বিভাগোত্তর কালে ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশের সামাজিক জীবনসত্য এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে' (সরিফা, ২০০৮ : ৪৪)। এ সময় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ওপর ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সৃষ্ট জমিদার-মহাজনেরা নির্মম নির্যাতন চালিয়েছিল। তাদের নির্যাতনের মুখে রুখে দাঁড়িয়েছিল এসব সাধারণ মানুষেরা। *সংশপ্তক* উপন্যাসের শুরুতেই এরকম একটি চিত্র দেখা যায়। গ্রাম্য পঞ্চায়েতে সালিশের নামে অসহায় পিতৃ-পরিচয়হীনা হুরমতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় অবৈধ যৌনসম্ভোগের দায়। যেখানে অপরাধী পুরুষটি থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। পরাধীন ভারতবর্ষের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অপরাধের দায় শুধু নারীকেই বহন করতে হয়। যেখানে পুরুষদের অন্যায়ের শাস্তির কোনো বিধান নেই। *সংশপ্তক* উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলো পুরুষতন্ত্রের এই নির্মম নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করে না। তারা প্রতিবাদ করেছে। অন্যকে প্রতিবাদী হতে সাহস জুগিয়েছে। এক্ষেত্রে হুরমতি চরিত্রটির উল্লেখ করা যায়। পঞ্চায়েতের কঠিন শাস্তির মুখেও হুরমতি ভাবলেশহীন। লেখকের ভাষায়,

> এত যে গালি তাতে ভাবান্তর নেই ওর মুখে। একটু হেলছেও না, কাঁপছেও না। মিঞার ধমকে মাথায় ঘোমটা তুলল না ও। একটিবার চেয়েও দেখল না হকুমদাতা ফেলু মিঞার অথবা রমজানের দিকে। বাঁশের ছিলার মত দেহটাকে টান করে, ঘাড়টিকে তেরছা করে অদূরের এক খণ্ড চেলা কাঠের দিকে চেয়ে সেই যে দাঁড়িয়ে আছে, আছেই। (শহীদুল্লা, ২০০০ : ৯)

এ দাঁড়ানোতে ঝরছে বিদ্রোহের আগুন। লেখক জানাচ্ছেন,

> নিঃশঙ্ক ঔদ্ধত্যে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, যেমনটি প্রথমেই এসে দাঁড়িয়েছিল। ওসব হুমকি ধমক বুঝি শোনা আছে তার, পরোয়া করে না সে। শুধু একবার পা থেকে বাঁ পায়ে নিয়ে এল

> দেহের ভারটা। অবস্থান পরিবর্তনের আচমকা আলোড়নে ওর অন্তর্বাসহীন দুটি স্তন উত্তাল তরঙ্গের ফণার মতন মাথা তুলে কেঁপে কেঁপে আবার স্থির হয়ে যায়। ডান পায়ের উপর ভর রেখে ছেঁড়া আঁচলটা এবার খুব সেঁটে পিঠের এলোমেলো ছড়ানো চুলের উপর দিয়ে পেঁচিয়ে আনল মেয়েটি। তারপর গলার কাছটিতে দোপাট্টা করে বেঁধে নিল। আর সে বন্ধনে ওর ফালি-বাঁশ দেহটি নাভি অঞ্চল থেকে ঈষৎ বেঁকে এল ছিপের আগার মতো। পুষ্ট অথচ ধারালো দেহের ওই বঙ্কিম ভঙ্গিটিই যেন বিদ্রোহের প্রকাশ্য ঘোষণা। থোড়াই পরোয়া করে সে এই পঞ্চায়েতের। (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১১)

বিচারের নামে একজন অসহায় নারীর গায়ে সমাজপতিরা কালিমালেপন করে শাস্তির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে, এতে কিন্তু হুরমতি একটুও টলেনি; বরং প্রতিবাদের মাধ্যমে সমাজের প্রতি চরম ঘৃণা প্রদর্শন করেছে, 'যারা থুক থুক করছে নীরব অবজ্ঞায় সেই থুতু যেন ফিরিয়ে তাদেরই গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ৯)।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে যে সমাজ তার প্রয়োজনে হুরমতির মতো নারীদের ব্যবহার করে, সে সমাজের প্রতি চরম বিদ্বেষ ঘোষণা করেছে *সংশপ্তক* উপন্যাসের নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলো। বিশেষ করে হুরমতি, রাবু ও আম্বরির ভূমিকা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। নির্যাতিত এসব নারীরা শুধু প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হয়নি প্রতিশোধও নিয়েছে। যে রমজান হুরমতির কপালে কলঙ্কের তিলক লাগিয়েছিল, হুরমতি সেই রমজানের কান কেটে প্রতিশোধ নিয়েছে। বিপ্লবে, ক্ষোভে, আক্রোশে ফেটে ওঠা হুরমতির এই প্রতিশোধ যেন অবধারিত। উপন্যাসটির শুরু থেকেই হুরমতি ছিল সাহসের প্রতিচ্ছবি। অবশেষে রমজানের কান কেটে সে তার এতদিনের মনের জ্বালা মেটালো। ড. অশোক মিস্ত্রির মতে,

> যদিও দীর্ঘ প্রতীক্ষিতা, জেদী, বিদ্রোহিনী, পাল্টা প্রতিশোধস্পৃহ হুরমতিও তার প্রতিশোধ নিয়েছে অভিনব কৌশলে, পরিণত করেছে অমোঘ দেহের ফাঁদে বেদিল নাফরমানিতে, উন্মাদ, মরিয়া কাণ্ডজ্ঞানশূন্য লুব্ধ কামার্ত প্রজ্বলিত মোমের ন্যায়, লালাঝরা প্রবল অগ্নিনিঃশ্বাসী লোমশ গরিলাসম শিকারি হিংস্র পশুকে বিপন্ন শিকারে। রমজানকে ভূষিত করেছে নাটকীয় আকস্মিকতায় নতুন একটি অভিধায় 'কানকাটা রমজানে'। যার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয় ২য় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, স্বাধীনতা, দেশ-বিভাগ, ইংরেজ বিদায়, হুরমতি অনেক চড়াই উৎরাই ভেঙে ফিরে আসে সেই বাকুলিয়ায় আজন্মলালিত স্বপ্ন-স্বর্গে ভুমিহীন, আম্বরিহীন লেকুকে নিয়ে বিগত যৌবন সংসার সীমান্তে। (অশোক, ২০০৮ : ১৩১)

সংশপ্তক উপন্যাসের নিপীড়িত মানুষগুলো বিপ্লব ও প্রতিবাদের মাধ্যমে এভাবেই মুক্তি খুঁজে নিয়েছে।

বাংলা উপন্যাসে এমনি একটি চরিত্র *সূর্য দীঘল বাড়ী* উপন্যাসের জয়গুন। স্বামী মারা যাওয়ার পর সন্তান নিয়ে অকুল পাথারে পড়ে সে। সন্তানদের বাঁচানোর জন্য সূর্য দীঘল বাড়ীতে বসবাস শুরু করে। বেঁচে থাকার তাগিদে নেমে পড়ে কঠিন জীবন সংগ্রামে। কিন্তু ধর্মের ঝাণ্ডাধারী মোল্লারা জয়গুনের বিরুদ্ধে বেপর্দা হওয়ার ফতোয়া দেয় এবং ধর্মীয় সকল কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করে। হুরমতির মতো জয়গুনও তাদের পরোয়া করে না। সাহসের সঙ্গে সেও এগিয়ে চলে সামনের দিকে।

পুরো উপন্যাসজুড়ে সাহসের প্রতীক সেকান্দর মাস্টার, যে নিজের ভবিষ্যতের কথা বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছে। সমালোচকের ভাষায় 'সেকান্দর মাস্টার বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামেরই সাধক কর্মীচরিত্রের প্রতিভূ। সেকান্দর হচ্ছে সেই কর্মীদের একজন যারা মুক্তিসংগ্রামকে তার মহাবৈপ্লবিক বিশ্বপরিপ্রেক্ষিতেও পল্লিগ্রামের সাধারণ মানবমানবীর নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ সংগ্রাম বলে প্রমাণিত করেছে' (রণেশ, ১৯৭৩ : ২২৩)। এই সেকান্দরই বাকুলিয়ার কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করেছে, জাহেদের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংগ্রামের আহ্বানকে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। তাই কৃষকদের অধিকার আদায়ের জন্য সেকান্দর কখনো ফেলু মিঞার কাছে অনুরোধ করে কিংবা কখনো গর্জে ওঠে, 'দু'বছর পরপর দুর্যোগ গেল, ওরা কোত্থেকে খাজনা দেবে? ওদেরও কিছু মাফ করে দিন, নতুবা যা নেবার সে নেবেন আগামী সনে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ৭৯)। বাংলাদেশের কৃষিজীবী মানুষদের অবিরাম লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে এ উপন্যাসে। ফেলু মিঞার খাজনা শোধ করার জন্য রামদয়ালের কাছে জমি রেহান দেয় লেকু, তবুও হাত পাতেনা ফেলু মিঞার কাছে। অদম্য মনোবলে লেকু আবারো ঘুরে দাঁড়াবে। রেহানের জমি ফিরিয়ে আনবে। তাইতো লেকু বলে 'কারো ধারি না আমি, কারো খাই না। কামাই করব, আবার ফিরিয়ে আনব আমার জমি' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ৯৪)। এভাবেই লেকুদের লড়াই চলে। অনেকেই খাজনা শোধ করতে না পেরে ভিটে মাটি ছেড়ে চলে যায়। তবুও তারা হার মানে না। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, তবুও এসব কৃষকেরা নতুন জীবনের আশায় চিরদিনের জন্মভূমি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। এভাবেই কসির, ফজর আলীরা শেষ পর্যন্ত ভূমিহারা হয়। শেষ বেলায় যাবার সময় কসির কেঁদে বলে, 'মাস্টারসাব মানুষ হয়ে লই, মানুষ হয়ে আবার আসব' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১১)। কসিরের এই উক্তিতে ক্ষোভ, ঘৃণা ও বিদ্রোহ দেখা যায়। সংগ্রামী মানুষেরা যুগে যুগে এভাবেই শোষকের অত্যাচারে পিষ্ট হয়ে চিরদিনের জন্মভূমি ত্যাগ করে অন্য কোনো স্থানে আবাস গড়ে। তবে নতুন স্থানে গিয়েও তাদের এই সংগ্রামের শেষ হয় না। মানবতার এই নির্মম পরিণতিতেই সেকান্দর মাস্টারের মনের ভিতর জন্ম নেয় ক্ষোভ, প্রতিবাদ। তার ভিতরটা আস্তে আস্তে ফুঁসে ওঠে। এক্ষেত্রে মুহম্মদ ইদরিস আলীর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য,

> জাতীয় মুক্তি-অন্বেষায়, আজীবন ব্রতী এ উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র শিক্ষিত গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সেকেন্দার মাস্টার এ ধারার বিশিষ্ট চরিত্র। বাকুলিয়া-তালতলি এলাকার সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতিমূলক জীবনধারাকে সত্যিকার স্বাধীনতা ও মুক্তির দিগন্তে পৌঁছে দেবার ব্রতে কৃষক-সন্তান সেকেন্দারের ভূমিকা ব্যতিক্রমী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা প্রভৃতির মাধ্যমে নানা পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে গেলেও সেকেন্দারের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেনি। এবং গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে ছেড়ে কোথাও পালিয়ে বাঁচতে আগ্রহী হয়নি সে। সেকেন্দার অসাম্প্রদায়িকই শুধু নয়, শ্রেণী সচেতনও। সেকেন্দারের চিন্তা-ভাবনা সুস্থ, যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানভিত্তিক। তার দৃষ্টিতে স্বাধীনতা অর্জনের অর্থ ইংরেজ বিতাড়ন তো বটেই সঙ্গে সঙ্গে জমি-রুটি-রুজি, জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ। জাতীয় মুক্তি অর্জন ও স্বদেশান্বেষায় সেকেন্দার প্রথমাবধিই বামপন্থার অনুসারী তথা সমাজতন্ত্রের অভিমুখী। এ গ্রন্থের সত্যিকার সংশপ্তক আর কেউ নয়–সেকেন্দারই। (ইদরিস, ১৯৮৮ : ১৩৩–১৩৪)

ফেলু মিঞা আর রামদয়ালদের মিলিত শোষণে দরিদ্র মানুষেরা ঘরছাড়া। এই দখল, শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে সেকান্দর মাস্টার, 'আজ এর ছাগল চুরি, কাল ওর ক্ষেতের ফসল চুরি, মারামারি অশান্তি লাগিয়েই রেখেছে। এই হার্মাদ শয়তানগুলোকে শায়েস্তা করতে হবে,

ওদের হাত-পা ভেঙ্গে দিতে হবে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১০৯)। এভাবেই তালতলি স্কুলের তিরিশ টাকা মাইনের জুনিয়র মাস্টার সেকান্দর বুক চিতিয়ে লড়াইয়ে নামে ফেলু মিঞা ও রমজানদের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত ফেলু মিঞা সেকান্দরকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়। মামলায় পড়ে সেকান্দর আর লেকু চরম বিপদে পড়ে। কারণ, 'থানা আর মিঞা বাড়ির যতটা নৈকট্য সেকান্দর আর থানার মাঝে বুঝি ঠিক ততটাই দূরত্ব' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১১৮)। রাষ্ট্র, সমাজ ও বিচারালয় সবকিছুই সেকান্দরদের বিপক্ষে। তবুও এরা বাঁচতে চায়। লড়াই করতে চায়। কিছুতেই হাল ছাড়তে চায় না, 'এ উপন্যাসের মানুষেরা হচ্ছে, এ কালের সংশপ্তক সেনা। পৌরাণিক কাহিনীর সংশপ্তক অর্থাৎ নিশ্চিত পরাজয় জেনেও যুদ্ধ করে যাওয়া সৈনিকের মতো সংগ্রাম করে যায় এ উপন্যাসের চরিত্রগুলি' (শফিউল, ২০০১ : ১১৬)।

মুক্তিকামী মানুষের সাহসী উচ্চারণে ঠাঁসা এক উপন্যাসের নাম *সংশপ্তক*। যার পুরো শরীর জুড়ে রয়েছে বঞ্চিত মানুষের ফুঁসে ওঠার চিত্র, যাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী সমাজের বাসিন্দা। অথচ এই কৃষকেরা জমিদারের হাতে বন্দি। বেশিরভাগ কৃষকই অন্যের জমিতে বর্গা খাটে। অভাব-অনটন তাদের নিত্যসঙ্গী। বর্ষার সময় যাদের ঘরবাড়ি বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। মাঘ, ফাল্গুন এই দুটি মাসই তাদের কাজের সময়। সারা বছরের সব কাজ শেষ করতে হয় এ সময়ের মধ্যেই। অথচ এ সময়েই জমিদার খাজনা পরিশোধের আকস্মিক সমন জারি করে। এর প্রতিবাদে গর্জে ওঠে লেকু। তার মুখে সাহসী উচ্চারণ, "খাজনা দেব না, ভিটিও ছাড়ব না, দেখি কি করতে পারে। মিয়ার 'পুত'"শহীদুল্লা, ২০০০ : ৬৮)। ফেলু মিঞাদের নিপুণ ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে এসব মানুষগুলো যখন ন্যায়বিচার পায় না। তখন আর মানুষের কাছে বিচার না দিয়ে তারা খোদার কাছে বিচার দেয়। সমগ্র উপন্যাসটি যেন নিষ্পেষিত এসব মানুষদের বিদ্রোহের জ্বালায় অনবরত জ্বলছে। ফেলু মিঞার সহযোগিতায় রমজান যখন লেকুকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করে তখন বিচার না পেয়ে লেকুর স্ত্রী আম্বরি খোদার কাছে বিচার চায়, 'এত হার্মাদি সইবে না খোদা। খোদা জ্যান্ত কবরে নিবে তোকে। খোদার ঠাডা পড়বে, পুত মরবে ঝি মরবে, সর্বস্বান্ত হবি। নিজের বিষ্ঠা নিজে খাবি' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১১১)। আম্বরির এই অভিসম্পাত দীর্ঘদিন ধরে বুকের ভিতর জমে থাকা ক্ষোভের, বিদ্রোহের। বিপ্লবের মহা উত্তাপে মেতে ওঠা সেকান্দর মাস্টার যেকোনো মূল্যে মানবতার মুক্তি চায়। অবরুদ্ধ মানুষকে মুক্তির স্বাদ দিতে চায়। তাইতো যুদ্ধ ও দাঙ্গার ফলে মানুষের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও দীপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করে 'এ মৃত্যুকে আমি রুখব। আমি মৃত্যুঞ্জয়ী হব। আমি মরণ-জয়ের ডঙ্কা বাজাব, সবাইকে শোনাবো মৃত্যুহীনের ডাক' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১৫১)। সত্যিকারের বিপ্লবীরা কখনো পরাজিত হতে শেখেনি। শেষ পর্যন্ত তারা লড়াই চালিয়ে যায়। শত দুঃখেও তারা ভেঙে পড়ে না। লড়াই সংগ্রামে তাদের কোনো ভয় নেই। যুদ্ধের সর্বনাশা আগুনে পুড়ে চতুর্দিকে মানুষের মৃত্যুর মিছিল। অথচ সেকান্দর মাস্টার বুক চিতিয়ে লড়ে যায় মানুষের পক্ষে, জীবনের পক্ষে, 'দুঃখ সওয়া, দুঃখ নেওয়া খুব বড় জিনিস রে মালু, খুব বড় জিনিস, দুঃখের আগুনে যে না পুড়েছে সে চিনতে পারে না, জানতে পারে না, এই দুনিয়াটাকে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১৯৭)। এভাবেই সেকান্দর বিপ্লবের এক মূর্ত প্রতীকরূপে সমগ্র উপন্যাসে বিরাজ করে।

সংশপ্তক উপন্যাসের নেতৃত্বগুণসম্পন্ন অন্যতম প্রধান চরিত্র জাহেদ, আলিগড় থেকে লেখাপড়া শিখে একটা পরিবর্তনের বৈপ্লবিক বাণী নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করে। তার স্বপ্ন বাংলাদেশের অজ পাড়াগাঁ একদিন সুখী ও সমৃদ্ধ হবে। মানুষের জীবনমান উন্নত হবে।

তাইতো জাহেদ বলে ওঠে 'চাষ চলবে কলের লাঙলে। ফসল উঠবে যারা চাষ করবে তাদেরই ঘরে। জমিদার তালুকদার-মহাজনের বাখরাদারী চলবে না। ডায়নামো বসবে। বিজলী বাতি জ্বলবে গাঁয়ের ঘরে ঘরে। ক্লাব থাকবে, রেডিও থাকবে গাঁয়ে গাঁয়ে। স্কুল থাকবে প্রতি গ্রামে, কৃষকের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে বিনে মাইনেয়' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১২৩-১২৪)। পরিবর্তনের অবিনাশী বার্তা নিয়েই উপন্যাসে জাহেদের আগমন। একপর্যায়ে জাহেদের বাণী পরিণত হয় বিপ্লবের বাণীতে। বাকুলিয়ার সেকান্দর মাস্টারও এই বাণীতে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। তার চোখেও খেলা করে অনাগত এক সুন্দরের ভবিষ্যৎ। সেকান্দর যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছে না জাহেদের এই কল্পিত ভবিষ্যৎ, তখনই জাহেদ তার বিপ্লবের বাণী বলে ওঠে, 'দেশ জুড়ে যে বেজে উঠেছে স্বাধীনতার ডঙ্কা। দিকে দিকে আজাদীর বুলন্দ্ আওয়াজ। দেশ আর কতদিন সহ্য করবে গোলামির জিঞ্জির? ইংরেজের যাবার দিন এসে গেছে যে, এসে গেছে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১২৪)।

এভাবেই জাহেদ স্বাধীনতার দাবি নিয়ে হাজির হয় বাকুলিয়ায়। তার দীপ্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাকুলিয়ার কৃষক সমাজ। দীর্ঘদিন শাসন, শোষণ মুখ বুজে সহ্য করলেও এখন তারা স্বাধীনতার আন্দোলনে বলীয়ান। তারা মুক্তি চায়। লেখক জানাচ্ছেন, 'সেই ঠাণ্ডা রক্তের মানুষগুলো মেতে উঠল কি এক উন্মাদনায়। মেতে উঠল ফজর আলী। মেতে উঠল মৃধা বাড়ির সেই রহমত বুড়োও। গরুর গাড়িটা নিয়ে জাহেদের সাথে সাথে সেও পাড়ি দেয় এ গাঁ সে গাঁ। দুর্বল লেকু সেও বসে থাকতে পারে না ঘরে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১৩১)। *সংশপ্তক* উপন্যাসটা যেন এভাবেই হয়ে উঠলো বিপ্লবের এক মহা ইশতেহার। চূড়ান্ত মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই এই বিপ্লবের লক্ষ্য। গবেষকের মতে,

> *'সংশপ্তক'*-এ সমাজ এবং সময় চলমান; ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে এগোতে থাকে উপন্যাস। এগিয়ে যাওয়াটাই এ-উপন্যাসের ক্ষেত্রে আসল কথা। কোন প্রকারের স্থিতির ইঙ্গিত টানেননি ঔপন্যাসিক। যে-জাহেদের প্রত্যাশা ছিল দেশ ভাগের মধ্যেই ঘটতে পারে সকল সার্থকতা, সে-ও আর স্থিতিতে নেই। শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে সে দীক্ষা নেয় সমাজতন্ত্রে। (মহীবুল, ২০০২ : ১৩০)

সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত জাহেদের সুযোগ্য নেতৃত্বে সর্বহারার দল বিপ্লবে জড়িয়ে পড়ে, 'সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লবে নিষ্ঠাবান ও সম্ভাবনাময় জাহেদ আত্মত্যাগে ও সাংগঠনিক শক্তির প্রকাশে উজ্জ্বল। ভাববাদী চেতনা থেকে বাস্তবমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা-চেতনায় তার উত্তরণ এদেশীয় তরুণদের একাংশের প্রগতিশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার ইতিহাস মনে করিয়ে দেয়' (সরিফা, ২০০৮ : ৫০)। ফলে বাকুলিয়ার নবীন-প্রবীণ দলে দলে সবাই যোগ দেয় স্বাধীনতার আন্দোলনে। এক্ষেত্রে জাহেদ শুধু নেতৃত্বই দেয় না, সরাসরি সাংগঠনিক কাজে জড়িয়ে যায়। নিজ হাতে দমন করে সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন সেসব অমানুষদেরকে, যারা ধর্মের নামে দীর্ঘদিন ধরে নারীদেরকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখে। জোর করে নারীদেরকে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহে বাধ্য করে। বৃদ্ধ পীরের সঙ্গে চৌদ্দ বছরের রাবুর জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী জাহেদ তার প্রতিবাদ করে, রাবুকে মুক্তি দেয়, 'কাঁথা পুড়ি নতুন জামাইর। খিঁচিয়ে ওঠে জাহেদ।' একপর্যায়ে মাস্তানের দলকে পিটিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয় জাহেদ। জাহেদের এ আন্দোলনে সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালি যেন নতুনভাবে বাঁচার খোঁজ পেল, 'জাহেদ চরিত্রের মাধ্যমে শহীদুল্লা কায়সার শিক্ষিত বাঙালি

মুসলমানের আত্মরূপান্তরের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। বাস্তবের অভিঘাতে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদী জাহেদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীতে রূপান্তর একটা দ্বন্দ্বময় অথচ বাস্তবসম্মত প্রক্রিয়ায় রূপায়িত হয়েছে' (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ১৭০)। এই জাহেদ শিক্ষার আলোহীন মুসলিম প্রজাদের দুর্দশা দেখে চিন্তিত। মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়। ভারতবর্ষে বিপ্লবের আন্দোলন তুঙ্গে; এদিকে বাংলাদেশে তার কোনো ঢেউ নেই। তাই জাহেদ বাকুলিয়ার সেকান্দর মাস্টারকে বিপ্লবের আহ্বান জানায়, 'হাজার হাজার মুসলিম তরুণ আজ এক নতুন স্বপ্নে মেতে উঠেছে, নয়া জাগরণের বাণী ওদের মুখে মুখে। আজ বাকুলিয়ায় সে বাণী আর সে স্বপ্নের ডাক নিয়েই তো এসেছি আমি। সেকান্দর, আমি তোমার মদদ চাই। সে বাণী তোমাকেও যে শুনতে হবে, শোনাতে হবে লক্ষ হাজার মানুষকে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১২৫)। মুক্তির নেশায় যখন জাহেদ অবিনাশী বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ, এই সুযোগে জমিদার ফেলু মিঞা নিজ স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ধুরন্ধর ফেলু মিঞা বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে নেতা হতে চায়। যেখানে সর্বসাধারণ এক হয়ে লড়াই করছে শাসকদের বিরুদ্ধে। অথচ ফেলু মিয়া বলে ওঠে 'আমি ভেবেছি, সেক্রেটারি হিসাবে মাস্টারই হবে উত্তম ব্যক্তি, তুমি শুধু ওর মাথাটা টাইট করে দেবে। আর প্রেসিডেন্ট? সে দায়িত্বটা না হয় আমিই নিলাম' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১২৭)। ফেলু মিঞার এই গদির লোভের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছে জাহেদ, 'প্রেসিডেন্ট আপনি? ও, কাজের নেই দেখা, আর এখনি গদি ভাগাভাগি?' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১২৭)। এভাবেই জাহেদ ইংরেজ শাসকদের আস্থাভাজন জমিদার ফেলু মিঞার মুখের ওপর প্রতিবাদ করেছে। এখানে গদি মুখ্য নয়, আন্দোলনই মুখ্য। তাইতো জাহেদের গলায় পুনরায় বিপ্লবের সুর, 'আমাদের লড়াইয়ের ঘোড়ায় চড়ে আপনার মতো জমিদার তস্য জমিদাররা তখ্‌তে জেঁকে বসবেন সেটি হচ্ছে না কিন্তু। তীরের মতো কথাগুলো ছুঁড়ে মারল জাহেদ' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১২৭)। এভাবে স্বাধীনতার আন্দোলনে মেতে ওঠা জাহেদ পথে-প্রান্তরে বক্তৃতার ঝড় তোলে। তার এই আন্দোলন হলো ইংরেজ বিতাড়নের আন্দোলন। সে মনে করে শাসকের বদল হলেই মুসলমানদের ভাগ্যের বদল ঘটবে। তার জ্বালাময়ী বক্তৃতার রূপ, 'কথা তো নয়, যেন আগুনের ফুলকি আর মানুষের মুখে মুখে সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, ঘর থেকে ঘরে। আগুনের আঁচ পেয়ে সহসা বুঝি জেগে উঠে ঘুমন্ত মানুষ। ঝড়ের মত গ্রাম থেকে গ্রামে ছুটে বেড়ায় জাহেদ' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১৩১)। জাহেদের এই আবেদন সেকান্দরের মনেও ঝড় তোলে। তবে সে মুসলিম লীগের কর্মী জাহেদের মতো শুধু মুসলমানদের কথাই চিন্তা করছে না, হিন্দু হোক কিংবা মুসলিম হোক; তার কাছে মানুষ পরিচয়ই সবার আগে, 'প্রথমে মানুষ, তারপর ধর্ম। মানুষের জন্যই তো ধর্ম। ধর্মের জন্য মানুষ নয়' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১৫৩)। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুক্তির চেয়ে সেকান্দর তাই আগে সমাজের মুক্তি চায়। মানুষের মুক্তিই সেকান্দরের লক্ষ্য, 'জাহেদের উদ্দেশ্যে বলে, কদর্থ করছ কেন আমার বক্তব্যের? আমার কথা হল : সমাজটাকে মেরামত করো। শিক্ষা দাও, আলো দাও, গোঁড়ামির অচলায়তন ভেঙ্গে উন্মুক্ত করো বুদ্ধির দ্বারা, কুসংস্কারের বাঁধ ভেঙ্গে এনে দাও মুক্তির প্লাবন।' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১৩৩)। যে সমাজের মানুষ এখনো কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, তাদেরকে শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। তবেই তারা স্বাধীনতার মর্মার্থ বুঝতে পারবে। তাই সেকান্দরের কাছে 'স্বাধীনতা একটি ব্যাপক, একটি সম্পূর্ণ চিন্তাধারা, একটি সামগ্রিক জীবনবোধ। জীবনের সব ক্ষেত্রেই এর রয়েছে একটা অর্থ, তাৎপর্য। সেটা

হল জাগরণ এবং পুনর্গঠন-নৈতিক-আধ্যাত্মিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক-সর্বক্ষেত্রে। তার মানে সংগ্রামটা হবে কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী, প্রস্তুতি চলবে ঘরে ঘরে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ১৭২)। সেকান্দর চেয়েছে মানুষের চিন্তার মুক্তি, মানসিকতার বদল আর জাহেদ চায় রাজনৈতিক মুক্তি। তবে দুজনেই বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের কাছে, যারা বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, 'দুঃখ-কষ্ট ভুলে তারা শামিল আন্দোলনের কাতারে; গ্রামব্যাপী রাজনৈতিক সভা-মিছিল-কবিগানে উপস্থিত হয় দলে-দলে। আন্দোলনের স্পন্দন তাদের স্থবির জীবনে আনে গতি' (মহীবুল, ২০০২ : ১৩০)।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজ সংস্কারের ব্রত নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *লালসালু* উপন্যাসের আক্কাস। গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায় সে। কিন্তু তাকেও মোল্লাদের ফতোয়ার শিকার হতে হয়। দাড়ি রাখেনি বলে আক্কাসের সমাজ সংস্কারের স্বপ্ন বারবার বাধাগ্রস্ত হয়। বিশ্বসাহিত্যে জাহেদ চরিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি চরিত্র হলো ম্যাক্সিম গোর্কির *মা* উপন্যাসের পাভেল। সমাজ পরিবর্তনের ব্রত নিয়ে তরুণ পাভেল তার সমস্ত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়। অসাধারণ কৌশল ও বুদ্ধিমত্তায় নিপীড়িত মানুষকে বিপ্লবে আগ্রহী করে তোলে। ফলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে। *সংশপ্তক* উপন্যাসে শাসকের হাতে বন্দি জাহেদও যেন পাভেলেরই প্রতিরূপ।

সংশপ্তক উপন্যাসে শোষণ, যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে পড়া মানুষদের টিকে থাকার অবিরাম সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে। যুদ্ধের বাজারে কলকাতায় মালু হয়ে যায় মলিন কুমার দাশগুপ্ত ওরফে মালু। বেঁচে থাকার জন্য হুরমতি যোগ দেয় গোরাদের দলে। বাকুলিয়ার কৃষক লেকু হয়ে যায় নগরের রিকশাচালক। সৈয়দ বাড়ির সেই সরল কিশোরী রাবু, যে একদা বৃদ্ধ স্বামীর জন্য কেঁদে বুক ভাসিয়েছিল সেও আজ প্রতিবাদী। গবেষকের মতে,

> আধুনিক শিক্ষালাভের ফলে রাবুর বিবেক ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়। আত্মজিজ্ঞাসা আর আত্মবিশ্বাসে আজ সে একজন সজাগ নাগরিক। ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা থেকে যে বিদ্রোহের শুরু তা-ই তাকে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। নিজের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন রাবু জাহেদকে ভালবাসে কিন্তু সংসারী হওয়ার স্বপ্ন দেখে না। কারণ তাতে জাহেদের দেশ গড়ার স্বপ্নে চিড় ধরতে পারে। (সরিফা, ২০০৮ : ৪৪)

বিপ্লবী রাবু দাঙ্গার ভয়াবহতা রুখে দিতে প্রতিনিয়ত মিছিল সংগ্রামে ব্যস্ত থাকে। জাহেদের সতর্কতাকে উড়িয়ে দিয়ে সে বলে 'নিজেদের সামলিও তোমরা, দয়া করে আমাদের নিয়ে মাথা ঘামিও না, আমরা আত্মরক্ষা করতে জানি' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৫১)। এভাবেই সামাজিক সংস্কার ও সকল গোঁড়ামির বুকে লাথি মেরে রাবু নিজেকে পরিণত করে এক প্রতিবাদী, তেজস্বী নারীতে। দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে রাবু এখন একজন আলোকিত নারী। এক্ষেত্রে রণেশ দাশগুপ্তের মন্তব্য–

> রাবুর কথাই যদি ধরা যায়, তবে দেখা যাবে, সে স্বল্পভাষিণী হয়েও সেই বীর নারীদের একজনে পরিণত হয়েছে যারা বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোর বিপ্লবাত্মক ভাঙ্গাগড়ায় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে। বাস্তবতা দিয়ে গড়া এমন একটি নারী চরিত্র সমগ্র বাংলা উপন্যাসের গতিধারায় খুব কমই আঁকা হয়েছে। (রণেশ, ১৯৭৩ : ২২১)

জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া বিয়েকে তাই রাবু এখন অবলীলায় অস্বীকার করে, প্রত্যাখ্যান করে। 'কী সম্পর্ক আমার ওই বুড়োর সাথে! তাকে আমি স্বীকার করি না, মানি না। কোনো দিন মানি নি। দৃঢ় উদ্দীপ্ত কণ্ঠ রাবুর। কণ্ঠটা দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ৩৮৮)।

রাবু যেন *সুলতানার স্বপ্ন* উপন্যাসের ছায়াপাঠ। বেগম রোকেয়ার হাত ধরে বাংলায় নারী জাগরণের যে অগ্রযাত্রার সূচনা হয়েছিলো রাবু চরিত্রটি সে অগ্রযাত্রার সফল সোপান হিসেবে পরিণতি পেয়েছে। *সুলতানার স্বপ্ন* উপন্যাসে নারী মুক্তির যে স্বপ্ন আঁকা হয়েছিল রাবুতে তার বাস্তবায়ন লক্ষ করা যায়।

সংশপ্তক উপন্যাসের আরেকটি সংগ্রামী চরিত্র হলো মালু। সৈয়দ বাড়িতে আশ্রিত মালু এ উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনার সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত। মালুই যেন এ উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। সমগ্র উপন্যাসজুড়ে মালুর টিকে থাকার নিরন্তর সংগ্রাম। বাকুলিয়া-কলকাতা-ঢাকা আবার বাকুলিয়া, প্রতিটা স্তরে মালুর সংগ্রামী জীবন। অন্ধকার ভবিষ্যৎ তবুও বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় একটুও কমতি নেই, 'বাকুলিয়ার সেই বয়াতি ছেলেটি বাইশ বছরের জীবনে কত বিচিত্র পথ পাড়ি দিয়ে এল ও' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৫৭)। এই বিচিত্র পথ হলো লড়াইয়ের, সংগ্রামের। প্রচণ্ড আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে মালু পুরো উপন্যাসে বিচরণ করেছে। বিত্তবান জীবন সে কখনোই চায়নি। চিত্ত নিয়েই বাঁচতে চেয়েছে, তাইতো প্রচণ্ড ক্ষোভে নিজের এই দুরবস্থার জন্য রাবুকে বলে 'যারা মানুষ নয় তারা তো আস্তাবলেই থাকে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৫৮)। এই মালু রাবুর দুর্দশায়ও ক্ষেপে ওঠে। তাইতো বৃদ্ধ স্বামীর চিঠি পড়ার পর রাবুর নিস্পৃহতা সে সহ্য করতে পারে না, 'মালুর চোখের ক্ষতে আজ ঘৃণার আগুন। অজস্র শিখায় জ্বলে উঠল সে আগুন' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৬০)। রাবুকে সে বিদ্রোহের আহ্বান জানাচ্ছে 'তোমার কি ঘৃণা নেই? বর্বরকে কুৎসিতকে তুমি ঘৃণা করো না?' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৬১)। এভাবেই উপন্যাসটিতে মালুর বিপ্লবী সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মালুর এই ঘৃণা করার আহ্বানে রাবু উত্তর দেয় 'ঘৃণা আছে বলেই তো হাসতে পারি' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৬৫)। *সংশপ্তক* উপন্যাস যেন ঘৃণার আগুন ছড়ানো এক জ্বলন্ত জনপদের দলিল। এই ঘৃণা শোষকের বিরুদ্ধে, এই ঘৃণা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। এই ঘৃণা ইংরেজদের বিরুদ্ধে। জমিদার, মহাজনদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভই এই ঘৃণার জন্ম দিয়েছে। এখানে সেকান্দর, জাহেদ, রাবু, হুরমতি, লেকু ও মালু সবাই সংশপ্তক। পুনরায় যখন বৃদ্ধ স্বামী রাবুকে নিতে আসে, তখন রাবুর দৃঢ় উত্তর– 'না' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৬৫)। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী রাবু আজ আর সেই চৌদ্দ বছরের বালিকা নয়। এ রাবু জীবনযুদ্ধে লড়াকু এক সৈনিক রাবু। আত্মশক্তিতে সে আজ বলীয়ান, সে শক্তির বলেই রাবু আজ আলোর পথে চলছে। তাই রাবুর এই 'না' যেনো সকল নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে, সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে। যেন একটি বজ্রের বিস্ফোরণে কাঁপিয়ে গেল সারা ঘরটা, ঘরের লোকগুলোকে, মোজাদ্দেদী সাহেবকেও' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৬৬)। রাবু তার এই স্বাধীন জীবন নিয়ে খুশি। রাবুর এই সাহসী 'না' উচ্চারণকে মালু বলেছিল, 'এর নাম বিপ্লব। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ৩৩৭)। *সংশপ্তক* উপন্যাসে মালুর বিপ্লবও তেমনি দীর্ঘ। সর্বহারা মালুকে শেষে স্ত্রী রিহানাও পরিত্যাগ করে। রিহানাকে হারিয়ে সে যখন নতুন রাজধানী ঢাকায় ফিরে আসে তখন আর মালু বয়াতির আগের কদর নেই। নতুন ঢাকা শহরে আধুনিক গানের ভিড়ে যেন হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার মাটির গান, মানুষের গান, লোকসংগীত। শহরের সর্বত্র চলছে অনুকরণের এক

অসুস্থ প্রতিযোগিতা। সবাই নিজের ঐতিহ্যকে, নিজের সংস্কৃতিকে বর্জন করছে। কিন্তু মালু দেশের ঐতিহ্যকে বর্জন করবে না। একাই সে প্রতিবাদ করবে,

> 'উপেক্ষিত অনাদৃত হয়েই থাকুক মালু। আবার যখন আসবে গ্রহণের পালা তখন আপনার ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার নিয়ে ওদের সুমুখেই এসে দাঁড়াবে মালু। তদ্দিন? তদ্দিন আপনপথে একলাই চলবে, সেখানেই ওর জিত' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ৩৩৭)

এভাবেই মালু বয়াতি সাংস্কৃতিক লড়াই চালিয়ে যায় সদ্য স্বাধীন দেশে। পরিশেষে অশেষ গঞ্জনা নিয়ে ঢাকা বেতার থেকে প্রতিবাদ স্বরূপ নিজেই পদত্যাগ করে।

একটা সফল বিপ্লবের পূর্বশর্ত হলো ঐক্যবদ্ধ হওয়া। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই মুক্তির চূড়ান্ত মাধ্যম। এই সংগ্রাম শুরু হবে প্রথমে ব্যক্তিকে দিয়ে, তারপর ব্যক্তি থেকে সমাজে এবং সমাজ থেকে রাষ্ট্রে। তাই রাষ্ট্রের সচ্চরিত্র নির্মিত হবে ব্যক্তির সচ্চরিত্রের মাধ্যমে। সমাজকে দাঁড়াতে হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তাই ব্যক্তির পরিবর্তন বা প্রতিরোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, 'এখানে সেখানে ব্যক্তিগত প্রতিরোধ তখনই সার্থক যখন সেটা রূপান্তরিত হয় সমষ্টিগত প্রতিবাদে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৬৭)। রাবুর এ উক্তিটিই যেন পুরো উপন্যাসে ঝংকৃত হয়। সেকান্দর, জাহেদ, লেকু, ফজর, হুরমতি ও মালু প্রত্যেকেই প্রথমে ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে প্রতিরোধ শুরু করেছে, পরে তা জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়। ১৯৪৭ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এই দাঙ্গা রুখতে জাহেদ ও রাবুর অংশ নেয় শান্তি কমিটির আন্দোলনে। আবার মহামারি বসন্তে যখন পুরো গ্রাম মৃত্যুর মড়কে আক্রান্ত, তখনো মানুষের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করে জাহেদ, রাবু, সেকান্দর ও মালু। প্রকৃতির এই নির্মম আচরণের বিপক্ষেও তারা বুক চিতিয়ে লড়াই করে যায়, 'মৃত্যুর জন্য জীবন কখনো অপেক্ষা করে না। মৃত্যুর পাশাপাশিই জীবনের অস্তিত্ব' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ৩৮০)। তাইতো ওরা প্রাণপণে জীবনের পক্ষে লড়ে যায়। দাঙ্গার পর কলকাতা নগরীতে হুরমতি ও লেকুকে দেখে মালু অবাক হয়। এত লড়াই সংগ্রামের পরেও ওরা বেঁচে আছে। জীবনের নির্মম বাস্তবতায় ওরা হয়তো অনেক রক্তই ঝরিয়েছে। তবুও ওরা হারেনি। দুজনে মিলে আবার হয়তো কোথাও ঘর পেতেছে, 'উজোন টেনে টেনে ওরা ক্লান্ত হয় নি এখনো। কত ঘূর্ণির আবর্তে পড়েছে। স্রোতের মোচড়ে হাড় ভেঙেছে, ছিটকে পড়েছে' (শহীদুল্লা, ২০০০ : ২৯৫)। তবুও প্রচণ্ড মনোবল নিয়ে এখনো ওরা টিকে আছে। সত্যিকারের সংশপ্তক হয়ে অবিরাম যুদ্ধ করছে নির্মম বাস্তবতার বিরুদ্ধে। এই অদম্য মনোবলই *'সংশপ্তক'* উপন্যাসের বিপ্লবী চরিত্রগুলোর মূল সুর।

যুগে যুগে শোষকের সঙ্গে বিপ্লবীদের অগ্রযাত্রা সমান্তরাল। সে-কারণে সমাজ দ্বান্দ্বিক গতিতে এগিয়ে চলে। এতে শোষকের পতন অনিবার্য। বিপ্লবের অগ্নিশিখায় দগ্ধ হয় শোষক শ্রেণি। ধ্বংস হয় শোষণের কালোহাত। উদয় হয় নতুন দিনের। বিপ্লবীদের পতন নেই, বিপ্লবীদের ধ্বংস নেই। আলোকিত সূর্যের মতো তারা জ্বলতে থাকে মানবতার মুক্তির উজ্জ্বল সৈনিক হয়ে। শাসকদের রক্তচক্ষুকে তারা ভয় করে না। পরোয়া করে না। শহীদুল্লা কায়সারের *সংশপ্তক* উপন্যাসের চরিত্রগুলো এর বাস্তব উদাহরণ। তাই শাসকের হাতকড়া পরেও জাহেদ বলে যায় 'আমি আসব'। (শহীদুল্লা, ২০০০ : ৪০০)। জাহেদের এই ফিরে আসার ইচ্ছা শোষকদের উৎখাত করে সর্বহারার মুক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য। জাহেদের এই ফিরে আসার ইচ্ছা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, জাতীয় মুক্তির জন্য। এভাবেই জাহেদের

মতো *সংশপ্তক* উপন্যাসের প্রত্যেকটি সংগ্রামী চরিত্র সত্যিকারের সংশপ্তকে পরিণত হয়েছে, 'জাহেদ-রাবু-সেকান্দর-লেকু বাংলাদেশের জনগণের প্রতিভূ। তারা যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে সেই নয়া-ঔপনিবেশিক শাসকদের অনুচরদের নিপীড়ক চেহারাটাকে সামনে এনেই উপন্যাসটিকে শেষ করেছেন সংশপ্তকের শিল্পরূপকার' (রণেশ, ১৯৭৩ : ২২৪)।

সহায়কপঞ্জি

অশোক মিস্ত্রি (২০০৮)। *শহীদুল্লা কায়সার : জীবন ও সাহিত্য*। শোভা প্রকাশ, ঢাকা।

গোলাম সাকলায়েন [সম্পাদক] (১৯৮৭)। *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী*-২য় খণ্ড। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মহীবুল আজিজ (২০০২)। *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ*। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।

মুহম্মদ ইদরিস আলী (১৯৮৮)। *আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা : বিভাগোত্তর কাল*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রণেশ দাশগুপ্ত (১৯৭৩)। *উপন্যাসের শিল্পরূপ* (২য় সংস্করণ)। কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শফিউল আযম ডালিম (২০০১)। *দুই বাংলার উপন্যাস : প্রেক্ষিত দুর্ভিক্ষ*। জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা।

শহীদুল্লা কায়সার (২০০০)। *সংশপ্তক* (প্রথম সংস্করণ)। জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা।

সরিফা সালোয়া ডিনা (২০০৮)। *শহীদুল্লা কায়সারের উপন্যাস : বিচিত্রবীক্ষণ*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

আফ্রিকার ছোটগল্প : উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, দাসব্যবসা ও আফ্রিকী জীবন

জাবেদ ইকবাল*

[সারসংক্ষেপ : আফ্রিকী জীবন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ ও সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও প্রকাশক হিসেবে আফ্রিকার ছোটগল্পগুলো অনন্য। গল্পগুলোতে রূপায়িত হয়েছে উপনিবেশবাদ, দাসব্যবসা, বর্ণবাদ ও আফ্রিকী জীবনের সার্বিক চিত্র। গল্পগুলো আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিকদের দ্বারা রচিত হলেও এর মূলভাব এক ও অভিন্ন, আর তা হলো আফ্রিকী সত্তার রূপায়ণ। গল্পগুলোতে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের লেখকগণ কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনো প্রচ্ছন্নভাবে রূপক-প্রতীকের আবরণে রূপায়ণ করেছেন ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ, অত্যাচার, বঞ্চনা ও বঞ্চনার উপলব্ধি, দাসব্যবসা, বর্ণবাদ ও শ্রেণিবিভক্ত সমাজের নিপুণচিত্র। তবে শুধু এগুলোর রূপায়ণ করেই তাঁরা থেমে যাননি, বরং প্রকাশ করেছেন বঞ্চনার অবসান প্রকাশক এক অপরিমেয় আশার বাণী ও সোনালি সুদিনের আগমনের প্রত্যাশা, যেখানে প্রকাশিত হয়েছে একটি সুন্দরজীবন, স্বাধীনদেশ এবং মানুষ হিসেবে মৌলিক চাহিদা ও অধিকারগুলো পূরণ করে বেঁচে থাকার জন্য আকাঙ্ক্ষা।]

পৃথিবীর সাতটি মহাদেশের অন্যতম একটি আফ্রিকা। পাশ্চাত্যের পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে লেখা ইতিহাসে যাকে অভিহিত করা হয়েছে 'বন-জঙ্গলে ভরা পৃথিবীর উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা' কিংবা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' হিসেবে। কিন্তু নিরপেক্ষ মূল্যায়নে আফ্রিকা কোনোভাবেই 'পৃথিবীর উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা' বা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' নয়, বরং মানবসভ্যতার সূতিকাগার; যে সৃষ্টির প্রথম প্রহরে সমুদ্রের বুক থেকে জেগে উঠেছিল, লালন করেছিল মানবকে ও তার সভ্যতাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়,

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা-নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা –
বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।
সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি
সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য,
চিনছিলে জলস্থল-আকাশের দুর্বোধ সংকেত,
প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬৭ : ৪৯)

* প্রভাষক, রবীন্দ্র অধ্যয়ন বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

অরুণ বসু বলেছেন, "পৃথিবীতে মানববর্গ আবির্ভাবের একমাত্র অথবা অন্যতম প্রধান কেন্দ্রভূমি ছিল আফ্রিকা মহাদেশের কোন একটি বা কতিপয় দেশ" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৬৯)। বস্তুত আফ্রিকা সম্পর্কে এই নিকৃষ্টতম প্রচারটা করেছে পাশ্চাত্যের শ্বেতাঙ্গ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিগণ। তাঁরা আফ্রিকাকে অভিহিত করেছে 'বন-জঙ্গলে ভরা পৃথিবীর উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা' কিংবা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' হিসেবে। তাঁরা আফ্রিকাকে গণ্য করেছিল একটি পাড়া বা মহল্লা হিসেবে। আফ্রিকাকে তাঁরা কখনোই বিবেচনা করেনি অনেকগুলো দেশ ও জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল ও মহাদেশ রূপে। তাঁরা কখনোই বলেনি যে, এই জনগোষ্ঠীগগুলোর আচার-ব্যবহার, রীতি, নীতি, অভ্যাস, সংস্কার কখনোই একই রকম নয়। আফ্রিকার বনজ, খনিজ ও জীব সম্পদ যে বিচিত্র রকম, বহুরূপী, বহুভিন্ন, বহুপ্রকার এবং তাদের একেক দেশের ঠিকানা ও বিবর্তন যে নানাভাবে হয়েছিল– এসব কথা তাঁরা এড়িয়ে গিয়েছিল কিংবা ভুলে থাকতে চেয়েছিল। তা না হলে তাঁরা বুঝতে পারত যে, গ্রিক ও লাতিনের পর ইউরোপের অনেক দেশেই যখন নিজস্ব কোনো লিখিত ভাষারূপ উদ্ভাসিত হয়নি, তারও অনেক আগেই আফ্রিকার কিছু কিছু দেশে লিখনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাদের ঐতিহ্য, পরম্পরা, অভ্যাসও সবসময় ঠিক একই রকম ছিল না। এরা কখনো বিবেচনাই আনতে চায় না যে, মিশরও আফ্রিকার একটি দেশ, আর এই মিশরের গুহাচিত্রেই লিপির প্রথম নিদর্শন পেয়েছে মানুষ। মিশরের মতো সুদানেও এমনকি সাহারা মরুভূমির ওপরের বা নিচের দেশসমূহের প্রাকৃতিক দৃশ্য, জীবনযাত্রার ধরন, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার ও জীবনের ছন্দ ছিল অন্যরকম। সেখানে কখনো একই দেশে গড়ে উঠেছিল বহুভাষা, বহুমত, বহুপরিধান।

আমরা যদি উন্মুক্তদৃষ্টি দিয়ে আফ্রিকার ভূমির দিকে লক্ষ করি, তাহলে দেখব যে, আফ্রিকার মোট ভূমির মাত্র ৫ শতাংশ জঙ্গল, আর আফ্রিকার সভ্যতা, বিশেষত নীল নদের অববাহিকায় গড়ে ওঠা সভ্যতা গ্রিক সভ্যতার চেয়ে কোনো অংশে কম ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন নয়। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের লেখকেরা কলোনাইজারদের তৈরি কল্পিত আখ্যানকে ভেঙে দিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে উপনিবেশিত ও প্রাক-ঔপনিবেশিক সময়ের চিত্রের তুলনামূলক রূপায়ণের মধ্য দিয়ে, ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদদের তৈরি মিথ্যাচারের স্বরূপ উন্মোচন করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ইউরোপীয়দের আগমনপূর্ব আফ্রিকার অতীত কোনোভাবেই অসভ্যতা ও বন্যতায় ভরা কোনো দীর্ঘরজনী ছিল না। এজন্য বিষ্ণু বসু মন্তব্য করেছেন, "আফ্রিকাকে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' বলে অভিহিত করা মানে মূলত আমাদের 'শিক্ষিত মানসিকতা'কে আরো বেশি অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়া" (বিষ্ণু, ২০০৫ : ২৫)।

দুই

আফ্রিকার ছোটগল্প বলতে আমরা, যে বিশাল-বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন লেখকের লেখা গল্পকে নির্দেশ করতে চাচ্ছি, সেই ভূ-খণ্ডটি হলো পৃথিবীর মানচিত্রের অন্যতম একটি মহাদেশ আফ্রিকা। "জল আর ডাঙ্গার লক্ষ লক্ষ বছরের ভাঙ্গাগড়ার খেলায় পৃথিবীর স্থলভাগের মধ্যে আফ্রিকা শক্ত মাটির দেশ" (শাহেদ, ২০১২ : ১১)। যেখানে লক্ষ লক্ষ বছর আগে মানুষ ও মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল; যার আয়তন এক কোটি ষোলো লক্ষ পঁচাশি হাজার বর্গমাইল; দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ৫২০০ মাইল, প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিমে ৪৬০০ মাইল; যার উত্তরে রয়েছে ভূমধ্যসাগর, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণ পাশে ভারত মহাসাগর,

পূর্বে ভারত মহাসাগর, আরব মহাসাগর, লোহিত সাগর; যার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে বিষুব রেখা, উত্তরাংশে সাহারা মরুভূমি, সেখান দিয়ে গেছে কর্কটক্রান্তি রেখা, দক্ষিণাংশে কালাহারি মরুভূমি, সেখান দিয়ে গেছে মকরক্রান্তি রেখা। এই ভূ-খণ্ডের উত্তর-পূর্বে আরব উপদ্বীপ, দক্ষিণ-পূর্বে মাদাগাস্কার দ্বীপ। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বিচিত্র ভূগোল ও পরিবেশের মধ্যে ৫০টি দেশে ৭৫টি নৃগোষ্ঠীর প্রায় ১০০ কোটি মানুষ বাস করে; আঞ্চলিক সংস্কৃতির ভিত্তিতে যাদেরকে প্রায় ৭৫টি আদিবাসীর ভূমিতে ভাগ করা যায়। ভূগোলে আফ্রিকার অবস্থান মোটামুটি নির্দিষ্ট হলেও মিশর ও ইথিওপিয়া বাদে এই বিরাট মহাদেশ মানবসভ্যতার ইতিহাসে এখনো পর্যন্ত তার যথাযোগ্য পরিচয় লাভ করে নি। আফ্রিকার অধিবাসীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজ-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, ধর্ম, শিল্পকলা, চিত্তসম্পদ নিয়ে ঐ মহাদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের অধ্যবসায়ী সাহিত্যিকেরা রচনা করেছেন অনন্যসাধারণ কবিতা, ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাসসহ বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে আফ্রিকী জীবন-জীবিকা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি-মূল্যবোধ, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের তীব্র যন্ত্রণা, দাসব্যবসা ও বর্ণবাদের চিত্র তথা আফ্রিকার সার্বিক জীবন। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের কথাসাহিত্যিকদের রচিত ছোটগল্পে কীভাবে উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, দাসব্যবসা ও আফ্রিকী জীবনের রূপায়ণ ঘটেছে তারই অন্বেষণ করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। আকরগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে শিবনারায়ণ রায় ও শামীম রেজা সম্পাদিত *আফ্রিকার সাহিত্য সংগ্রহ* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডকে।

তিন

আফ্রিকার সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে প্রধান একটি সমস্যা হলো ভাষা। ভাষাতাত্ত্বিকদের বরাত দিয়ে আফ্রিকার সাহিত্য আলোচক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ জানিয়েছেন, বর্তমানে–

> আফ্রিকায় ভাষা রয়েছে ৭৩০টির বেশি। এগুলোকে তারা আবার চারটি ভাষা দলে বিভক্ত করেছে– ১. কংগো করদোফীয়, ২. নিল সাহারীয়, ৩. আফ্রো এশীয়, ৪. খইসান। কংগো করদোফীয় মূলত বানটু ভাষা থেকে উদ্ভূত ভাষাগোষ্ঠী... এ গোষ্ঠীর ভাষা সংখ্যা ৪৫০-এর বেশি– শুধু তানযানিয়া অঞ্চলেই রয়েছে এ ভাষার ৮০টির বেশি রূপ। নিল সাহারীয় গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার হয় নিল নদী, নাইজার নদী ও সুদান অঞ্চলে। খইসান আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের ভাষা (শাহেদ, ২০১২ : ২৫)।

–এটা আফ্রিকার নিজস্ব ভাষাগুলোর চিত্র। উপনিবেশ পরবর্তী আফ্রিকার দিকে তাকালে আমরা দেখব যে, আফ্রিকার নিজস্ব ভাষাগুলোর পাশাপাশি সেখানে ঔপনিবেশিক প্রভুদের ভাষা ব্যবহারের একটা সক্রিয় প্রবণতা বিরাজমান। এই প্রবণতা ক্ষেত্র বিশেষে এতটাই প্রবল যে, কলোনাইজারদের ভাষা আফ্রিকার নিজস্ব ভাষাকে হটিয়ে সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে। এই প্রবণতা শুরু হয়েছিল মোটামুটি সপ্তম শতকে। তখন থেকেই আফ্রিকার উত্তর অংশে আরব সংস্কৃতির প্রভাব ও প্রসার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ঐ সময় থেকেই উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে আরবি ভাষা শিক্ষিত ও অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের মূল ভাষায় পরিণত হয়। আঠারো শতক পরবর্তীকালে যখন ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো আফ্রিকাকে গ্রাস করে নিতে থাকে তখন ইংরেজি, ফরাসি, পর্তুগিজ ও ওলন্দাজ ভাষা প্রসার লাভ করে আফ্রিকায়; এমনকি আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে ইংরেজি ও ওলন্দাজ ভাষার উপভাষাও তৈরি হয়। এর ফলে দেখা যায় যে, উপনিবেশ পরবর্তী আফ্রিকার বর্তমান সমাজে শিক্ষিত ও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই মোটামুটি দুইটি বা তিনটি ভাষায় পারদর্শী– ক. ইংরেজি বা ফরাসির সঙ্গে আরবি

খ. ইংরেজি বা ফরাসির সাথে পর্তুগিজ বা ওলন্দাজ। এর পাশাপাশি প্রায় সবাই তাদের স্ব-স্ব গোষ্ঠীর ভাষায় কথা বলতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে এই ভাষা দুটি বা তিনটি নৃগোষ্ঠীর ভাষাও হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতাটা হলো দৈনন্দিন, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনে ইংরেজি, ফরাসি, পর্তুগিজ ও ওলন্দাজ ভাষার এত ব্যবহার সত্ত্বেও আফ্রিকার সাধারণ মানুষ এসব ইউরোপীয় ভাষায় অজ্ঞই রয়ে গেছে। আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শাসনের দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখবো যে, দীর্ঘকাল ধরে আফ্রিকাকে শাসন করেছে আরব, ইংরেজ, ফরাসি ও পর্তুগিজরা। এই ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর ভাষাই কার্যত হয়ে উঠেছে আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকার মানভাষা। এই ভাষাগুলোতেই মূলত লিখিত হয়েছে কিংবা হচ্ছে আফ্রিকার সাহিত্য। একারণে আমরা দেখবো, ঔপনিবেশিকতার সূত্রেই পশ্চিম এশীয় আরবি ভাষার সাহিত্যের এক বিশাল ভান্ডার ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা জুড়ে। তবে ভাবের দিক থেকে উত্তর আফ্রিকার আরবি সাহিত্য বিশেষত মিশর ও লিবিয়ার সাহিত্য আফ্রিকার সাহিত্যের মূল ধারার সঙ্গে সমান্তরাল নয়। মিশরের সাহিত্য স্বকীয়তা ও বিশিষ্টতা নিয়ে বিশ্বসাহিত্যে সমাদৃত। এরই সমান্তরালে আফ্রিকার বিভিন্ন আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাতেও সাহিত্য রচিত হয়েছে কিংবা হচ্ছে। তবে আফ্রিকার বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাতে সাহিত্য যে কম রচিত হয়েছে বা হচ্ছে না তার কারণ, আফ্রিকার অনেকগুলো নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার নিজস্ব লিপি নেই এবং ভাষীর ও উত্তরাধিকারীর অভাবে বেশ কিছু ভাষা বিলুপ্তির আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

> দাস ব্যবসার যখন সূচনা হচ্ছিল তখন আফ্রিকাবাসীরা ছিলো 'কাঠ, পেতল আর লোহার কাজে ওস্তাদ শিল্পী, তারা ধাতু গলিয়ে নিয়ে নিত্য সব শিল্পসামগ্রী তৈরি করতে শিখেছিল শ্বেতাঙ্গরা আফ্রিকায় পা দেবার অনেক আগেই, আর তাদের অনেক গোষ্ঠীরই ছিলো উদ্‌ঘাতমুক্ত অতীব উন্নত ধর্মাচার, সুষ্ঠু সমুন্নত অর্থনৈতিক রীতিনীতি, সুদক্ষ কৃষিব্যবস্থা ও কৃষিচর্চা, প্রশংসনীয় আইনি ব্যবস্থা ও তার বিধিবিধানসংহিতা... ভাস্কর্য, লোকসাহিত্য আর সংগীত ... কিন্তু তারা উদ্ভাবন করেনি বহুল প্রচারিত লিখিত ভাষা। (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৭৬)

কবি বেলাল চৌধুরীর মতে, "কৃষ্ণ আফ্রিকার যা কিছু অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, সামাজিক রীতিনীতি সবই চলে আসছিল মুখে মুখে রচিত গাথায়, শ্লোক, কিংবদন্তির মারফত লোকমুখে বংশানুক্রমে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৬৪)। এমতাবস্থায় যে বড় একটা প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায় তা হলো : আফ্রিকার লেখকেরা কোন ভাষায় সাহিত্য রচনা করবে? এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আফ্রিকার শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিকদের মধ্যেই মতভেদ রয়েছে। কেনিয়ার কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও চিন্তাবিদ নগুগি ওয়া থিওঙ্গ (Ngugi wa Thiong'O, 1938–)-এর মতো অনেকেই মনে করেন, "আফ্রিকার সাহিত্য হতে হবে আফ্রিকার ভাষাতেই; কেননা একটা সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি অন্য ভাষায় বর্ণনায় অনেক সময় প্রাণহীন ও অবাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে" (শাহেদ, ২০১২ : ২৬)। তিনি পশ্চিমাদের ভাষায় আফ্রিকার সাহিত্য রচনাকে উদ্ভট বলে মনে করেন। তাঁর দৃষ্টিতে এগুলো হলো "আফ্রিকাকে অন্তহীন দাসত্বে আটকে রাখার সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা" (শাহেদ, ২০১২ : ২৬)। তাঁর মতো আফ্রিকার অনেক সাহিত্যিকই মনে করেন, "আফ্রিকার বিশিষ্ট নান্দনিক উত্তরাধিকার অন্য ভাষায় প্রকাশ করলে তা হবে বহিরারোপিত এবং আফ্রিকার সাহিত্যের বিকশিত হওয়ার পথে তা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে" (শাহেদ, ২০১২ : ২৬)। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নাইজেরীয় নাট্যকার ওলে সোয়িঙ্কা (Wole Soyinka, 1934–) এরূপ

মতবাদের বিরোধী। তিনি মনে করেন, দৈনন্দিন জীবন থেকে সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক জীবনে আমরা যেখানে প্রতি মুহূর্তে পাশ্চাত্য দ্বারা প্রভাবিত, সেখানে পাশ্চাত্য প্রভাবকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনার প্রয়াস 'উদ্ভট', কারণ পারিপার্শ্বিক পাশ্চাত্য প্রভাবকে ব্যক্তির মন থেকে দূর করা নম্ভব নয়। বুকার পুরস্কার বিজয়ী নাইজেরীয় কথাসাহিত্যিক চিনুয়া আচেবে (Chinua Achebe, 1930–2013) অবশ্য এক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন, আফ্রিকার সাহিত্য পাশ্চাত্যের ভাষাতেও রচিত হতে পারে আবার আফ্রিকার নিজস্ব দেশীয় ভাষাতেও রচিত হতে পারে।

এমন পরিস্থিতিতে আফ্রিকার সাহিত্যিকগণ কিছু পন্থা অবলম্বন করেছেন। যেসব আফ্রিকান সাহিত্যিক পাশ্চাত্যের ভাষা ও রীতিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তাঁরা প্রথমে তাঁদের সাহিত্য ঐ ভাষাতেই লিখছেন এবং পরবর্তীকালে স্বগোত্র বা স্বদেশী ভাষায় তা ভাষান্তর করছেন। আবার যাঁরা কলোনাইজারদের ভাষায় আফ্রিকার সাহিত্য রচনার তীব্র বিরোধী তাঁরা প্রথমে স্বগোত্র বা স্বদেশি ভাষায় সাহিত্য রচনা করছেন এবং পরবর্তীকালে তা পশ্চিমা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করছেন। আফ্রিকার সাহিত্যিকগণ এটা উপলব্ধি করেছেন যে, বাস্তবিক অর্থে কলোনাইজারদের ভাষা যেহেতু বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত তাই তাদের প্রতি বিরাগ কিংবা ঘৃণা থাকলেও সকল দেশের পাঠকদের কাছে স্বদেশি-সাহিত্যকে পৌঁছানোর স্বার্থে সেসকল ভাষায় সাহিত্য রচনাকে নেতিবাচকভাবে দেখা ঠিক নয়। আমাদের বিবেচনায় আফ্রিকার সাহিত্য কোন ভাষায় রচিত হলো সেটা প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। মুখ্য বিবেচ্য বিষয় হলো, যে সাহিত্যকর্ম রচিত হলো তার বিষয়বস্তু, স্বরূপ ও প্রকৃতি আফ্রিকী কি না? এমতাবস্থায় আফ্রিকী সাহিত্যের বিষয়বস্তু, স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক বলে বিবেচনা করি।

চার

আফ্রিকার সাহিত্য বলতে আমরা পূর্বে উল্লিখিত ভূগোলের ঐসব সাহিত্যকে নির্দেশ করতে চাচ্ছি, যাদের প্রেক্ষাপট একান্তভাবেই আফ্রিকী; যারা রূপবৈচিত্র্যে অসাধারণ এবং আকৃতিতেও বিশাল। সেখানে প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত হবে সেই মহাদেশের মানুষের জীবনের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, জীবনাচরণ, সমাজকাঠামো ও মূল্যবোধ, উপনিবেশের নির্যাতিত জীবনযাপন ও এর প্রতিবাদ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংঘাত, পশ্চিমাদের অপরমানুষ হিসেবে দেখার প্রবণতা, প্রতিনিয়ত আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান, সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন প্রভৃতি। যেখানে এসবের রূপায়ণে ব্যবহৃত হয়েছে দেশীয় কিংবা গোত্রীয় ঐতিহ্যবাহী আঙ্গিকের ব্যবহার, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে এসব আঙ্গিকের সঙ্গে আরবি ও পাশ্চাত্য সাহিত্য আঙ্গিকের মিশ্রণ। একারণে আফ্রিকার অধিকাংশ সাহিত্যিকই সাহিত্য রচনা করেন আফ্রিকী অনুভূতিকে ভিত্তি করে, বিষয়বস্তুতে আফ্রিকার স্বার্থের প্রতি অনুরক্ত থেকে এবং একটি আফ্রিকান আঙ্গিক তৈরি করে। বিষয়বস্তুকে রূপায়ণের প্রয়োজনে আফ্রিকার সাহিত্যিকেরা এরকম একটি মিশ্রআঙ্গিক তৈরি করলেও ইউরোপীয় সাহিত্যের সাথে আফ্রিকার সাহিত্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। ইউরোপীয় সাহিত্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সেখানে রূপায়িত হয়েছে ব্যক্তিজীবনের প্রতিচ্ছবি, পক্ষান্তরে আফ্রিকার সাহিত্য গোষ্ঠীজীবনের প্রতিচ্ছবি সেখানে রূপায়িত হয়েছে কৌমজীবনের পরম্পরার ছন্দ। সমালোচকের মতে,

'প্রকৃতির দিক থেকেও ইউরোপীয় সাহিত্য ও আফ্রিকার সাহিত্য ভিন্ন। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য মূলত অ্যাকাডেমিক; আফ্রিকার সাহিত্য প্রায়োগিক– তাদের জীবনাচরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ' (শাহেদ, ২০১২ : ৩১)। সমালোচকের এই মন্তব্য সর্বাংশে যথার্থ। এর প্রমাণ আমরা পাবো আফ্রিকার গল্পগুলোতে। সেখানে আমরা দেখবো যে, শত শত বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে শোষিত ও শাসিত হওয়ার পরেও আফ্রিকার মানুষেরা তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বিস্মৃত হয়নি কিংবা পরিত্যাগ করেনি বরং সেগুলোকে তারা টিকিয়ে রেখেছিল, কারণ তাদের সংগ্রাম ছিল পশ্চিমা শাসনের বিপরীতে। এর পাশাপাশি তাদের ছিল নিজেদের দুঃখ ও দুঃখের কারণ সম্পর্কে সচেতনতা এবং অস্তিত্বরক্ষার জন্য সদাজাগ্রত সংগ্রামীচেতনা, যে চেতনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে আফ্রিকার সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণ। আফ্রিকার লেখকেরা যখন বুঝতে পেরেছেন প্রত্যক্ষভাবে কলোনাইজারদের অপশাসন ও শোষণের প্রতিকার কিংবা প্রতিরোধ সম্ভব নয়, তখন তাঁরা প্রতিরোধকে রূপায়ণের উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছেন সাহিত্যকে। সমালোচকের মতে,

> আফ্রিকাবাসীও বিশ্বাস করত যে সংস্কৃতি কিংবা নন্দনতত্ত্ব রাজনীতির ঊর্ধ্বে নয়। সংস্কৃতিকে হয় অত্যাচারিতের পক্ষে কিংবা অত্যাচারীর পক্ষে অবস্থান নিতে হবে; এর মধ্যবর্তী কোনো পথ নেই। বিদেশি শাসকদের শিক্ষা-সংস্কৃতিকে কৃত্রিমভাবে চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ তার মধ্যেই আফ্রিকার সংস্কৃতির বিকাশ (শাহেদ, ২০১২ : ২৩)।

বর্তমান পৃথিবীতে বিদ্যমান অসহিষ্ণুতা, অবিচার, ঊষরতা এবং বিপুল শূন্যতা থাকা সত্ত্বেও আফ্রিকার সাহিত্যিকেরা সকল দুর্ভাগ্যের ঊর্ধ্বে উঠতে চেয়েছেন। তাঁরা প্রার্থনা করেছেন একার জন্য নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। কেননা তাঁরা বিশ্বাস করেন, দুর্ভাগ্যের তিমির-রজনী পেরিয়ে পাখির কূজনের মধ্যদিয়ে নতুন সকাল অবশ্যই আসবে। তাঁরা আফ্রিকার একটি চিরন্তন প্রাচীনতায় বিশ্বাস করেন; একটি মৌলিক আদিম শূচিতার ওপর নির্ভর করেন এবং জনসাধারণের বিভিন্ন অভিচার, সম্মোহন ও কর্মের অভিব্যক্তিকে স্বাগত জানান। এদিক থেকে তাঁরা পূর্ণভাবে কৃষ্ণ আফ্রিকার প্রতীক। তাঁদের সাহিত্যকর্মে আমরা কৃষ্ণ-শোণিতের কথা শুনি, কৃষ্ণ-জীবনের অভয় পাই। তালবীথির কৃষ্ণ ঘনিষ্ঠতার প্রশ্রয় দেখি (শামসুজ্জামান, ২০১১ : ১২)। তাঁদের সাহিত্যভূবন "অনেক সময়ই আদর্শায়িত রোমান্টিক কল্পনাজাত, কিন্তু কাব্যিক সত্যে উদ্ভাসিত। এই ভূবনে কল্পনা আর বাস্তবের মাঝখানে যে সীমারেখা তা প্রায়ই ধূসর, দুর্নীরিক্ষ্য" (শামসুজ্জামান, ২০১১ : ১৩)। তাঁরা নিজেদের অনুভব উপলব্ধিকে তাঁদের সাহিত্যকর্মে অভিযোজিত করে নিয়েছেন। স্বীয় উপলব্ধিকে প্রকাশ করার জন্য কেউ কেউ বুলেটের মতো ভাষা ব্যবহার করে সংগ্রামে নেমেছেন সেইসব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যারা গোটা মহাদেশটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছিল। আফ্রিকাকে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সে মহাদেশের কবি সাহিত্যিকদের ভূমিকা নির্দেশ করে কবি বেলাল চৌধুরীর বলেছেন,

> পর-রাজ্যলোভী সাদা মানুষদের একচেটিয়া প্রভুত্বের অধিকার খর্ব করে কৃষ্ণ আফ্রিকা আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। শুধু যে দাঁড়িয়েছে তাই নয়, বর্ণবাদ, আধিপত্যবাদ, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামও করে যাচ্ছে। সেটাও আবার শুধু রণ-ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও লড়ছে সমানে সমানে অকুতোভয়ে। ব্রতী হয়েছে নিজেদের অতীত ইতিহাস ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের সঠিক মূল্যায়নে। যার

> ফলে, নতুন প্রজন্মের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা যেমন নিজস্ব শিকড়জাত সৃজনশীল রচনায় সমৃদ্ধ করে চলেছেন আফ্রিকার শিল্প-সাহিত্যাঙ্গন তেমনি তার সঙ্গে মূর্ত করে তুলেছেন কালো আফ্রিকার সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ, ভালবাসা ও অকৃত্রিমতাকে। (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৬৪)

পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে আফ্রিকানরা যুক্তিবাদী মানুষ নন। একারণে আফ্রিকার কথা, কবিতা বা নৃত্যের তাল কখনোই কোনো যুক্তি ধরে এগোয় না; এখানে যুক্তির যোগ নেই। কিন্তু আফ্রিকার সাহিত্য পাঠে আমরা দেখি, আপাত যুক্তিহীন এই কবিতা বা নৃত্যের তালই তৈরি করে নতুন যুক্তি, কিংবা উন্মোচন করে নতুন সৃষ্টি রহস্যের দ্বার। আসলে পশ্চিমারা তাদের মতো করে আফ্রিকার সাহিত্যকে বিচার করতে চেয়েছে। তারা কখনো আফ্রিকান দৃষ্টি দিয়ে আফ্রিকার সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের বিচার করতে চায়নি। যদি তারা তা করত তাহলে বুঝত যে আফ্রিকার সাহিত্যিকদের "কাছে শব্দের থেকেও শব্দের মায়াবী ক্ষমতা বড়" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ২২৫)।

পাঁচ

ইংরেজি Colonialism শব্দের বাংলা পারিভাষিক শব্দ উপনিবেশবাদ। উপনিবেশবাদ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'উপনিবেশ' থেকে যার আভিধানিক অর্থ জীবিকা নির্বাহের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য দলবদ্ধভাবে বিদেশে গিয়ে বসতি স্থাপন। তাহলে উপনিবেশবাদের অর্থ দাঁড়ায় জীবিকা নির্বাহের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে অন্য জনগোষ্ঠীর ভূমিতে দলবদ্ধভাবে বাস করতে গিয়ে সেখানকার শাসনক্ষমতা দখল করে ঐ জনগোষ্ঠীর জনগণ, ভূমি ও সম্পদের ওপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন ও এ সম্পর্কিত তত্ত্ব-দর্শন। এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের। "সাম্রাজ্যবাদ যদি হয় তত্ত্বদর্শন তবে উপনিবেশবাদ হলো এর প্রায়োগিক বাস্তবতা" (ফকরুল, ২০১১ : ১২)।

আফ্রিকার গল্প পাঠ করতে গেলে উপনিবেশ স্থাপন ও উপনিবেশবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ লিখিত বা আনুষ্ঠানিকভাবে আফ্রিকার অধিকাংশ দেশই পশ্চিমা কয়েকটি দেশের উপনিবেশে পরিণত হয় উনিশ শতকের শেষার্ধে, কিন্তু অলিখিত বা অনানুষ্ঠানিক উপনিবেশে পরিণত হয় তারও দু-তিন শতক আগেই, যখন থেকে ইউরোপের সাথে তাদের দাসব্যবসা চালু হয়। আমরা যদি তন্নিষ্ঠভাবে আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাসকে পাঠ করি, তাহলে আমরা প্রত্যক্ষ করব যে, আফ্রিকার ওপর কলোনাইজারদের শ্যেনদৃষ্টি পতিত হয়েছিল অনেক আগেই। যিশু খ্রিষ্টের জন্মেরও ১১০০ বছর আগে অ্যাসিরীয়রা আগ্রাসন চালায় উত্তর আফ্রিকায় এবং পরবর্তীকালে তাদের অনুবর্তী হয় পারসিয়ান ও রোমানরা। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের শুরুতে উত্তর আফ্রিকায় অভিযান চালায় মুসলিমরা এবং তারা আফ্রিকার উত্তর উপকূল দখল করে। পনেরো শতকে ঘানা, কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক ও মোম্বাসায় বাণিজ্য ও বসতি স্থাপন করে পর্তুগিজরা। ষোলো শতকের শুরুতে পশ্চিমা উপনিবেশবাদের উপাদান নিয়ে তারা মোজাম্বিক দখল করে। সতেরো শতকে ডাচদের (সাবেক হল্যান্ড, বর্তমান নেদারল্যান্ড) একটি বণিকদল স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে দক্ষিণ আফ্রিকায়। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে তারা আফ্রিকায় প্রথম প্রতিষ্ঠা করে পশ্চিমা ঘরানার ঔপনিবেশিক

শাসন। তখন ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গদের পরিচয় ঘটল "এমন মানুষের সঙ্গে যার ত্বক কৃষ্ণবর্ণ, চুল কোঁকড়া, নাক চ্যাপ্টা আর চোখ রক্তিম। যে মানুষের হাসি সরল, যে মানুষ নাচ-গান দিয়ে তার সুখ-দুঃখকে প্রকাশ করত, যে মানুষ বর্তমান পর্যন্ত খরা, দৈন্য আর নানান কঠিন পরিস্থিতির প্রায়কিছুই জানত না– তাদের সম্পর্কে ঘোষিত হলো যে এরা মানুষ নয়" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ২২৫)। সেখানে তারা সাথে করে নিয়ে যায় অশ্বারোহী সৈন্য, আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের। পর্তুগিজ ও ডাচদের দেখানো পথ ধরে পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় পাড়ি জমায় ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্পেন ও বেলজিয়ামের লোকেরা। এভাবেই সূচনা ঘটতে থাকে আফ্রিকায় প্রাক্-আধুনিক যুগের উপনিবেশ স্থাপনের। বিশ্বব্যাপী উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে দেখা দেয় ইউরোপে ১৭৬০–১৮৬০ কালপর্বে ঘটে যাওয়া শিল্প বিপ্লবের পর থেকে। শিল্পের কাঁচামালের অবিরাম সরবরাহের জন্য ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য দরকার ছিল খনিজ সম্পদ ও কাঁচামালের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহের এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত বিদেশি বাজারের। আর এই বাজার সন্ধান ও তা দখলের জন্য ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশের মানুষগুলো ব্যবসায়ী কিংবা ধর্মপ্রচারকের বেশ ধরে বেরিয়ে পড়ল এশিয়া, আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার দিকে। উনিশ শতকের আশির দশক থেকে আরম্ভ হয় পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো কর্তৃক আফ্রিকার বিভিন্ন দেশকে উপনিবেশ হিসেবে আত্মীকরণ করে নেওয়ার পালা। "ঔপনিবেশিক দেশগুলোর স্বার্থের টানাপোড়েনকে আপাতত ধামাচাপা দিতে ১৮৮৪–৮৫এর বার্লিন সম্মেলনে ইউরোপীয় শক্তিগুলো কার্যত আফ্রিকার মানচিত্রের উপর পেনসিলের দাগ দিয়ে সমগ্র অঞ্চলটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেয়" (শাহেদ, ২০১২ : ১৬–১৭)। মানচিত্রের ওপর স্কেল বসিয়ে পেনসিলের দাগ দিয়ে ভাগ করে নেওয়ার কারণে আমরা দেখি যে, উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর সীমারেখা অনেকটা জ্যামিতিক সীমারেখার মতো।

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসের দিকে তাকালেও আমরা দেখবো যে, ইথিওপিয়া ও লাইবেরিয়া ব্যতীত আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় সব দেশই কোনো না কোনো পশ্চিমা দেশের উপনিবেশের শৃঙ্খল থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছে। মূলত বার্লিন সম্মেলনের পর থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কালপর্বেই আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয়দের উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। এই সময়ে ইতালি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল লিবিয়া ও ইরিত্রিয়ায়। পর্তুগাল অ্যাঙ্গোলা, কেপভার্দে, গিনি বিসাউ, মোজাম্বিক এবং সাওটোমে ও প্রিন্সিপে'তে। জার্মানি রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, ক্যামেরুন ও নামিবিয়ায়। স্পেন ইকুটোরিয়াল গিনি ও পশ্চিম সাহারা'য়। ফ্রান্স তিউনিশিয়া, আইভোরি কোস্ট, মাদাগাস্কার, নাইজার, সিসিলি, মৌরিতানিয়া, সেনেগাল, বারকিন ফাসো, জিবুতি, গিনি, আলজেরিয়া, গেবন, বেনিন, কঙ্গো, চাদ, মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র, কমোরোস'এ। বেলজিয়াম জায়ারে আর ব্রিটেন মালাবি, জাম্বিয়া, লোসেথো, উগান্ডা, কেনিয়া, সুদান, গাম্বিয়া, সোয়াজিল্যান্ড, ঘানা, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, সোমালিয়া, বতসোয়ানা, সিয়েরালিওন, মরিশাস, নাইজেরিয়া, মরোক্কো ও জিম্বাবুয়ে'তে।

ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো উনিশ শতক থেকে আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করে। "এজন্যে তারা

সবচেয়ে উর্বর জমিগুলো অধিগ্রহণ বা কিনে নিতে শুরু করে এবং যোগাযোগের সুবিধা সম্পন্ন জায়গাগুলোতে বসতি স্থাপন করে। এই কাজে যাতে বাধা না আসে সেজন্যে তারা স্থানীয় প্রভাবশালী মোড়ল-মাতব্বর, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপজাতীয় প্রধানদের অর্থ বা সম্পদের বিনিময়ে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসে" (শাহেদ, ২০১২ : ১৭)।

'একমুঠো খেজুর' গল্পে সুদানের কথাসাহিত্যিক তায়েব সালেহ রূপকের আবরণে উপনিবেশ স্থাপনের চিত্র তুলে ধরেছেন। স্বাতন্ত্র্য ও রচনার অনন্য ও অনুকরণীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁকে এখনকার পৃথিবীর আরবি ভাষায় লেখকদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলে মনে করা হয়। "আশ্চর্য তাঁর আখ্যান বিন্যাস, গল্প সাজাবার কৌশল, ভাষার আপাতসরল চালচলন– কিছুতেই কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বা অভিঘাত নেই" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৭৪)। উত্তমপুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত এই গল্পটিতে গল্পকার নিপুণভাবে প্রতীকী পরিচর্যার মাধ্যমে দেখিয়েছেন উপনিবেশ স্থাপনের কৌশলকে। এই গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্রই প্রতীকী চরিত্র। কথকের দাদা ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতীক। হোসেন বেপারী, মুসা জোতদারসহ অপর দুইজন হলো ঔপনিবেশিক শক্তির সহযোগিদের প্রতিনিধি। মাসুদ সাহেব হলো উপনিবেশিত আফ্রিকার প্রতীক। গল্পটি সম্পর্কে অনুবাদক বলেছেন,

> প্রথমত দাদার সাথে দৈত্যের সাদৃশ্য এবং পরবর্তীতে মাসুদের কাহিনীতে সে দৈত্যের আত্মপ্রকাশ। দ্বিতীয়ত দাদার ধর্মচর্চা এবং ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের প্রত্যেকের একমুখিতা। তৃতীয়ত কলোনাইজড পরাভূত শক্তিরূপে মাসুদের অতীত ও বর্তমান। আর সর্বশেষ 'খেজুরের কলজে' এই রূপচিত্রের প্রতীকী ব্যঞ্জনা। (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২৪)

আখ্যানের শুরুতেই আমরা পরিচয় পাই কথকের দাদার– যার শরীর লিকলিকে লম্বা, গালে লম্বা বুনো দাড়ি, নাক অস্বাভাবিক উঁচু; অনেকটা দৈত্যের মতো। তার সাথে কথা বলতে হলে মাথা আসমানের দিকে তুলে রাখতে হয়। তার দেহটা এতই উঁচু যে এমন কোনো ঘর নেই যে ঘরে ঢুকতে হলে তাকে মাথা নোয়াতে হয় না। অথচ তিনি মরুভূমির মাটির মতো রুক্ষ; কোনোদিনই হাসতেন না। এরপর পরিচয় পাই মাসুদ সাহেবের যিনি মুখে গান আর ঠোঁটে হাসি লাগিয়ে থাকা "একটা গোঁফ খেজুরে জাতীয় লোক" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২৬)। তার হাসি ছিল নীল নদের স্বচ্ছ পানির অবিরল প্রবাহের ধারার মতো। গল্পকার মূলত এই দুই চরিত্রের (কথকের দাদা ও মাসুদ সাহেব) মধ্য দিয়ে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তি ও উপনিবেশিত আফ্রিকাকে রূপায়িত করেছেন।

গল্পের কাহিনিতে কথক ও কথকের দাদার আলাপসূত্রে আমরা জানতে পারি যে, চল্লিশ বছর আগে কথকের দাদা যখন প্রথম এই এলাকায় আসেন তার এক ফেদান জমিও ছিল না। তখন এসবের মালিক ছিল মাসুদ। অথচ চল্লিশ বছরের ব্যবধানে আজ চিত্রটা ঠিক উল্টো। মাসুদ সাহেবের মোট জমির তিন ভাগের দুই ভাগ অর্থাৎ একশ ফেদান জমি, অগণিত খেজুর, স্যান্ট, সয়াল আর বাবলাগাছ যা মাসুদ সাহেব পেয়েছিল তার বাবার কাছ থেকে এখন তা কথকের দাদার হস্তগত হয়েছে। আর পরিস্থিতি এখন এমন যে, "ওপারের সমন পৌঁছার আগে মাসুদের বাকি জমিটুকুও আমারই হবে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২৬)। কিন্তু কেন এমন হলো?

দাদার ভাষ্যমতে, এর কারণ মাসুদের বিয়ের নেশা। মাসুদ বিয়ে পাগলা মানুষ। প্রত্যেকবার বিয়ের সময় সে দুই ফেদান করে জমি বিক্রি করেছে। সেই হিসেবে গল্পকথকের মতে, মাসুদের নব্বইটির মতো বউ থাকা দরকার কিন্তু আছে মাত্র তিনটি বউ। তাদের শরীরও জীর্ণ-শীর্ণ। এছাড়া তার রয়েছে ল্যাংড়া একটি গাধা আর তালি দেওয়া একটি জামা যেটি গায়ে দেওয়ার ফলে "মাসুদ সাহেব এখন ফকির মাসুদ" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২৭)-এ পরিণত হয়েছে।

—সাহেব মাসুদের ফকির মাসুদ হওয়ার কারণ হিসেবে দাদা যা বলেছে তা আসলে নতুন কিছু নয়। এগুলো কলোনাইজারদের বহুল কপচানো বুলিগুলোর অংশবিশেষ মাত্র। কলোনিয়াল শক্তিগুলো কলোনাইজডদের আসলে এভাবেই অভিহিত করেছে। তারা আদিম, অসভ্য, বর্বর, অলস, শিক্ষা ও সভ্যতার আলোহীন এবং নিজেরা নিজেদের শাসন করতে অক্ষম। এভাবেই তারা প্রথমে কলোনাইজড করেছে কলোনির মানুষের মনোজগতকে, বিভ্রম লাগিয়েছে তাদের দৃষ্টিতে, আবিষ্ট করেছে তাদের চৈতন্য। লক্ষ একটাই, তা হলো আমাদের মতো করে ভাবো, আমাদের চোখ দিয়ে বিশ্বকে দেখো সেইসঙ্গে নিজেকেও, নিজেদেরকেও। কারণ কাউকে দীর্ঘমেয়াদে শাসন করতে গেলে এই 'দেখা'টাকে নিয়ন্ত্রণ করা অতীব জরুরি। এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে সুগম হয় অনায়াসে রাজত্ব করার ও অবাধ লুঠতরাজের পথ। কলোনাইজাররা উপনিবেশের মানুষকে দমিয়ে রাখার জন্য সবসময় চেষ্টা করেছে তাদেরকে এই কথা বিশ্বাস করাতে যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবেচনায় ইউরোপ উন্নত আর এশিয়া-আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার মানুষেরা শিকারী ও মৎস যুগের মানুষের ন্যায় অসভ্য, অসংস্কৃত ও নাবালক শিশু বিশেষ। তারা সামান্য সভ্যতার অধিকারী, আধা-বর্বর, অনমনীয় ও অর্ধ-বোধশক্তিসম্পন্ন উপকূলবাসী।

এরপরই গল্পের মূল ঘটনাটি সংঘটিত হয়। মাসুদ সাহেব খেজুর কাটতে যাবেন। তিনি কথকের দাদাকে অনুরোধ করেন খেজুর কাটার সময় উপস্থিত থাকতে। কিন্তু কথকের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, তিনি (মাসুদ) চাচ্ছিলেন না খেজুর কাটার সময় কথকের দাদা উপস্থিত থাকুক। তিনি মূলত অনুরোধ করার খাতিরেই কথকের দাদাকে অনুরোধ করেছিলেন। উপস্থিত থাকার অনুরোধ পেয়ে কথকের দাদা এক বাক্যে রাজি হয়ে যান। তাকে (কথকের দাদা) গরুর চামড়া দিয়ে মোড়ানো একটা টুলে বসতে দেওয়া হয়। কিন্তু মাসুদ সাহেব কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ভিড়ের মধ্যেও নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। খেজুর কাটা শুরু হয়। মাসুদ সাহেব খেজুর কাটা শ্রমিকদের অনুরোধ করেন, সাবধানে খেজুর কাটতে যেন খেজুরের কলজে না কেটে যায়। কারণ তিনি মনে করেন, "খেজুর গাছেরও আমাদের মতো কষ্ট আছে। ফূর্তি আছে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২৮)। খেজুর কাটা হয়ে গেলে সেগুলো বস্তাবন্দি করা হয় এবং হোসেন ব্যাপারী, মুসা জোতদার ও কথকের দাদা মিলে সেগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। কারণ মাসুদ সাহেব তাদের কাছে ঋণী। কথকের দাদা মাসুদ সাহেবের কাছ থেকে পাঁচ বস্তা খেজুর নেওয়ার পরেও তার ঋণ পরিশোধ হয়নি। সে মাসুদ সাহেবকে জানায়, "আমি কিন্তু তোমার কাছে এখনো পঞ্চাশ পাউন্ড পাই" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২৮)। নিজের প্রিয় খেজুরগুলোকে মহাজনদের নিয়ে যেতে দেখে মাসুদ সাহেব বাসা হারিয়ে ফেলা ইঁদুরের মতো ডানে-বাঁয়ে তাকাতে থাকেন। কথক তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শুনতে পান, "তার ভেতরে একটি শব্দ। নেকড়ের থাবায় পড়া একটি মুমূর্ষু ছাগ শিশুর কান্নার মতো সে শব্দ"

(শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২৮)। শব্দটি শোনার পর কথকের বুকটা জ্বলতে শুরু করে। তিনি দৌড়াতে থাকেন নীল নদের দিকে। তার মনে হয়, "আমি খেজুরের কলজে খেয়ে ফেলেছি। আমি গলায় আঙ্গুল দিয়ে চেষ্টা করলাম যা খেয়েছি সব বের করে আনতে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২৮)।

—এখানে নেকড়ে আর কেউ নয়। সে দাদারূপী ঔপনিবেশিক শক্তি আর মুমূর্ষু ছাগশিশু হলো মাসুদ নিজে যে কিনা কলোনাইজড আফ্রিকার প্রতীক। খেজুরের কলজে হলো আফ্রিকার সত্তা আর খেজুরের কলজে খেয়ে ফেলা অর্থ আফ্রিকার সত্তাকে বিনাশ করা। আর গরুর চামড়া দিয়ে মোড়ানো টুল, যাতে বনেদিপনার ছাপ সুস্পষ্ট, ওটা আফ্রিকার অতীত ঐতিহ্যের পরিচায়ক।

ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অন্য আরেকটি রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় নগুগি ওয়া থিওয়ঙ্গ'ং রচিত 'ক্রুশ সকাশে বিবাহ'ং গল্পে। গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের কেনিয়ার মাউ মাউ বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে ভাগ্যান্বেষী এক যুবকের ভাগ্যান্বেষণ ও প্রতিশোধস্পৃহা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। যুদ্ধকালে ইংরেজরা উপনিবেশের কালা আদমিদের বলপূর্বক যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছিল। তারা কৃষ্ণাঙ্গদের লোভ দেখিয়েছিল এই বলে যে বদমাশ জার্মানদের পরাজিত করতে পারলে চাকরি-বাকরি ও টাকা-কড়ি দেবে। কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভের পরে ইংরেজরা তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়। গল্পকারের ভাষায়– "চাকরিই বা কোথায়, প্রতিশ্রুত পুরস্কারই বা কোথায়; 'সুমহান' ইংরেজ এবং 'শয়তান' জার্মানরা হেসে হেসে করমর্দন করলেন, কালা আদমিদের চাকরি দেওয়া হলো না কেন তা নিয়ে ওদের কোন মাথাব্যথা নেই" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩০৮)।

ছয়

আফ্রিকার বেশ কিছু গল্পে উপনিবেশবিরোধী চিন্তার রূপায়ণ ঘটেছে। এর মধ্যে ভেরোনিক তাজো'ং(১৯৫৫–) রচিত 'এক জাদুকর ও তরুণীর গল্প'টি'ং অন্যতম। গল্পটিতে গল্পকার জাদুবাস্তবতার কৌশল ব্যবহার করে কলোনাইজারদের কবল থেকে কলোনির মানুষদের মুক্তির উপায় অনুসন্ধানের চিত্র রূপায়ণ করেছেন। গল্পটি আরম্ভ হয়েছে "অসম্ভব ক্ষমতাধর ও অপরূপ সুন্দর এক জাদুকর" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৩)-এর পরিচয় দেওয়ার মধ্য দিয়ে; যে জাদুকরের গুপ্তবিদ্যায় জ্ঞানের কোনো পরিসীমা নেই। সে যা চাইতো তা-ই করতে পারতো। সে দাবি করতো তার কাছে চিরশান্তির সূত্র আছে। লোকেরাও তার এসব কথা বিশ্বাস করতো এবং এ কারণে দশ জায়গা থেকে লোক আসতো তার সাথে দেখা করার জন্যে। অথচ সুখ সম্পর্কে সেই জাদুকরের ধারণা হলো, "সুখ হলো সুখের অনুপস্থিতি" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৩)। কিন্তু সুখ সম্পর্কে সাধারণ আফ্রিকানদের ধারণা, "সুখ হচ্ছে ভালোবাসা, টাকা কিংবা ক্ষমতা" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৪)। এরপর আমরা দ্বিমুখী ঘটনা ঘটতে দেখব যেখানে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের মধ্য থেকে একদল লোক জাদুকরের মুখ থেকে কাঙ্ক্ষিত কথা শুনতে না পেরে চলে যাবে আর একদল লোক জাদুকরের কাছে রয়ে যাবে।

জাদুকরের মুখ থেকে কাঙ্ক্ষিত কথা শুনতে না পেরে যে শ্রেণির লোক জাদুকরকে ছেড়ে চলে গেল তারা আফ্রিকার নিজস্বতায় বা স্বকীয়তায় বিশ্বাসী জনসাধারণ। ঔপনিবেশিক প্রভুদের মিথ্যাবচনে আশ্বস্ত হয়ে এরা নিজেদের স্বকীয়তা বিসর্জন দেয়নি। কিন্তু যারা "তার গুপ্ত কথা

কোন একদিন আবিষ্কার করবে বলে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৪) জাদুকরের সঙ্গে রয়ে গেল এরা হলো ঐ শ্রেণির লোক যারা মনে করেছিল ঔপনিবেশিক প্রভুদের অনুসরণ, অনুকরণ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মধ্যেই তাদের মুক্তি নিহিত রয়েছে। এই কারণে এরা জাদুকরের সমস্ত ক্রিয়া-কর্মের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে ছিল বেশি পরিমাণে উদ্‌গ্রিব, সচেষ্ট, সতর্ক। এরা ছিল সবচাইতে অসুখী এবং তাদের যাওয়ার কোনো জায়গাও ছিল না। তারা সবদিক দিয়েই ছিল জাদুকরের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে জাদুকর–

> যদি এমনিতেই একটা হাত উঠাতো, অমনি তারা এর অর্থ উদ্ধারে নিমগ্ন হয়ে পড়তো। রীতিমতো সভা ও গোল টেবিল বৈঠকে বসে যেত। তার প্রতিটি পদক্ষেপের মর্মার্থ উদ্ধারের জন্যে তারা কঠিন পরিশ্রম করে গলদঘর্ম হতো। সে কখন মাথা চুলকালো, কাশলো কি না, হাই তুললো কিংবা আঙ্গুল ফোটালো, আর তৎক্ষণাৎ তার সাগরেদরা খাতায় তা টুকে নিতো। অতি উৎসাহী কেউ আবার ছবিও এঁকে ফেলতো (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৪)।

এরপর জাদুকরের কাছে আগমন ঘটে এক মেয়ের। "মেয়েটার জন্ম এক ম্যাজিশিয়ান পরিবারে। ওর বাবা একজন জাদুকর আর ওর মায়ের আছে অলৌকিক ক্ষমতা" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৪)। জাদুকরের সাথে মেয়েটার সাক্ষাৎ হয়। মেয়েটার কথা শুনে জাদুকর বলে, "আমি বুঝতে পেরেছি, আসো আমার সাথে, কিন্তু কোনো প্রশ্ন কোরো না" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৫)। জাদুকর মেয়েটাকে প্রশ্ন করতে নিষেধ করে তাকে অনুসরণ করতে বলে। মেয়েটাকে সাথে নিয়ে সে এক "গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়ে। মেয়েটা তার পাশে পাশে, সে জানে না তারা আসলে কোথায় যাচ্ছে কিন্তু এটা স্পষ্ট জানে একা সে কোন দিনও ফিরে আসতে পারবে না" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৫)।

–ওপরে বর্ণিত জাদুকর আর কেউ নয়, সে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতিভূ। আর মেয়েটা উপনিবেশিত আফ্রিকার ঐ শ্রেণির মানুষদের প্রতিনিধি যারা চেষ্টা করেছিল কলোনাইজারদের তৈরি করা মিথকে ভেঙে দিয়ে আফ্রিকাকে মুক্ত করতে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কলোনাইজারেদের কাছ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে সেই শক্তি কলোনাইজারদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা। এজন্য যখন জাদুকর ঘুমিয়ে পড়ে তখন–

> মেয়েটা উঠে বসে। লোকটার কপালে হাত রাখে এবং তার মাথার খুলিটা খোলে। খুলির ভেতরের দৃশ্য তাকে ভীত করে তোলে– দুঃখ আর একাকীত্বের একটা মরুভূমি। দেখতে ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রের মতো। চারদিকে পরিখা আর গোলার আঘাতে সৃষ্ট গর্ত। মৃতদেহের আড়ালে মাটি প্রায় চোখেই পড়ে না। এদিকটায় চলে আসার জন্য তার অনুশোচনা হল, বিমর্ষ মনে ফিরে আসার সময় হঠাৎ তার চোখে পড়ল দূরে, একটা হ্রদ, হ্রদটার ওপারে সমতল মাঠ, ঘাসগুলো অদ্ভুত, সবুজ যেন হাসছে। পৃথিবীটা ওখানে অনেক অর্থপূর্ণ। সে লোকটার খুলিটা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়। (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৪)

–ওপরে যে অর্থপূর্ণ পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে, সেই পৃথিবী হলো কলোনাইজারদের নিজ দেশ অর্থাৎ ইউরোপ। কলোনাইজাররা যদিও বলেছিল যে তারা কলোনির দেশগুলোর আদিমতা, অসভ্যতা, বর্বরতা, আলস্য ও সভ্যতার আলোহীনতা ইত্যাদি দূর করার জন্য, শিক্ষার আলো দিবে, যাতে তারা নিজেরা নিজেদের শাসন করতে সক্ষমতা অর্জন করে। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা ছিল তার উল্টো। তারা কলোনির দেশগুলোকে এমনভাবে স্বল্পশিক্ষা দিয়েছিল যাতে তারা দীর্ঘমেয়াদে কলোনিগুলোকে শাসন করতে পারে। কিন্তু আলোচ্যমান গল্পের মেয়েটার মতোই

কলোনিগুলোতে কিছু মানুষ ছিল যারা কলোনাইজারদের কবল থেকে নিজের দেশকে মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। তাই তারা কলোনাইজারদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে, তাদের সাথে মিশেই তাদের নাগপাশ থেকে মুক্তির উপায় সন্ধান করে। এ জন্যই– "সেই সময় থেকে, মেয়েটার মনে শুধু একটাই চিন্তা কী করে লোকটার মনের ভেতর সেই বিস্তৃর্ণ উপত্যকায় পৌঁছানো যায়। সে ঐ সবুজ ঘাসে গড়াবে, ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ নিবে, গায়ে মাখবে তার উষ্ণতা। এই চিন্তা মেয়েটাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো। রাতদিন সে জাদুকরের সাথেই যাপন করছে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৫-৩৬)।

মুক্তির বিশল্যকরণী আনার উদ্দেশ্যে মেয়েটা আবার জাদুকরের খুলিতে ঢুকবে বলে মনস্থির করে। যাত্রা শুরু করার আগে নিজেকে সে ভালোভাবে তৈরি করে নেয়। সে আরও সচেতনতা অবলম্বন করে এবং সমস্ত শক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়। সে একটা ডিম ভেঙে কুসুম দিয়ে তিনবার মুখ ধুয়ে নেয়। তারপর এগিয়ে যায় ঘুমন্ত লোকটার কাছে। সে জাদুকরের কপালে হাত রাখে এবং তার মাথার খুলিটা খুলে ফেলে সেখানে প্রবেশ করে এবং সাবধানে হাটতে থাকে। লেখকের ভাষায়–

> মেয়েটা খুব সাবধানে হেঁটে যাচ্ছিল, কিন্তু তার কামিজের ঝুল কাঁটায় জড়িয়ে যায়, একটা ফাঁদে পড়ে গিয়ে আহত হয় সে। তারপরও বেশ সাফল্যের সাথে পুঁতে রাখা মাইন এড়িয়ে, পচাগলা লাশের গন্ধের ভেতর শ্বাস বন্ধ রেখে, সে এগিয়ে যায়। এবং শেষ পর্যায়ে সে হ্রদটার কাছে এসে পৌঁছায়। কিন্তু ততক্ষণে সে ভীষণ ক্লান্ত ও ভয়াবহ রকমের তৃষ্ণার্ত। সে হ্রদটার তীরে বসে। আজলায় ভরে কিছু পরিষ্কার পানি পান করে (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৬)।

পানি পান করে সমস্ত শক্তি ফিরে পাবার পর সে লম্বা একটা দম নিয়ে আবার হ্রদে ডুব দেয়। এদিকে জাদুকর বিছানায় অস্থিরতা বোধ করে। ঘুমের মধ্যে সে প্রায় লাফিয়ে ওঠে। জেগে উঠেই সে চোখ মেলে তাকায় রুমটার চারদিকে। তারপর বিছানা থেকে প্রায় লাফিয়ে নামে। গোলকধাঁধাঁর গোড়ায় দাঁড়িয়ে সে মেয়েটার নাম ধরে ডাকতে থাকে। কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। তখন মেয়েটার অবস্থা– "একটা উচ্চতর শক্তি মেয়েটাকে হ্রদের তলার দিকে টেনে নিতে থাকে। মেয়েটা জানতো সে গভীর থেকে গভীরে তলিয়ে যাবে। হ্রদের পানি তার মুখ, কান, নাক ছাপিয়ে যায়। তার গলায় কোন আর্তচিৎকার আসে না। সে কেবল তীরের কথা মনে করতে পারে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩৬)।

–এখানে উচ্চতর শক্তি হলো পশ্চিমের উন্নতশিক্ষা বিশেষত বিজ্ঞানশিক্ষা, যা ব্যক্তির মধ্যে চিন্তা-চেতনা, মননশীলতা, সচেতনতা ও স্বাধিকার চেতনার উন্মেষ ঘটায়। আর্তচিৎকার না আসার কারণ হলো ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে বের হয়ে মুক্তির স্বাদ পাওয়া। তীর হলো তার স্বদেশ। আর জাদুকরের অস্থিরতার কারণ হলো কলোনির নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয়।

গল্পটিতে লক্ষণীয় যে, গল্পকার উপনিবেশবিরোধী ভাবনার রূপায়ণ ঘটাতে গিয়ে জাদুবাস্তবতার কৌশল ব্যবহার করেছেন। এর কারণ জাদুবাস্তবতায় সম্ভব, অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্যর সংমিশ্রণ ঘটে। এখানে চরিত্ররা ইচ্ছেমতো আকার বদলাতে পারে আবার মৃত্যুকালে উড়ে যেতে পারে। এধরনের লেখায় থাকে গ্রামীণ আবহ, রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্র এবং কাল্পনিক অঞ্চল। এখানে কাহিনি বর্ণিত হয় ক্ষমতাবঞ্চিত মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, গল্প তৈরি হয় রাজনৈতিক ক্ষমতাবঞ্চিত মানুষ ও প্রভাববিস্তারী সমাজকে নিয়ে। এই রীতিতে ভূতের আবির্ভাব,

লোকজনের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, অলৌকিক ব্যাপার, অসাধারণ ক্ষমতা, এসবের আনয়ন করা হয় মূলত বাস্তবতাকে নির্দেশ করার জন্য এবং সেই সত্যের অনুসন্ধান করার জন্য যা প্রাত্যহিকতার আড়ালে থাকে।

ইভোন্নি ভেরা রচিত 'অন্য পশু কেন খোদা করো না' গল্পেও উপনিবেশবিরোধী ভাবনার রূপায়ণ দেখতে পাই। গল্পটিতে গল্পকার একজন কাঠখোদাইকারীর চিত্র রূপায়ণের মধ্য দিয়ে উপনিবেশবিরোধী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এই গল্পের কাঠখোদাইকারী স্বচক্ষে কখনোই হাতি অথবা জিরাফ দেখেনি, অথচ এগুলোই সে অত্যন্ত উৎসাহে এত সুন্দর ও নিখুঁতভাবে খোদাই করে যে, তার খোদাই করা হাতি ও জিরাফগুলো দেখে মনে হয়, এই ভাস্কর বাস্তব অরণ্যকে তুলে এনেছে শহরে। অথচ সব সময় তার মনে দুঃখ এই কারণে যে, এগুলোর জীবন নেই। সে সব সময় শুধু হাতি ও জিরাফ ব্যতীত অন্য পশুদের খোদাই করে না।

—উপরে বর্ণিত হাতি কেবল হাতি নয়, সে আফ্রিকার স্বদেশি কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের প্রতীক, আর জিরাফ পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গদের প্রতীক। হাতি আফ্রিকার নিজস্ব সন্তান; সে-ই আফ্রিকার আসল মালিক কিন্তু সে কাদায় গড়াগড়ি করে দিন কাটায়। অথচ জিরাফ বাইরে থেকে এসে আফ্রিকাকে দখল করে নিয়ে সে-ই এখন বনের মালিক হয়ে গেছে। সে তার লম্বা গলা নিয়ে সদর্পে বিচরণ করছে এবং গাছের সবচেয়ে উঁচু পাতা খাচ্ছে। এখানে হাতির কাদায় গড়াগড়ি করা অর্থ সুবিধা বঞ্চিত হওয়া আর জিরাফ কর্তৃক গাছের সবচেয়ে উঁচু পাতা খাওয়ার অর্থ সকল সুবিধা ভোগ করা। মূলত এক ধরনের প্রতিশোধস্পৃহা বা অ্যান্টি-কলোনিয়াল মানসিকতা থেকেই ভাস্করটি অন্য পশুদের খোদাই করে না। গল্পকারের বর্ণনায় প্রকাশিত হয়েছে সে সত্য—

> হাতি দীর্ঘকাল ধরে বন শাসন করছে। সে বনের চেয়েও প্রবীণ। কিন্তু জিরাফ গাছের ওপর দিয়ে তার গলা লম্বা করে সদর্পে চলাচল করে, যদিও সে-ই বনের মালিক। সে সবচেয়ে উঁচু গাছের পাতা খায়। অথচ হাতি কাদায় গড়াগড়ি করে দিন কাটায়। ... বনের সব চেয়ে উঁচু গাছের পাতা খাওয়ার জন্যে হাতি আর জিরাফের এই সংগ্রাম। (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩১)

—ওপরে যে সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে সেটা আফ্রিকানদের নিজস্ব অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গদের সংগ্রাম। এই সংগ্রামের অন্যতম একটি কারণ তাদের গাত্রবর্ণ। গল্পকারের ভাষায়,

> জিরাফ গর্বিত ও রাজকীয় ভঙ্গিতে হাঁটে, এর কারণ হচ্ছে তার সুন্দর চিত্রিত চামড়া, যা সে তার পিছে বহন করে। সংগ্রামটা হচ্ছে এখানে। এছাড়া তাদের দু'জনের যোগ্যতাই সমান। হাতির আছে উঁচু শুড় যা সহজেই উঁচু পাতায় গিয়ে পৌছায়। তেমনি জিরাফের রয়েছে লম্বা গলা (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩২)।

গল্পের শেষে আমরা দেখি ভাস্করটি জিরাফের গায়ে কালো রঙের ছোপ দিয়ে তাকে জেব্রা বানিয়ে ফেলেছে। খোদাইকারী কর্তৃক খাটো গলার জিরাফের গায়ে কালো রঙের ছোপ দিয়ে তাকে ছোট জেব্রা বানিয়ে ফেলার মধ্যে এক ধরনের প্রতিশোধ স্পৃহা বা বদলা নেওয়ার মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে।

সাত

আফ্রিকার গল্পে 'বর্ণবাদ' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ শ্বেতাঙ্গশাসিত আফ্রিকার জীবন ও সমাজে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী, যা কৃষ্ণাঙ্গদের জীবন ও মানসিকগঠনে ভয়ানকভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। আফ্রিকার ছোটগল্পে রূপায়িত বর্ণবাদের স্বরূপ নির্দেশের পূর্বে বর্ণবাদ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা আবশ্যক বলে বিবেচনা করি। প্রায় দুশো বছরেরও অধিক সময় ধরে আফ্রিকাকে শাসন ও শোষণ করতে গিয়ে পশ্চিমা শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশবাদীরা যে সকল নিকৃষ্ট নীতি, কৌশল ও পথ অবলম্বন করেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল Apartheid বা সাংবিধানিক বর্ণবাদ। Apartheid শব্দের বাংলা পারিভাষিক অর্থ হলো বর্ণবাদ। শব্দটি একটি আফ্রিকী আঞ্চলিক শব্দ যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বর্ণ বা জাতি পৃথক্করণ। এটা আসলে জাতিবৈষম্য (Racial Discrimination) ও বর্ণ পৃথকীকরণের একটি সুসংহত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ যেখানে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলোকে নিজদেশেই পরিণত করা হয়েছিল দাসে কিংবা চাকরে। বর্ণবাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে সাহায্য করেছিল পাশ্চাত্য বিভিন্ন মনীষী ও শ্বেতাঙ্গ রাজনীতিকের বাণী। স্কট দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬) মনে করতেন, "নিগ্রো স্বভাবতই শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে নিকৃষ্ট" (উদ্ধৃত, শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৭৭)। যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন (১৭৪৩-১৮২৬) এর মতে, "কালোরা দেহ এবং মন, দুয়েরই সহজাত গুণপনার দিক দিয়ে, সাদাদের চেয়ে নিকৃষ্ট" (উদ্ধৃত, শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৭৭)। জোসেফ ডি মাইস্ত্রে বলেছিলেন,

> যদি ভবিষ্যতের সমাজ কোনো দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত হয়, তার শাসকশ্রেণি হবে স্বর্ণকেশী, নীলচক্ষু শ্বেতাঙ্গ আর সমস্ত বিচ্ছিরিরকম কায়িকশ্রম সম্পন্ন করার জন্যে থাকবে নিকৃষ্টতর একটি শ্রেণি, এবং এটা খুব সম্ভব যে সেই ভূমিকা গিয়ে পড়বে হলদে বা কালা আদমিদের ওপর (উদ্ধৃত, শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৭৮)।

বর্ণবাদী শাসন ব্যবস্থায় বিদেশি শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা আফ্রিকার স্বদেশি কৃষ্ণাঙ্গরা শোচনীয়ভাবে শাসিত, শোষিত ও নিগৃহীত হয়েছে। সমালোচকের মতে,

> বর্ণবাদী ব্যবস্থায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা ছিল নিজ দেশেই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। মানুষ হিসেবে প্রাপ্য তাঁদের বহু অধিকার শ্বেতাঙ্গ আইনে অনেক পরিমাণে ছিল অস্বীকৃত। নিজ মাতৃভূমিতে তাঁদের বিচরণের অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল অনেকটা; বাধ্যতামূলক শ্রম, কাজের অধিকার অনেক সময় ছিল নেতিবাচকভাবে সংরক্ষিত। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রায় সকল নাগরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল তাঁরা। মাতৃভূমির বিপুল খনিজ ও অন্যান্য সম্পদের উপর তাঁদের কোনো অধিকার কিংবা স্বত্ব ছিল না (শাহেদ, ২০১২ : ১৯-২০)।

তবে Apartheid এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে শুধু জাতি পৃথক্করণ বললে বর্ণবাদের যে স্বরূপ আমাদের সামনে ফুটে ওঠে Apartheid এর প্রকৃতরূপ ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি 'ভয়ংকর ও অমানবিক' (শাহেদ, ২০১২ : ১৯–২০)। সোমা মুখোপাধ্যায়ের মতে,

> দক্ষিণ আফ্রিকায় আপার্টহাইড (Apartheid) নামক বর্ণবৈষম্য নীতির দরুন দক্ষিণ আফ্রিকার শাসকগোষ্ঠী ছিলো সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গরা এবং তিন স্তরে বিভক্ত অশ্বেতকায় গোষ্ঠীর প্রথম স্তরে থাকতো বর্ণসঙ্কর সম্প্রদায়, এশিয়ার মানুষ দ্বিতীয় স্তরে এবং তৃতীয় স্তরে সংখ্যাগুরু আফ্রিকীয় উপজাতির কৃষ্ণাঙ্গরা থাকতো (বিষ্ণু, ২০০৫ : ২১)।

সংক্ষেপে এই আইনের কতিপয় দিকের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করতে পারি : বর্ণবাদ আইনের কারণে দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় কৃষ্ণাঙ্গদের নিজস্ব বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠা করা হয় বিপুল সংখ্যক ঘোষিত ও অঘোষিত শ্বেতাঙ্গ এলাকা। শ্বেতাঙ্গরা ৭০ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য বরাদ্দ করে আফ্রিকার মোট ভূখণ্ডের ১৩ শতাংশ অনুর্বর জমি ও সম্পত্তি, আর ৩০ শতাংশ শ্বেতাঙ্গদের জন্য বরাদ্দ করে ৮৭ শতাংশ উর্বর ভূমি ও সম্পত্তি; প্রবর্তন করে 'পাস–আইনের'। এর ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গরা নিজদেশে অবাধে চলাচলের অধিকার হারায়। প্রত্যেক কৃষ্ণাঙ্গকে চলাচলের এলাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এবং পাস বা পরিচিতি বই রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়। পাস বা পরিচিতি বই না রাখলে দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ তাকে আটক ও জরিমানা করতো। গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত কোনো কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করলে পুলিশ তাকে আটক করে বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োগ করতে পারতো।

বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন করে রাখতো। একজন কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক একই এলাকায় একটানা ১৫ বছর কাজ করলে তবেই পরিবারের সাথে থাকার অনুমতি পেত। কিন্তু বাস্তবে এটা ছিলো প্রায় অসম্ভব কারণ, শ্রমিকদের সাধারণত এক থেকে দেড় বছরের 'ওয়ার্ক পারমিট' দেওয়া হতো এবং সামান্য অজুহাতেই তাকে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় পাঠিয়ে দিতো। আবার কোনো কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক অসুস্থ হয়ে কয়েক দিনের জন্য শহরের বাইরে গেলে অথবা আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করতে গিয়ে কয়েকদিন থাকলে তাকে শহরচ্যুত করা হতো। কোনো শ্রমিক দৈহিকভাবে দুর্বল বা অক্ষম হয়ে গেলে তাকে চাকরিচ্যুত করা হলেও এর জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ বা আর্থিক সুবিধাপ্রদান করা হতো না।

বর্ণবাদ আইনের কারণে কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের কর্ম এবং কর্মস্থল নির্বাচনের অধিকার ছিলো না। এই অধিকার ছিলো একচেটিয়াভাবে শ্বেতাঙ্গ নিয়ন্ত্রিত সরকারি শ্রমসংস্থাগুলোর। সংস্থাগুলো স্বাস্থ্য-পরীক্ষার নাম করে এবং স্বাস্থ্যের অযুহাত দেখিয়ে শ্রমিকদের কাজের স্থান নির্ধারণ করতো। কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের প্রতিদিন গড়ে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হতো কারখানায় বা খামারে। তাদের অধিকাংশই রাত কাটাতো কারখানার বাইরে কিংবা মালিকের বাসগৃহের বাইরে খোলা আকাশের নিচে। কিছু কিছু কারখানায় কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের জন্য টিনের তৈরি জানালা-দরজাহীন ঘর থাকলেও এধরনের এক একটি ঘরে ২০/২৫ জন শ্রমিককে একত্রে রাত্রিযাপন করতে হতো। স্বাস্থ্য পরিচর্যার কোনো ব্যবস্থা তাদের ছিলো না। তাদের সন্তানের লেখাপড়ার সুযোগও ছিলো সামান্য। তাদের যা মজুরি দেওয়া হতো তা ছিলো তাদের পরিবারের অন্নসংস্থানের জন্য অপ্রতুল, উপর্যুপরি কাজে বিলম্ব করলে বা অনুপস্থিত থাকলে গুরুতর শাস্তির বিধান ছিলো। কৃষ্ণাঙ্গরা শুধু কাজের জন্যই শ্বেতাঙ্গদের এলাকায় যেতে পারতো এবং এর জন্য প্রয়োজন ছিলো পূর্বানুমতি গ্রহণের। তাদের কোনো ভোটাধিকার ছিলো না। নির্বাচনে শুধু প্রাপ্তবয়স্ক শ্বেতাঙ্গরাই ভোট দিতে পারত। প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীসহ সরকারের সকল গুরুত্বপূর্ণপদ শুধু শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। শ্বেতাঙ্গরা একজন কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান দার্শনিকের চেয়ে একজন শ্বেতাঙ্গ গাধাকেও অধিকতর প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করত।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোনো কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক কর্তৃক শ্বেতাঙ্গ মালিকের সাথে তর্ক বা বাদানুবাদ ছিলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। একারণে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে জবাবদিহি করতে হতো। আবার শ্বেতাঙ্গ মালিক কর্তৃক কোনো কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকের উপর দৈহিক

নির্যাতনকালে কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক শারীরিকভাবে বাধা প্রদান করলে শ্বেতাঙ্গ মালিক পুলিশের সাহায্য নিতে পারতো। মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোনো শ্রমিক চাকরি ত্যাগ বা পরিবর্তন করতে পারতো না। চাকরি ত্যাগ বা পরিবর্তন করতে চাইলে তাকে প্রচলিত শ্রম আইন অনুযায়ী পুলিশের কাছে মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে হতো। তবে এক্ষেত্রে ফল হতো উল্টো। পুলিশ অভিযোগকারী শ্রমিককে দৈহিকভাবে নির্যাতন করে আগের মালিকের কাছেই পাঠিয়ে দিতো। সেখানে তার ভাগ্যে জুটতো সীমাহীন নির্যাতন। এ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, শ্বেতাঙ্গসৃষ্ট বর্ণবাদী শাসনের অধীনে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলো কী পরিমাণে শোচনীয়, মানবেতর ও লজ্জাজনক জীবনযাপন করছিলো। এর পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার ১৯১৩ সালে Native Land Act-এর মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য ভূমি ও সম্পত্তি কেনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়। এই আইনের কারণে কৃষ্ণাঙ্গরা মাত্র সাত শতাংশ ভূমি ক্রয় করতে পারতো। ১৯৩৬ সালে এই আইন সংশোধন করে এই পরিমাণ তের শতাংশ স্থির করা হয়। ফলে মোট জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয় ১৩ ভাগ জমির মধ্যে আর ১৭ শতাংশ শ্বেতাঙ্গের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় আফ্রিকার ৮৭ ভাগ ভূমি। এ রকম মানবেতর পরিস্থিতিতে কৃষ্ণাঙ্গরা জীবন বাঁচানোর জন্য শ্বেতাঙ্গদের সস্তা শ্রমিকে পরিণত হয়।

আফ্রিকার যে সকল সাহিত্যিকদের ছোটগল্পে বর্ণবাদের নিপুণ রূপায়ণ ঘটেছে তাঁদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার নোবেল বিজয়ী শ্বেতাঙ্গ লেখিকা নডিন গার্ডিমার[৯] (Nadine Gordimer) অন্যতম। তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার সেই সব প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের অন্যতম যাঁরা বর্ণবাদকে অপছন্দ করতেন। গল্পে তিনি অব্যাহতভাবে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন বর্ণবাদকে এবং এর ফলে সৃষ্ট মানবিক সংকটকে। তাঁর লেখায় শ্বেতাঙ্গদের অপরাধবোধ, ভয়, বিচ্ছিন্নতা ও সার্বিক মানসিক অস্থিরতার চিত্রের পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গদের আধিপত্য ও বর্ণবাদী বর্বরতায় বিপর্যস্ত কালোদের জীবনচিত্র রূপায়িত হয়েছে। এছাড়াও রূপায়িত হয়েছে উপনিবেশে বাস করার সহজাত অবমাননা, নির্যাতন, প্রতিবাদ, পারিবারিক জীবন ও দাসত্বের চিত্র। তাঁর রচিত 'সাড়ে তিন হাত মাটি'[১০] গল্পে রূপায়িত হয়েছে বর্ণবাদের ভয়াবহতা এবং সেই ভয়াবহতার চিত্র রূপায়ণে তিনি আবেগপ্রবণ ও অনুভূতিসম্পন্ন। গল্পটিতে বিধৃত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গের নিকটবর্তী এক শ্বেতাঙ্গের খামারে রোডেশিয়া থেকে আগত এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের স্বপ্নভঙ্গ, দুঃসহ জীবনযাত্রা, মৃত্যুর বিবরণ এবং বর্ণবাদী ঘেরাওয়ে জীবনের বিচ্ছিন্নতা। এই গল্পটির একটি বিশেষ বিশেষত্ব হলো, গল্পের রচয়িতা একজন শ্বেতাঙ্গ নারী, অথচ তিনি গল্প বর্ণনা করছেন একজন পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, আবার তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু হলো কৃষ্ণাঙ্গদের জীবন ও সেই জীবনে শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা সৃষ্ট বর্ণবাদের প্রভাব রূপায়ণ।

গল্পটির কথক একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। তারই দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটি বর্ণিত। তার একটি খামার রয়েছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে সে কৃষিজীবী। খামারটি রাখার উদ্দেশ্য তার পারিবারিক দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে একটু পরিবর্তন আনা। স্ত্রীকে নিয়ে তার পরিবার। কথকের পরিবারটির অবস্থান জোহান্সবার্গ থেকে দশ মাইল দূরে। সে একটি ক্রমবর্ধমান ট্রাভেল এজেন্সির অংশীদার। তার স্ত্রী লেরিস একজন অভিনেত্রী। কথকের স্ত্রীর হাত দুটো ছিল কোমল, মসৃণ ও সযত্নে সুরক্ষিত কিন্তু খামারের কাজে মনোনিবেশ করায় তার "সেই কোমল হাত দুটো এখন কুকুরের থাবার নিচের মাংসের মতো বেশ শক্তপোক্ত হয়ে গেছে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৫৭)। শহর থেকে দূরে গ্রামীণ জীবনে কথকের পরিবারটি

খামারের শ্রমিক কালো আদমিদের নিয়ে বেশ ভালোই রয়েছে। কালোদের সাথে তাদের সম্পর্ক–

> ...সামন্ততান্ত্রিক বরং বলা চলে সবদিক বিবেচনায়– ঝামেলাহীন এবং স্বচ্ছন্দ। আমাদের বন্দুক অথবা চোর ঠেকানো প্রতিবন্ধকতার দরকার হয় না। খামারের লোকদের স্ত্রী এবং বাচ্চারা সবাই ফার্মের মধ্যেই বসবাস করে। ওরা নিজেদের হাতে টকমদ তৈরি করে– কোনো রকম পুলিশি তল্লাশির ভয় করার কিছু নেই। আমরা নিজেরাও সবসময় গর্ববোধ করি, যে ওরা আমাদের কাছে আছে বলেই ওদের ভয় করার কিছু নেই। লেরিস ওদের বাচ্চাদের দেখাশুনা করে এমনকি, ছেলে বুড়ো যে কেউ-ই অসুস্থ হলে চিকিৎসাও করে থাকে। (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৫৮)

এর বিপরীত চিত্রের সাথে পরিচিত হয় যখন, আমরা কথকের মাধ্যমে জোহান্সবার্গে অবস্থানকারী নাগরিকদের কথা শুনতে পারি। জোহান্সবার্গে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গরা অন্যদের সাথে আলাপ-আলোচনার সময় প্রতিনিয়ত যে সব দুঃশ্চিন্তা, প্রতিযোগিতা বা সংগ্রামের কথা বলে তার মধ্যে রয়েছে, "সাদা লোকদের বালিশের নিচে পিস্তল রাখার কথা এবং চোর ঠেকাতে জানালার পাশের প্রতিবন্ধকতার কথা... তাদের কথার মধ্যে আরও থাকে সাদা লোকদের দেখে কালোরা রাস্তার পাশে সরে দাঁড়ায় না– এ প্রসঙ্গটিও" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৫৮)।

–এই চিত্রটি পূর্বে বর্ণিত চিত্র হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে শ্বেতাঙ্গদের মনে যে ভীতি ও অশ্রদ্ধাবোধ তা-ও এখানে উন্মোচিত।

এরপরই কথকের খামারে একটি ঘটনা ঘটে যায়। তার খামারের কৃষ্ণাঙ্গ মজুর পেট্রাসের ভাই রোডেশিয়া থেকে পায়ে হেঁটে জোহান্সবার্গে এসেছিল কাজের খোঁজে। আসার পথে খোলা রাস্তায় রাত কাটানোর ফলে তার ঠান্ডা লাগে। ফলে ঠান্ডাজনিত শ্বাসকষ্ট তথা নিউমোনিয়ায় তিন দিন ভুগে সে মারা যায়। অসুস্থতার সময় তার চিকিৎসার জন্য খামারের কেউ কথককে কিংবা কথকের স্ত্রী লেরিসকে কিছু জানায় নি। তারা ভেবেছিল ঘটনাটা তারা সফলতার সাথে সামাল দিতে পারবে। কারণ পূর্বেও তারা এ ধরনের কিছু ঘটনা মালিকপক্ষকে না জানিয়ে সামলাতে পেরেছিল। পাশাপাশি অন্য একটি ভয়ও ছিল; তা হলো ছেলেটা ছিল রোডেশিয়া থেকে আসা অবৈধ অভিবাসী। আর "অনুমতি ছাড়া রোডেশিয়ার আদিবাসীদের জন্য ইউনিয়নে প্রবেশ নিষিদ্ধ" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৫৯) ছিল। তবে শুধু ছেলেটাই নয় ওদের বেশ কিছু আত্মীয়-স্বজনও প্রায় সাত/আটশ' মাইল হেঁটে দারিদ্র্য পীড়িত এলাকা থেকে কাজের সন্ধানে চলে আসে সোনার নগরী জোহান্সবার্গে।

–পেট্রাসের ভাইয়ের রোডেশিয়া থেকে কাজের সন্ধানে জোহান্সবার্গে আসার মূল কারণ শ্বেতাঙ্গ শাসকগণ কর্তৃক জোরপূর্বক কৃষ্ণাঙ্গদের ভূমি অধিগ্রহণ। সমস্যাটির সূত্রপাত হয় ১৯১৩ সালে যখন সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসকদের আগ্রাসনকে ত্বরান্বিত করতে এবং নেটিভ কৃষ্ণাঙ্গদেরকে নির্যাতন ও বঞ্চিত করার প্রয়াসে প্রণয়ন করা হয় 'নেটিভ ল্যান্ড অ্যাক্ট'। এর পর থেকে রাতারাতি লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারকে বাস্তুচ্যুত করে খনি ও খামারের শ্রমিকে পরিণত করা হয়। শ্বেতাঙ্গদের তৈরি খামারগুলোতে সস্তাশ্রম সহজলভ্য করার জন্য খামারগুলোর কাছেই কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য শ্বেতাঙ্গরা বসতিও নিশ্চিত করে। শ্বেতাঙ্গরা দক্ষিণ আফ্রিকায় এমনভাবে

আইন তৈরি করেছিল যাতে শুধু তারাই দেশ শাসন করতে পারে। তারা শাসন ও শোষণের জন্য আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে তোলে 'রিজার্ভ এরিয়া'। তারা আফ্রিকার মোট ভূমির পনেরো শতাংশেরও কম জায়গার মধ্যে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল সকল কৃষ্ণাঙ্গকে। এই কারণেই পেট্রাসের ভাই সহ অন্যান্য আত্মীয়দের কর্মসন্ধানে জোহান্সবার্গে আগমন।

পেট্রাসের ভাইয়ের মৃত্যুর পর দক্ষিণ আফ্রিকার আইন অনুযায়ী পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হয়। স্থূল বুদ্ধির পুলিশ সার্জেন্ট এসে তদন্ত করে যায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ লাশ নিয়ে গিয়ে ময়নাতদন্ত করে জানায়, ছেলেটার মৃত্যুর কারণ নিউমোনিয়া এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই নিজদায়িত্বে ছেলেটার দাফন সম্পন্ন করেছে। এই খবর জানার পরও পেট্রাস পারিবারিকভাবে দাফন করার জন্য কথকের কাছে তার ভাইয়ের লাশ ফেরত আনার জন্য অনুরোধ করে। কথক তাকে বুঝায় যে দাফন সম্পন্ন হয়ে গেছে, এখন আর মরদেহ পাওয়া যাবে না। পেট্রাস একথা বিশ্বাস করে না। সে ভাবে তার শ্বেতাঙ্গ মালিক হয়তো মরদেহটা আনতে চাইছে না। তার চোখের চাহনিতে এমন অভিব্যক্তির ছাপ স্পষ্ট। কথকের ভাষায়, "সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল এমন এক দৃষ্টিতে যা থেকে তার দৃঢ় বিশ্বাস ঠিকরে বের হচ্ছে– সাদা মানুষদের সব কিছুই আছে; যা ইচ্ছে তা বাস্তবে পরিণত করতে পারে এবং যদি কোনো কিছু না করে তাহলে বুঝতে হবে ইচ্ছে নেই" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬২)।

পেট্রাসের সন্দেহ দূর করতে ও স্ত্রী লেরিসের অনুরোধের প্রেক্ষিতে কথক হাসপাতালে ফোন করে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কথককে জানায় যে, লাশ পাওয়া যাবে এবং এজন্য সর্বসাকুল্যে কুড়ি পাউন্ডের মতো অর্থ খরচ হবে, যা কিনা পেট্রাসের চার মাসের বেতনের সমান কিংবা তার পুরো পরিবারের এক বছরের কাপড়-চোপড়ের জন্য ব্যয়িত অর্থেও চেয়েও বেশি। কথক ভেবেছিল এত বড় অঙ্কের টাকা পেট্রাস যোগাড় করতে পারবে না, ফলে মরদেহও আনা লাগবে না। এমতাবস্থায় কথকের মনোভাব, "আমি নিজেও তাকে অর্থটা দেবার ব্যাপারে আগ্রহী নই। ছেলেটা বেঁচে থাকলে তার ডাক্তার দেখানো এবং ওষুধপত্রের জন্য শুধু কুঁড়ি পাউন্ড নয় প্রয়োজনীয় যে কোনো পরিমাণ অর্থ খরচ করতে আমার দ্বিধা ছিল না" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬২–৬৩)। কিন্তু পরদিন সকালে কথক শহরে যাওয়ার আগেই দেখল, পেট্রাস একটা পোটলার মধ্যে জড়িয়ে কুড়ি পাউন্ড পরিমাণ অর্থ এনে তার হাতে দিল। কিন্তু সে এমন আনাড়িভাবে দিল যে, দেওয়ার ভিতরেও কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে তার পশ্চাৎপদতার ছাপ সুস্পষ্ট। কথকের ভাষায়, "তার দেওয়া আনাড়িভঙ্গি বলে দেয়– তারা হতভাগার দল– শুধু নিতেই অভ্যস্ত কিন্তু দিতে জানে না। কীভাবে একজন সাদা মানুষের হাতে অর্থ তুলে দিতে হয়" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬৩)। অর্থটা হাতে নিয়ে কথক বিস্মিত হওয়ার পরিবর্তে বিরক্তই হন। তার বিবেচনায় এটা গরিবদের পক্ষে একটা বড় আর্থিক বাজে ব্যয় এবং এরা মৃত্যুকে মহিমান্বিত করার জন্য জীবনকে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করে। অথচ ঘটনাটা যদি তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে ঘটত তাহলে, "আমরা জীবনের জন্যে যে কোন পরিমাণ অর্থ অকাতরে ব্যয় করতে রাজি। আর মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের ধারণা– সে সময়ে আমাদের চূড়ান্ত দেউলিয়াত্বেও কিছু যায় আসে না" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬৩)।

এদিকে খবর পেয়ে পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য "ছেলেটার বৃদ্ধ বাবা রোডেশিয়া থেকে দাফনে উপস্থিত হবার জন্যে রওয়ানা হয়েছে। তার অনুমতি মিলেছে এবং এখন পথে রয়েছে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬২)।

—এখানে অনুমতি মেলা অর্থ 'পাশ' পাওয়া। উনিশ শতকের শেষ দিকে কৃষ্ণাঙ্গদের চলাচলের অধিকার সীমিত করে বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গরা চালু করে 'পাশ' প্রথা। পাশ আইনের মাধ্যমে প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে ও পরে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে কৃষ্ণাঙ্গদের চলাচল সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। সেটারই ইঙ্গিত এখানে দিয়েছেন গল্পকার।

যাই হোক পেট্রাসের দেওয়া টাকায় হাসপাতাল থেকে ছেলেটার মরদেহ নিয়ে আসা হলো। মরদেহটিকে সমাহিত করার জন্য শোকযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে এবং সবাই মিলে যখন কফিনটাকে কাঁধে নিয়ে পদযাত্রা করে কবরস্থানের দিকে যাচ্ছে তখন পেট্রাসের বাবা কফিনের ওজন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং বলে, তার ছেলের ওজন এত ভারী হতে পারে না। তার যুক্তি, "আমার ছেলে বয়সে অল্প এবং হালকা-পাতলা ছিল" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬৫)। বৃদ্ধের সন্দেহ দূর করার জন্য কফিন খোলা হলো। কিন্তু কফিন খুলে সবাই বিস্মিত কারণ, "কফিনের মধ্যে যে আছে তাকে উপস্থিত কেউই দেখেনি। নাদুস-নুদুস চেহারা— কিছুটা হালকা ত্বক, আর হালকাভাবে কয়েকটা সেলাই দেয়া সম্ভবত ঝগড়া-বিবাদের এক পর্যায়ে কেউ আঘাত করেছিল যার ধীর প্রক্রিয়ায় তার মৃত্যু ঘটেছে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬৬)।

তাহলে এখন প্রশ্ন জাগতে পারে পেট্রাসের ভাইয়ের অবস্থা কী? এর উত্তরে গল্পকার আমাদের জানাচ্ছেন,

> তার হদিস কেউ জানে না— কোথাও কোনো কবরস্থানে গৃহায়ণ পরিকল্পনার মতো, কোথাও হয়তো তার সংখ্যায় মিলে না অথবা কোনো মেডিক্যাল স্কুলে পেশী আর স্নায়ুর চাপে পড়ে আছে, খোদা জানেন। এই পৃথিবীতে আর তার কোনো পরিচিতি নেই (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬৭)।

ভাইয়ের মরদেহ না পেয়ে পেট্রাস মরদেহ প্রাপ্তির জন্য প্রদেয় টাকাটা ফেরত পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিল কিন্তু শ্বেতাঙ্গ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গড়িমসি করে টাকাটা আর দেয় নি। সাংবিধানিক বর্ণবাদী বাস্তবতায় এটাই ছিল কৃষ্ণাঙ্গদের জীবনের চিত্র।

গল্পটিতে শ্বেতাঙ্গ কথকের মানসিকতাও লক্ষযোগ্য। এটা ঠিক যে, সে পুরো ঘটনাটা অনুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছে। আর এই বর্ণনা খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, সে কাজ করেছে কিন্তু অনিচ্ছা ও বিরক্তির সাথে। পেট্রাসের ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদটা যখন তার স্ত্রী লেরিস তাকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানাতে অনুরোধ করেছে তখন তার প্রতিক্রিয়া, "এখন এসব আজে-বাজে কাজ করার একমাত্র ব্যক্তি হলাম আমি" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬০)।

—এখানে লক্ষণীয় একজন শ্বেতাঙ্গ মালিকের দৃষ্টিতে একজন কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকের মৃত্যুর সংবাদ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানোর কাজটি হলো 'আজে-বাজে' কাজ। আবার যখন পেট্রাসের ভাইয়ের প্রকৃত মরদেহ পাওয়ার জন্য তাকে হাসপাতালে ঘুরতে হচ্ছে তখন স্ত্রী লেরিসের

কাছে তার প্রতিক্রিয়া, "আমার অফিসের অর্ধেক সময় নষ্ট হচ্ছে পেট্রাসের ব্যাপারে শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত গাড়ি নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬৬)।

গল্পকার গল্পটি শেষ করেছেন 'গরুর বিনিময়ে জুতো'র মতো একটি বিদ্রুপাত্মক চিত্র রূপায়ণের মধ্য দিয়ে। আমরা দেখি, কথকের স্ত্রী লেরিস পেট্রাসের বৃদ্ধ বাবাকে বিদায় দিচ্ছে কয়েকটা পুরোনো জামাকাপড় দিয়ে। বৃদ্ধ লোকটা রোডেশিয়া থেকে পায়ে হেঁটে দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিল ছেলের মৃতদেহটিকে দেখতে ও সৎকার করতে। কিন্তু সে ছেলের মরদেহও পায়নি সৎকারও করতে পারেনি। বরং পেয়েছে কিছু পুরোনো জামাকাপড়। ছেলের মরদেহের পরিবর্তে পুরোনো জামাকাপড়। শ্বেতাঙ্গ কথকের দৃষ্টিতে এটা বেশ ভালো কারণ বাইরে প্রচণ্ড শীত। কথকের ভাষায়, "লেরিস বৃদ্ধ লোকটাকে তার বাবার কয়েকটা পুরোনো জামা-কাপড় দিয়ে দিল। লোকটা যে রকম কাঙাল অবস্থায় এসেছিল তার চেয়ে ভালো অবস্থায় রোডেশিয়া ফিরে গেল– বেশ তো একপ্রস্থ গরম কাপড়– বাইরে যখন এমন প্রচণ্ড শীত" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৬৭)। শ্বেতাঙ্গের কাছে কৃষ্ণাঙ্গের জীবনের চেয়ে শীতকালে একপ্রস্থ গরম কাপড়ের মূল্য ও গুরুত্ব অনেক বেশি। এভাবেই শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবাদী বর্বরতায় বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত কৃষ্ণাঙ্গদের করুণ ও মানবেতর জীবনচিত্র রূপায়ণ করেছেন গল্পকার এই গল্পে।

আধুনিক সভ্যতা ও মানবতার ধ্বজাধারী ফরাসি কলোনাইজারদের বর্ণবাদী আচরণের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে ক্যামেরুনের কথাসাহিত্যিক ফার্দিনান্দ ওইনো[১৯] (Ferdinand Oyono) রচিত 'পদক'[২০] গল্পে। উপনিবেশের রূঢ় বাস্তবতায় শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবাদী আচরণে কৃষ্ণাঙ্গদের মনে সৃষ্ট জটিল প্রতিক্রিয়ার রূপায়ণও এই গল্পের অনন্য একটি দিক। গল্পটি রচিত হয়েছে একটি পদক প্রদান অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠান পরবর্তী সময়ে সংঘটিত বর্ণবাদী আচরণকে কেন্দ্র করে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মেকা। ফ্রান্স থেকে আসা খ্রিষ্টান মিশনারিদের জন্য সে জমি দান করেছিল এবং নিজের দুই ছেলেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পাঠিয়েছিল ফরাসিদের পক্ষ হয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। সে হচ্ছে সেই বিখ্যাত মেকার বংশধর যিনি "সাদারা যখন প্রথম আসে তখন বহুদিন ধরে তাদের প্রতিরোধ করেছিলো" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩১৮)। সে একজন বয়স্ক কৃষ্ণাঙ্গ। তাকে এবং মি. পিপিনিয়াকিস নামক আরেক গ্রিক শ্বেতাঙ্গকে পদক দেওয়া হবে এই অনুষ্ঠানে। একারণে তাকে মাঠে চুন দিয়ে তৈরি বৃত্তের মাঝে রোদের ভিতরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে আর মি. পিপিনিয়াকিস বসে আছেন ছায়ায়। মি. পিপিনিয়াকিসকে সৈন্যরা সম্মান দেয় কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ বলে সৈন্যরা মেকা-কে সম্মান দেয় না। অথচ "সাদা আদমি যখন পাশ দিয়ে হেঁটে যায় তখন সে দেখেছে সৈন্যরা খটাখট পায়ের গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়ায়" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩১৭)।

পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে বুট পায়ে দিয়ে খোলা মাঠে দুপুরের রোদে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে চুন দিয়ে তৈরি বৃত্তের মাঝে দাঁড়িয়ে থেকে ঘামে ভিজে মেকা একাকার, তার ওপর প্রস্রাবের প্রবল চাপ। তার মনে সংশয় দেখা দিয়েছে যে, সূর্যটা কি আসমানে নাকি তার পিঠের ওপরে। অথচ সামনেই ছায়ার নিচে সাদা পোশাক পরে বেশ আরামেই বসে আছে ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গরা। এটা দেখে নিজের প্রতি তার আক্ষেপ "হায়, ওদের কী ভাগ্য, এরকম আগুনে জুতো পায়ে কষ্ট করতে হচ্ছে না।... আর শালা, আমি একজন বয়স্ক লোক এই রোদের মধ্যে খাড়া দাঁড়িয়ে উনোনে ডিমের মতো আমার মাথাটা ভাজনা করছি" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২০)। এমতাবস্থায় ঈশ্বরের প্রতি তার বিনীত প্রার্থনা,

> হা ঈশ্বর, তুমিই কেবল জানো মানুষের অন্তরে কি আছে। তুমি জানো এই মুহূর্তে আমি তকমা পাওয়ার খায়েশে অপেক্ষা করছি কখন সাদাদের বড়লাট আসবেন এই চুনের দাগের পাশে দুই জাহানের মধ্যে,... দুই জাহানের মাঝে, ঈশ্বর, তুমি সম্পূর্ণ আলাদাভাবে তৈরি করেছে (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২০)।

–ঈশ্বরের প্রতি ব্যক্ত মেকার এই মনোভাবের মধ্য দিয়ে বর্ণবাদের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। এখানে দুই জাহান বলতে যেমন ইউরোপ ও আফ্রিকা নির্দেশ করা যায়, ঠিক তেমনি শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদেরকেও নির্দেশ করা যায়।

মেকা'র দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর বড়লাট-এর আগমন ঘটে। বিউগলে সুর বেজে ওঠে। সবাই তটস্থ হয়। তিন রঙা পতাকা উড়িয়ে একটা কালো গাড়িতে চড়ে বড়লাট অনুষ্ঠান স্থলে এসে পৌছান। গার্ড অব অনার শেষ হয়। দু'একজন এসে মেকা'র সাথে হাত মিলিয়ে ইউরোপীয়দের দিকে চলে যায় কিন্তু পদক সত্বরই আসে না। পুরো একটি ঘণ্টা রোদে দাঁড়িয়ে থাকার পরেও যখন সবাই কেবল হাত মিলিয়ে চলে যায়, তখন মেকা ভাবে, পদক দিতে ওরা এত দেরি করছে কেন? ওরা কি পদকটা হারিয়ে ফেলেছে? নাকি ভুলেই গেছে পদক দেওয়ার কথা? এমন সময় ইউরোপীয়দের সম্বন্ধে মেকার মনের যে ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে কলোনাইজার ফরাসিদের দ্বিচারী মানসিকতার কথা :

> এদের হাত দিয়ে কিছুই সহজে পার হয় না। হাঁটার সময় তো মনে হয় দৌড়ায়, অথচ ওয়াদা করা একটা কাজ করতে এখন কেমন গড়িমসি করছে। এখন আবার চত্বরের ঐ প্রান্ত দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তাদের অন্তহীন পরিচয় আর অভিনন্দনের পর্ব চলছে (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২২)।

দীর্ঘক্ষণ দুপুরের রোদে পায়ে ব্যথা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট তার লাঘব হয়। মি. ফাউকোনি ও তার ডেপুটি এবং মি. পিপিনিয়াকিস তার দিকে এগিয়ে আসে। মি. পিপিনিয়াকিস তার পাশে এসে দাঁড়ায়। সে দেখে যে থুতনির নিচে টাই পরিহিত প্রকাণ্ড ঝুলন্ত কম্বল বিশিষ্ট অতিশ্বেতকায় একজন তাদের দিকে এগিয়ে আসে এবং থামে মি. পিপিনিয়াকিস এর নিকটে। সে ভাবে যে এই লোকটিই সম্ভবত 'বড়লাট'। অতিশ্বেতকায় লোকটি মি. পিপিনিয়াকিস এর সামনে দাঁড়িয়ে অতিউচ্চস্বরে চেঁচিয়ে কিছু কথা বলে এবং পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ডেপুটির হাতে থাকা বক্স হতে একটি মেডেল বার করে মি. পিপিনিয়াকিস এর বুকে সেঁটে দেয়; অতঃপর মি. পিপিনিয়াকিস এর কাঁধ ধরে তার গালে গাল ঠেকায়।

এরপর অতিশ্বেতকায় লোকটি মেকার কাছে এসে দাঁড়ায় এবং পূর্বেকার মতো চেঁচিয়ে কিছু একটা বলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ডেপুটির হাতে রাখা বক্স হতে আরেকটি মেডেল বের করে মেকার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার বুকে সেটা সেঁটে দেয়। মেকা লক্ষ করে তার মেডেলটা মি. পিপিনিয়াকিস এর মেডেলটার মতো নয়, যদিও তারা একই অবদানের জন্য মেডেল পাচ্ছে। মেকা ভেবেছিল শ্বেতকায় লোকটি সম্ভবত পূর্বের জনের মতো তারও কাঁধে কাঁধ ঠেকাবে। কিন্তু সে লক্ষ করল বড়লাট কাঁধে কাঁধ ঠেকানোর পরিবর্তে মেডেলটা পরিয়ে দিয়ে দু'কদম পিছিয়ে গিয়ে হ্যান্ডসেক করার জন্য তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। লেখকের ভাষায়–

> তিনি ছোট বাক্স থেকে আরেকটা মেডেল তুলে নিয়ে মেকার দিকে কথা বলতে বলতে এগিয়ে যান। মেকা লক্ষ করে এই মেডেলটা গ্রীকেরটার মতো নয়।... উদ্বেগ নিয়ে মেকা ভাবে সাহেব কি মি. পিপিনিয়াকিসের বেলায় যেমন তাঁর ভেজা কম্বল কাঁধে ঠেকিয়েছেন, তেমনি তার কাঁধেও ঠেকাবেন? কিন্তু বড়লাট যখন মেডেল পরিয়ে দু'কদম পিছিয়ে গিয়ে তার দিকে হাত বাড়ান তখন– মেকা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩২৩)।

এখানে লক্ষণীয় যে, মি. পিপিনিয়াকিস হলেন একজন গ্রিক শ্বেতাঙ্গ। তাই বড়লাট তার কাঁধে ও গালে নিজের কাঁধ ও গাল ঠেকালেন এবং বড় মেডেলটা দিলেন। আর মেকা কৃষ্ণাঙ্গ বলে তাকে দিলেন ছোট মেডেলটা এবং মেকার কাঁধ ও গালে নিজের কাঁধ ও গাল মেলানোর পরিবর্তে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে কেবল হাত বাড়িয়ে দিলের হ্যান্ডসেক করার জন্য। অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গদের দৃষ্টিতে কৃষ্ণাঙ্গরা এতটাই অস্পৃশ্য যে, তাদের সাথে খুব বেশি হলে হ্যান্ডসেক করা যেতে পারে কিন্তু কোনোভাবেই তাদের সাথে গাল কিংবা কাঁধ মেলানো যেতে পারে না। আরও লক্ষণীয় যে, মেডেল পাচ্ছে দু'জনই। কিন্তু একই রকম কষ্ট দু'জনকে করতে হচ্ছে না। মি. পিপিনিয়াকিস রোদে না পুড়ে ছায়ায় আরামে বসে থেকে শেষ মুহূর্তে বড়লাট আসার আগে মাঠে এসে দাঁড়িয়ে বড় মেডেলটি পাচ্ছেন আর মেকা-কে ব্যথা পায়ে বুট পরিধান করে কয়েক ঘণ্টা ধরে দুপুরের রোদে প্রস্রাবের চাপ সহ্য করে দাঁড়িয়ে থেকে ছোট মেডেলটি পেতে হচ্ছে। তার কারণ সে কৃষ্ণাঙ্গ, কালা আদমি। বর্ণবাদীদের ফরাসিদের দৃষ্টিতে, কালোরা কখনোই সাদাদের সমান মর্যাদাপূর্ণ মেডেল পেতে পারে না, কিংবা তারা তা পাওয়ার যোগ্যও না।

গল্পের শেষ অংশে এসে আমরা শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবাদী মানসিকতার চূড়ান্ত স্বরূপ দেখতে পাই। মেডেল পাওয়ার আনন্দে ঐদিন রাতে মেকা তার স্বজাতির লোকদের সাথে মিলে প্রচুর শ্যাম্পেন পান করে। রাতে ফেরার পথে সে নেশার ঘোরে ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত এলাকায় ঢুকে পড়ে। তখন তার কছে পরিচয়পত্র স্বরূপ 'পাশ' ছিল না; ছিল শুধু বড়লাটের কাছ থেকে পাওয়া মেডেলটা। সে প্রহরীদের মেডেলটা দেখায় কিন্তু প্রহরীরা তা বিশ্বাস করেনা। একপর্যায়ে তারা মেকা-কে বন্দি করে নিকৃষ্টভাবে গালাগালি করে এবং শারীরিকভাবে প্রচুর প্রহার করে। তারা তার বিরুদ্ধে ইউরাপীয়দের এলাকায় লুটপাটের অভিযোগ আনে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে উন্মাদ আখ্যা দিয়ে ছেড়ে দেয়। শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে সে বাড়ি ফিরে আসে এবং ভারসাম্যহীনের মতো প্রলাপ বকতে থাকে এই বলে যে, এই সাদারা আমাকে শেষ করে ফেলেছে।

গল্পটি বর্ণবাদী আচরণের নির্মম শিকার মেকা নামক এক কৃষ্ণাঙ্গ বৃদ্ধের, যে তার ঔপনিবেশিক প্রভুর প্রতি অনুগত ছিল কিন্তু ঐ প্রভুদের দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

আট

আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের আগমনের অনেক আগে থেকেই দাসব্যবসা চালু ছিল। তবে সেই দাসব্যবসা এবং আফ্রিকা থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের ধরে নিয়ে ইউরোপ-আমেরিকায় দাসত্বে নিয়োগ করার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। যেমন ইউরোপীয় কর্তৃক দাস ব্যবসা শুরু হওয়ার আগে, আফ্রিকার দেশে দেশে গোত্রে গোত্রে সংঘটিত যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দি হওয়া কৃষ্ণাঙ্গরা যখন দাসে পরিণত হতো তখন তাদের প্রতি কোনো বর্ণবাদী আচরণ করা হতো না। বিজয়ী গোত্রের বা দেশের লোকেরা বন্দিদের নিম্নস্তরের জীব বলেও মনে করতো না। বন্দি ব্যক্তি

দাসত্বকে বরণ করে নিয়ে ক্রমেই নিজ যোগ্যতা বলে মনিবের পরিবারের একজন বলে পরিগণিত হতে পারতো, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে সে মনিবের সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও হতো। সেকালের আফ্রিকায় সামাজিকভাবে ক্রীতদাস এবং মনিবের সন্তানদের মধ্যে কোনো বৈষম্য ছিল না। পুরুষ ক্রীতদাস মনিবের পরিবারেই বিয়ে-শাদি করে সম্পত্তির এমনকি পরিবারেরও মালিক হতে পারতো। প্রক্রিয়াটা ছিল এমন যে, যুদ্ধবন্দি প্রথমে হতো দাস, অতঃপর দাস হতে মুক্তমানুষ এবং শেষে মুক্তমানুষ থেকে গোত্রপতি। এ থেকেই ইউরোপীয়দের আগমন পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ের দাসব্যবসার পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপনিবেশ পূর্ববর্তী সময়ে ক্রীতদাসেরা এক পর্যায়ে মুক্ত হয়ে মানবিক জীবনযাপন করতে পারতো, আর পরবর্তী পর্যায়ে এসে তারা সমস্ত মানবিক অধিকার হারিয়ে পরিণত হলো কেবলই পণ্যে। সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদের মতে, "সপ্তম শতক থেকে অভিযান চালিয়ে অষ্টম শতকের শুরুতে আফ্রিকার উত্তরাংশ দখল করে নেয় মুসলিম রাজশক্তি। আরব ও পারস্যের সিরাজীরা আফ্রিকার পূর্ব উপকূল দখল করে এবং দাস ব্যবসা শুরু করে" (শাহেদ, ২০১২ : ১৪)। তিনি আরও বলেন,

> ষোল শতকের দিকে আফ্রিকার বৃহদাংশ ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রায় একই সময়ে প্রসার লাভ করে আন্তঃঅতলান্তিক দাস ব্যবসা। পরবর্তী চারশ বছরে আরব পৃষ্ঠপোষকতাতেই এক কোটির বেশি মানুষকে দাস করে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যারিবীয় অঞ্চল, উত্তর ও লাতিন আমেরিকায় (শাহেদ, ২০১২ : ১৪)।

পনেরো শতকে (১৪৯২ সালে) ইতালির নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বস (১৪৫১-১৫০৬) কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হলে ইউরোপীয়দের সামনে উন্মোচিত হয়ে যায় আমেরিকা মহাদেশের বিপুল ভূভাগ। কলম্বস একদিকে আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কারক অপরদিকে ট্রান্সআটলান্টিক দাসব্যবসার প্রতিষ্ঠাতা। এসময় সমুদ্র পথে জাহাজ ডাকাতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ দিয়ে ইউরোপীয়রা আফ্রিকায় পশ্চিমা ঘরানার দাসব্যবসা আরম্ভ করে। খলিকুজ্জামান ইলিয়াস এর মতে,

> এ সময় তারা খুব সহজ শর্তে আফ্রিকার রাজা, গোত্রপতি এবং দাসব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবসায় নামল। প্রধানত তিন উপায়ে তারা দাস সংগ্রহ করে: চুরি-ডাকাতি করে, যুদ্ধের শর্ত হিসেবে এবং রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে। সত্যি বলতে এই শেষোক্ত প্রক্রিয়াটিই দাসব্যবসাকে শক্ত পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে। ওরা আফ্রিকার রাজাদের দিত ঘোড়া, বন্দুক, মদের বোতল। এইসব দ্রব্য ছিল আফ্রিকার রাজাদের অত্যন্ত প্রিয় (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৬৯)।

এর ফল হিসেবে দেখা যায় যে, কামান-বন্দুক পেয়ে রাজারা নিজেদের শক্তি অনেকগুণ বৃদ্ধি করে ফেললো এবং পার্শ্ববর্তী দুর্বল রাজ্যগুলোকে আক্রমণ ও পরাজিত করে বন্দিদেরকে ইউরোপীয়দের কাছে দাস হিসেবে বিক্রি করা শুরু করলো। পরিস্থিতি এমন আকার ধারণ করলো যে, অনেক স্থানীয় রাজাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও টিকে থাকার স্বার্থে বাধ্য হতে হলো ইউরোপীয়দের সাথে দাস ব্যবসায় যোগ দিতে। আর এভাবেই আফ্রিকার গোত্রপতিরা এক দারুণ ষড়যন্ত্রমূলক চক্রে নিপতিত হলো এবং এর সুফল লাভ করতে থাকলো ইউরোপীয় দাসব্যবসায়ীরা।

ষোলো শতকে ইউরোপের ক্ষমতাবান ব্যবসায়ীরা দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে শুরু করে কফি, তুলা, তামাক ও আখের চাষ। এই চাষের জন্য তাদের দরকার পড়ে বিপুল সংখ্যক কৃষি শ্রমিকের এবং কৃষি শ্রমিকের এই অভাব পূরণ করার জন্যই বিস্তৃতি লাভ করে দাসব্যবসা। দাস হিসেবে যাদের কেনা-বেচা করা হতো, তারা ছিল আফ্রিকা থেকে ধরে আনা– ক্ষেত্র বিশেষে কিনে আনা– লক্ষ লক্ষ কালো মানুষ। মূলত আফ্রিকা থেকে আনা বিপুল সংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকেই দাস বানিয়ে নিযুক্ত করা হয় কৃষিকাজে। আফ্রিকায় পশ্চিমা ধারার দাসব্যবসা শুরু করে পর্তুগিজরা পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ষোলো শতকের শুরুর দিকে ক্যারিবীয় অঞ্চলে দাস সরবরাহ শুরু করে ব্রিটিশ ও আমেরিকান দাসব্যবসায়ীরা। ষোল শতকে ট্রান্সআটলান্টিক দাস ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতো পর্তুগিজরা, সতের শতকে ডাচরা আর আঠারো শতকে ব্রিটিশরা। এই সময়ে আটলান্টিকের দুই পাড়ে দাসব্যবসা অত্যন্ত জমজমাট হয়ে ওঠে। দাসব্যবসাকে কেন্দ্র করে আফ্রিকার উপকূলে গড়ে উঠেছিল বন্দর, কারখানা ও দুর্গ। আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের ধরে এনে দাস হিসেবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে আমেরিকায় সরবরাহের জন্য আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে চল্লিশটার মতো দাসদুর্গ (Slave Fort) নির্মাণ করা হয়েছিল। পনের থেকে ষোল শতক, এই দুশো বছরে আফ্রিকা থেকে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় দাস হিসেবে বিক্রির জন্য আনা হয়েছিল। ১৮০৭ সালে দাসব্যবসা বন্ধ করা হয়। ক্যারিবীয় অঞ্চলে দাসপ্রথা বাতিল হয় ১৮৩৩ সালে আর আমেরিকায় ১৮৬৩ সালে। ক্যারিবীয় অঞ্চলে কৃষ্ণাঙ্গদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় এরা আফ্রিকাভিত্তিক একটি সংস্কৃতি সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক আক্রমণ থেকে এরা যেমন নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছিল তেমনি নিজেদের সংস্কৃতির লালন করতেও সক্ষম হলো। কিন্তু উত্তর আমেরিকায় বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য দাসপ্রথার বিলুপ্তি ছিলো আসলে শ্বেতাঙ্গদের শোষণ-অত্যাচার থেকে মুক্তি নয় বরং নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে শোষণ-অত্যাচারের প্রচলন। এই ব্যবস্থায় কৃষ্ণাঙ্গরা প্রাক-ঔপনিবেশিক দাস অবস্থা থেকে মুক্ত হলেও নতুন করে নিপতিত হলো পুঁজিবাদী নয়া ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মধ্যে। এই অবস্থায় দাসপ্রথার অবসান হলো বটে কিন্তু টিকে রইল বর্ণবাদ– শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গদের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের দৃশ্যমান অবসান ঘটলো ১৯৯১ সালের মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় সাংবিধানিক বর্ণবাদের বিলুপ্তি ঘোষণার মধ্য দিয়ে। আফ্রিকার এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের কৃষ্ণাঙ্গরা মৌলিক মানবাধিকার ফিরে পেল; পেল মুক্তির স্বাদ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে সর্বত্রই শ্বেতাঙ্গরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারণে কৃষ্ণাঙ্গদের ওপরে নিপীড়ন অব্যাহত রইল। "দাস হিসেবে, কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে এবং সংখ্যালঘু হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রিকান-আমেরিকানরা বাস্তবিকই আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৭২)।

অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে ইউরোপে বিশেষত ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব শুরুর হলে দাসব্যবসা ঝিমিয়ে পড়ে। এসময়ে ইউরোপীয়রা দাসব্যবসার পরিবর্তে শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ ও সরবরাহ এবং শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সন্ধান ও তা দখলে জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আগে যে এলাকাগুলোতে তারা দাসব্যবসা করতো, এখন তারা সেগুলো অস্ত্রের বলে দখল করে নেয়। আর এই দখলকে জায়েজ করার জন্য তারা এই বুলি আওড়াতে থাকে যে, আফ্রিকা অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ। তার দরকার সভ্যতা, ভাষা, ধর্ম ও শিক্ষার আলো। দক্ষিণ আফ্রিকার ধর্মযাজক ডেসমন্ড টুটু বিষয়টিকে শ্লেষাত্মকভাবে সুন্দর করে উপস্থাপন করেছেন এভাবে–

> সাদা চামড়ার দেবতাতুল্য লোকগুলো যখন এল, তখন তাদের হাতে ছিল বাইবেল, আর কালো মানুষদের অর্থাৎ আমাদের হাতে ছিল আমাদের মৃত্তিকা, জমি। ওরা বলল চোখ বন্ধ কর, ঈশ্বরকে ভাব, ধ্যানস্থ হও। আমরা বন্ধ করলাম আমাদের চোখ। তারপর চোখ খুলে দেখি ওদের হাতে আমাদের ভূমি, আর আমাদের হাতে শুধুই একখানা বাইবেল (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৩-১৪)।

আর সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ বলেছেন এভাবে–

> শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন প্রথম মানবসভ্যতার প্রাচীন-ভূমি আফ্রিকায় গেল, তাদের হাতে ছিল যিশুর বাণী বাইবেল। ক্রমশঃ তারা আফ্রিকার রাজদণ্ড তুলে নিল হাতে; আর আফ্রিকাবাসীর হাতে তুলে দিল বাইবেল। রাজদণ্ডের সাঙ্গে সঙ্গে নিল সমগ্র ভূখণ্ড; উপহার দিল জীর্ণ আবাস, ভগ্ন-স্বাস্থ্য আর কোনমতে বেঁচে থাকার মতো কয়েকটি মুদ্রা (শাহেদ, ২০১২ : ২২)।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ইউরোপীয়দের এই মিথ্যাচারের কারণ কী? এর উত্তর খলিকুজ্জামান ইলিয়াস দিয়েছেন এভাবে– "উপনিবেশকে যৌক্তিক করার এবং নিজেদের বিবেকের কাছে জবাবদিহি করার জন্যেই আফ্রিকার মুখে এই কালিমালেপন" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৬৯–৭০)। আসলে দাসব্যবসার পেছনে অর্থনৈতিক কারণই ছিল প্রধান। কিন্তু দাসব্যবসাকে বা দাসপ্রথাকে যৌক্তিক ভিত্তিতে দাঁড় করাতে গিয়েই শ্বেতাঙ্গদেরকে আশ্রয় নিতে হলো বর্ণবাদের। তাদেরকে এই বুলি আওড়াতে হলো যে, কৃষ্ণাঙ্গরা নিম্নশ্রেণির ইতর মানুষ। তারা আজীবন দাস হয়েই থাকবে; শ্বেতাঙ্গদের সকল কাজ করবে; তাদের সন্তানেরাও জন্মাবে দাস হয়ে; তারা আসলে কালোজাত। এ কারণে বলা যায়, বর্ণবাদ দাসপ্রথার অবিচ্ছেদ্য অংশ যা একেবারে শ্বেতাঙ্গদের আর্থিক এবং নৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করেছে।

শিবনারায়ণ রায় বলেছেন, "যে আপনাকে জানার চেষ্টা করে না, আসলে সে কিছুই জানার চেষ্টা করে না" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ১৩)। –আপনাকে জানার যে চেষ্টা, সেই চেষ্টা ও অনুসন্ধিৎসার ভিতর দিয়ে দাসব্যবসায়ের চিত্র রূপায়ণ করেছেন সেমবেনে ওসমান[১৩] (Semmbene Ousmane) তাঁর 'উপজাতির ক্ষতচিহ্ন অথবা ভোলতেইকরা'[১৪] গল্পে। গল্পের মাঝে গল্প বলার ছলে গল্পটিতে একদিকে যেমন রূপায়িত হয়েছে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের তীব্র মর্মবেদনা, অপরদিকে প্রকাশিত হয়েছে আত্ম-আবিষ্কার, আত্মানুসন্ধান এবং পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ও শেকড় সন্ধানের চেষ্টা, ঔপনিবেশিক ক্ষতের গভীরতা, ভয়াবহতা এবং পরিত্রাণের বিশল্যকরণী আবিষ্কারের চিত্র। সমীরণ গুহ মজুমদার এর মতে, "কথনভঙ্গির এই বৈশিষ্ট্য আফ্রিকার গল্প বলার ঐতিহ্য অনুসারী" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ২০৮)। গল্পটি শুরু হয়েছে সেয়ার নামক ঠান্ডা মাথার ও গম্ভীর স্বভাবের এক ব্যক্তির আত্মানুসন্ধানমূলক এক প্রশ্ন উপস্থাপনের ভিতর দিয়ে আর তা হলো :"আমাদের জাতের লোকের গায়ে ও-রকম জখমের দাগ থাকে কেন" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৩)? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের জন্য ভোলতেইক গোত্রের লোকেরা পার্শ্ববর্তী গ্রামের মুরুব্বিদের কাছে যেত; যাদেরকে তারা 'জ্যান্ত বিশ্বকোষ' বলে মনে করত। "তারা যেত শুধু এই রহস্যটার গভীরে তলিয়ে দেখবার জন্য– কেননা এটা মনে হচ্ছিল যে এই ক্ষতচিহ্নের ব্যাপারটা কোনো সুদূর অতীতে প্রোথিত হয়ে আছে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৩)। প্রশ্নের উত্তর হিসেবে তারা বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা পেয়েছিল। কেউ বলেছিল "'এটা হলো বংশ গরিমার চিহ্ন'; কেউ বলেছিল 'এটা

দাসত্বের প্রতীক'; আবার কেউ কেউ বলেছিল 'এটা নিছকই একটা শোভার চিহ্ন'"(শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৩)।

তবে এই সকল ব্যাখ্যাই ছিলো ভুল। আধা ভোলতেইক, আধা সেনেগালি সেয়ার অন্তত তা-ই ব্যাখ্যা করে সবাইকে বুঝিয়ে বলে। সে বলে আধুনিক যুগে যারা দাসব্যবসা ও ক্রীতদাস প্রথা নিয়ে ভালো কাজ করেছে, তাদের লেখায় এই ক্ষত চিহ্নের উদ্ভবের বিষয়ে তেমন কোনো বিশ্বস্ত তথ্য পাওয়া যাবে না। আবার আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের একটা অংশ যারা শুরুতে ক্রীতদাস হিসেবে লাতিন আমেরিকায় কিংবা ক্যারিবীয় অঞ্চলে গেছে, তাদের শরীরেও এধরনের ক্ষত চিহ্ন বা দাগ পাওয়া যাবে না। তাঁর দৃষ্টিতে, এর উত্তর পেতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে "দাস ব্যবসার আগেকার কালো আফ্রিকায়– সেই প্রাচীন ঘানা সাম্রাজ্য, মালি আর গাও সাম্রাজ্যের আমলে– হাউসা, বেনিন, মসি ইত্যাদি নগর ও রাজত্বের সময়ে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৫)। এরপর সে বলে, "আমরা যদি তন্ময়ভাবে দাস ব্যবসার ইতিহাস পরীক্ষা করি, তাহলে দেখতে পাব যে, ব্যবসায়ীরা সেই কালোদেরই সন্ধান করত যারা শক্ত-সমর্থ, স্বাস্থ্যবান ও নিখুঁত গড়ন" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৫)। সেয়ারের মুখ থেকে এসব কথা কোনোর পর শ্রোতারা ক্ষত চিহ্নের উদ্ভবের কাহিনি শুনতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাদের আবেদনের মধ্যে সে আগ্রহের ছাপ স্পষ্ট: "'বলো, সেয়ার, তুমিই আমাদের বলো,' আমরা বলে উঠলুম, জাতীয় ক্ষতচিহ্নের উদ্ভব বিষয়ে তার কাহিনী শোনবার জন্য এখন আমরা আরো উদগ্রীব হয়ে উঠেছি" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৫)।

অতঃপর সেয়ার একটি কাহিনি বলে, যে কাহিনির ভিতর দিয়ে রূপায়িত হয়েছে দাস ব্যবসার ইতিবৃত্ত। কাহিনির শুরুতে আমরা পাই 'আফ্রিকান' নামক একটি জাহাজের বর্ণনা, যে জাহাজে করে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলোকে দাস হিসেবে বিক্রির জন্য প্রেরণ করা হতো আমেরিকায়। সেই জাহাজটি খোল ভরা হয়েছে পঞ্চাশজন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ ও ত্রিশজন কৃষ্ণাঙ্গ নারীকে দিয়ে। জাহাজটি উপসাগরে বেশ কয়েকদিন ধরে নোঙরবন্দি হয়ে আছে, কারণ জাহাজটির খোল এখনো দাসদের দ্বারা পূর্ণ হয়নি। তাই ক্যাপ্টেনের দালালরা কৃষ্ণাঙ্গদের ধরার জন্য সারাদেশ তন্নতন্ন করে খুঁজছে। জাহাজের ডাক্তার ও কয়েকজন খালাসি মিলে কথাবার্তা বলছে, এমন সময় জাহাজে আক্রমণ করে মোমতু, আমু ও তাদের চার সশস্ত্র অনুসারী। তারা জাহাজের পিপেনির্মাতা, খালাসি ও ক্যাপ্টেনকে হত্যা করে এবং বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জাহাজটিকে ডুবিয়ে দেয়। মোমতু ও তার অনুসারীরা জাহাজ লুট করে কৃষ্ণাঙ্গদের উদ্ধার করে বটে, কিন্তু মুক্ত করে দেয় না। নতুন ধরনের বন্দিত্ব শুরু হয় তাদের। দল থেকে কেউ পালাতে পারবে না। যে পালাবে তার পাশের লোকটাকে কুচি-কুচি করে কাটা হবে বলে মোমতু শাসায়। এর মধ্য দিয়ে মোমতু আসলে বন্দিদের একে অন্যকে পাহারায় নিযুক্ত করে।

আক্রমণকারীদের দলপতি মোমতু। সেও কৃষ্ণাঙ্গ। সে পরিধান করে আছে একটা চওড়া পাড়ওয়ালা টুপি, নীল রঙের উর্দি আর কালো রঙের উঁচু বুটজুতো। সে শ্বেতাঙ্গ দাসব্যবসায়ীদের সহযোগী দালাল এবং তাদের ভাষাও সে ভালোই বোঝে। যেসব দুর্গ, ছাউনি বা জায়গাতে শ্বেতাঙ্গরা নিগ্রো দাসদের বন্দি করে রাখতো পূর্বে সে সেসব জায়গায় ঘুরে ঘরে দোভাষীর কাজ করতো। অপরদিকে আমু হলো সাধারণ কৃষ্ণাঙ্গ। তার আছে বলিষ্ঠ ও অনমনীয় শরীর, অসীম শক্তি আর তেজস্বী পৌরুষ। যে কোনো ধরনের কায়িক শ্রমের জন্যই সে উপযুক্ত। আমু এবং মোমতু এক সাথে থাকলেও তাদের উদ্দেশ্য ও পথ ভিন্ন। "মোমতু এই

বন্দিদের উদ্ধার করেছে শুধু তাদের আবার বিক্রি করবার জন্যে। 'আফ্রিকান' এর কাপ্তেনকে আরো ক্রীতদাসের লোভ দেখিয়ে সে-ই এই উপসাগরে নিয়ে এসেছিল" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৭)। মোমতুর নিজের মুখেই উচ্চারিত হয়েছে তার উদ্দেশ্যের কথা–

> আমরা তৃণভূমি তন্নতন্ন করে খুঁজি, লোকজনদের বন্দি করে নিই আর সাদাদের কাছে বিক্রি করে দিই। কয়েকজন কাপ্তেন আমায় ভালোই চেনে, কিন্তু অন্যদের আমি লোভ দেখিয়ে উপসাগরে নিয়ে আসি– আর আমার লোকজনেরা খালাসিদের ভুলিয়ে ভালিয়ে জাহাজ থেকে নামিয়ে আনে। তারপর আমরা জহাজটা লুট করি, বন্দিদের ফিরিয়ে আনি। জাহাজে কোনো সাদালোক থাকলে তাকে খতম করি (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৮)।

অপরদিকে আমু একজন সাধারণ কৃষ্ণাঙ্গ। শ্বেতাঙ্গরা তার পরিবারের সবাইকে একে একে ধরে দাস হিসেবে বিক্রি করেছে। এখন তারা ধরে এনেছে আমুর মেয়েকে– দাস হিসেবে বিক্রি করবে বলে। তাই আমু এসেছে তার নয়-দশ বছর বয়সী মেয়ে ইওমে-কে উদ্ধার করতে। এজন্য সে মোমতুর সাথে থেকে কাজ করছে পাকা দুই মাস ধরে। এসময়ে সে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে দশ-বারোটি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে। মোমতুর এক সাগরেদের সাথে কথোপকথনের সূত্রে প্রকাশিত হয়েছে তার ও তার পরিবারের সংগ্রাম করে টিকে থাকার ইতিবৃত্ত। আমুর ভাষায়– "আমি বড় হয়েছি ভয় আর বিভীষিকার মধ্যে, জাতভাইদের সঙ্গে অনবরত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে বেড়িয়েছি– শুধু ক্রীতদাস হতে চাই না বলে। আমাদের জাতে কোন দাস নেই, আমরা সবাই সমান" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৮)। মোমতুর কণ্ঠেও উচ্চারিত হয়েছে একই রকম বক্তব্য। সে বলেছে–

> আমি তো জন্মাবধি আর্তনাদ ছাড়া আর কিছু শুনিনি– উন্মাদের মতো লোকজনদের পালাতে দেখেছি, ঝোপে-ঝাড়ে-জঙ্গলে। কিন্তু তুমি জঙ্গলে গেলে– আর কোনো অজানা লোকের শিকার হয়ে মরলে; খোলামেলা থাকলে তো, তোমাকে পাকড়ে দাস হিসেবে বেচে দেওয়া হতো (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১২)।

এমতাবস্থায় জীবন সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস হলো, "এটাই জীবন, কখনো নিরাপদ নও তুমি, পরের দিন সূর্য ওঠা দেখতে পাবে কি না, তা অব্দি তোমার জানা নেই" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১২)। কিন্তু তাদের মনে একটা প্রশ্ন ছিল যে, এই যে নারী-পুরুষদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের কোনো কাজে লাগানো হবে? উত্তর হিসেবে তারা একবার জনরব শুনেছিল যে, "সাদারা নাকি তাদের চামড়া দিয়ে জুতো বানায়" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১২)।

আমু মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত একজন কৃষ্ণাঙ্গ। গাত্রবর্ণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা বৈষম্যে সে বিশ্বাসী নয়। সে মনে করে সবাই সমান এবং প্রত্যেকেরই মুক্তভাবে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। তাই সে যেমন নিজে দাস হতে চায় না তেমনি তার পরিবার পরিজনদের মধ্যে কেউ দাস হয়ে অমানবিক জীবনযাপন করুক এটাও সে চায় না। একারণে দাসব্যবসায়ীদের কাছে নিজের স্ত্রীকে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে সে নিজ হাতে স্ত্রীকে হত্যা করেছিল। তার বিবেচনায় দাস হয়ে মনুষ্যেতরভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মুক্ত অবস্থায় মৃত্যুও শ্রেয়। আবার মোমতু যে উদ্দেশ্যে দাসদের মুক্ত করে ও সাদাদের হত্যা করে তার সাথে আমু কর্তৃক শ্বেতাঙ্গদেরকে হত্যা ও কৃষ্ণাঙ্গদেরকে মুক্ত করার পার্থক্য রয়েছে। আমুর ভাষায়– "এটা সত্যি যে আমি মানুষ খুন করেছি,... কিন্তু সে লোকজনকে বন্দি করে ক্রীতদাস হিসেবে বেচে

দেবার জন্যে নয়। ওটা তোমার কাজ, আমার নয়। আমি আমার গাঁয়ে ফিরতে চাই" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৮–০৯)।

আমু গ্রামে ফিরতে চইলেও মোমতুর পরিকল্পনা ভিন্ন। সে আমুকে সঙ্গে করে বাকি সাদাদের হত্যা করতে চায়। পাশাপাশি তার আরেকটা প্রচ্ছন্ন পরিকল্পনা হলো, কার্যোদ্ধার হয়ে গেলে সে আমু ও তার মেয়েকে বন্দি করবে এবং দাস হিসেবে বিক্রি করবে।

আমু মোমতুর এই গোপন অভিলাষ বুঝতে পেরে পরেরদিন শ্বেতাঙ্গদের সাথে লড়াইয়ের সময় মোমতুর নিযুক্ত করা পাহারাদারটিকে কুপোকাত করে পলায়ন করে দক্ষিণ-পূর্বদিকে; যেদিকে তার বাড়ি। বাড়ি যাওয়ার পথে সে পাড়ি দিল ছোট-বড়ো কতোগুলো নদী আর জঙ্গল। সে প্রধানত পথ চলত মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে রাতের বেলায় যাতে তাকে কেউ দেখতে বা চিনতে না পারে কিংবা দাস-শিকারিদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে।

তিন সপ্তাহ পরে আমু কন্যাসহ গ্রামে এসে পৌঁছালো। সে দেখলো গ্রামে কোনো সুস্থ-সবল নারী কিংবা পুরুষ নেই। দাসশিকারিরা তাদের ধরে নিয়ে গেছে। যারা আছে তারা রুগ্ন আর দুর্বল। আফ্রিকানদের কাছে একবার দাসশিকারিদের হাতে ধরা পড়ে ফিরে আসা অলৌকিক ব্যাপার এর মতো। তাই গ্রামের বুড়োরা আমুকে ডেকে পাঠালো, কারণ তারা আমুর "দুঃসাহসী কীর্তির কথা শুনতে চায়" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১৩)।

আমুর বীরত্বের কথা শোনার পাশাপাশি এ সময় গ্রামের বৃদ্ধরা নিজেদের জীবনের যে কথাগুলো বলেছে, তার মধ্যদিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে দাসব্যবসার বিভীষিকার চিত্র। জমায়েতের মধ্যকার সবচেয়ে বুড়ো লোকটির ভাষ্য হলো : "আমি সারাজীবন ধরে– এমনকি আমার বাপের জন্মেরও আগে থেকে, ... সারা দেশ কেবলই ভয়ে-ভয়ে কাটিয়েছে কবে তারা ধরা পড়বে আর সাদাদের কাছে বিক্রি হবে। সাদারা বর্বর" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১৩)। আরেকজন বৃদ্ধ বলেছে, "এর কি কোনো শেষ নেই? ... কেবলই দেখলাম আমার সব ছেলেপুলেকে ওরা ধরে নিয়ে গেল– আর কতবার যে এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে পালিয়ে বেড়িয়েছি, তার ইয়ত্তা নেই। জঙ্গলের মধ্যে এর চেয়ে গভীরে আর যাওয়া যাবে না... বুনো জানোয়ার আছে, অসুখ-বিসুখ আছে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১৩)। কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদেরকে তথা দাসশিকারিদেরকে জানোয়ারের চাইতেও নিকৃষ্ট বলে মনে করতো। আরেক বৃদ্ধের উক্তিতে সে সত্য প্রকাশিত হয়েছে, "দাস শিকারিদের চেয়ে বরং বুনো জানোয়ারের মুখোমুখি পড়তে রাজি আছি" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১৩)।

এরপর সবাই মিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বর্তমান জায়গাটা অনিরাপদ। নিরাপত্তার জন্য তাই তাদের উচিত হবে বসতি পরিবর্তন করা। সিদ্ধান্ত হয় যে আসন্ন শীতের পরে সবাই নতুন বসতিতে স্থানান্তরিত হবে। নতুন জায়গা নির্বাচনের জন্য তারা লোকও প্রেরণ করে এবং খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করতে শুরু করে। পরিবেশ পরিস্থিতি যখন কিছুটা স্থিতিশীল হতে শুরু করেছে এমনি এক দিনে আমুদের গ্রামে আবার আক্রমণ করে দাসশিকারিরা (মোমতু ও তার দলবল)। প্রাণ বাঁচাতে সবাই দৌড়ে পালাতে থাকে জঙ্গলের দিকে। আমুও তার মেয়ে ও শাশুড়িকে নিয়ে পালাতে থাকে। গোদরোগী হওয়ায় আমুর শাশুড়ি ভালো করে চলতে পারছিল না। তাদের যখন শিকারিদের হাতে ধরা পড়ার উপক্রম তখন আমুর মাথায় এক বুদ্ধি খেলে যায়। আমু জানত যে দাস শিকারিরা সুস্থ-সবল লোকদের ছাড়া ধরে না। তাই সে চট করে স্বীয়

কন্যা ইওমেকে দুই পায়ের মধ্যে চেপে ধরে হাতে থাকা ছুরি দিয়ে মেয়ের সারা শরীর কেটে দিতে থাকে এবং অভয় দিয়ে বলে, "তোমার চামড়া আর ওদের কোন কাজে লাগবে না– সাদারা তা দিয়ে আর জুতো বানাতে পারবে না" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১৬)।

মোমতু ও তার দলবল আমুসহ গ্রামের অন্য শক্ত-সমর্থ পুরুষ ও নারীদের ধরে নিয়ে চলে যায় আর ফেলে যায় আমুর শাশুড়ি ও মেয়েকে। কিছু দিনের মধ্যেই ইওমে ভেষজ চিকিৎসার গুণে সুস্থ হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে দাসশিকারীরা আমুদের গ্রামে আসলেও ইওমেকে আর বন্দি করে না, কারণ তার শরীর ক্ষত-বিক্ষত। দাসশিকারিদের দৃষ্টিতে সে এখন মূল্যহীন। শরীরে ঐ ক্ষত চিহ্নগুলো আছে বলে তার আর এক কানাকড়িও দাম নেই। গায়ে ক্ষতচিহ্ন থাকলে দাসশিকারীরা ধরে না– এই খবর মুহূর্তে ক্রোশের পর ক্রোশ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। দুর-দূরান্ত থেকে লোক এল খবরের সত্যতা যাচাই করতে। যখন তারা খবরের সত্যতা খুঁজে পেল, তখন– "বছরের পর বছর আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের পূর্বপুরুষদের দেহে নানা রকম ক্ষত চিহ্ন দেখা দিতে লাগল। আর এভাবেই আমাদের পূর্বপুরুষদের শরীর ক্ষত করে দাগী করে দেওয়া হলো। তারা কিছুতেই গোলাম হতে চায়নি" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১৭)।

–এভাবেই একদিকে গ্রেপ্তার, বন্দিত্ব, নির্যাতন ও অপরদিকে ঐসব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শরীরে ক্ষতচিহ্ন করার চিত্র রূপায়ণের ভিতর দিয়ে এই গল্পে গল্পকার দাসব্যবসার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। আর কৃষ্ণাঙ্গদের গোলাম না হতে চাওয়ার মধ্য দিয়ে গল্পকার মূলত আফ্রিকীদের দৃঢ়তাকেই উচ্চকিত করেছেন, যে দৃঢ়তা তাদেরকে মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার দিতে পারবে; পারবে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে উজ্জীবিত করতে।

গল্পটিতে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, কৃষ্ণাঙ্গদেরকে দাস হিসেবে বন্দি করার ক্ষেত্রে মোমতুর মতো এক শ্রেণির কৃষ্ণাঙ্গদের ভূমিকা প্রত্যক্ষভাবে শ্বেতাঙ্গদের চেয়েও বেশি। দাস ব্যবসার ইতিহাসও অন্তত তাই বলে। দাসব্যবসার ইতিহাস পাঠে আমরা দেখব যে, শ্বেতাঙ্গরা আফ্রিকার মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীদেরকে ক্ষেত্রবিশেষে রাজা কিংবা গোত্র প্রধানদেরকের অর্থ, লবণ, কাপড়, মদ, বন্দুক ও ঘোড়া দিত বিনিময়ে এরা স্বজাতি কৃষ্ণাঙ্গদের ধরিয়ে দিত দাসব্যবসায়ীদের কাছে। হাজার হাজার দাস মারা যেত ধরার সময়ে, পালানোর সময়ে কিংবা সাগরে জাহাজে থাকাকালে। পনের থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত কালপর্বে এ ধরনের "মৃতের সংখ্যা প্রায় দুই কোটি" (শাহেদ, ২০১২ : ১৫)।

ঔপনিবেশিক অধীনতা, বর্বরতা, নির্যাতনের সমান্তরালে আফ্রিকার সাহিত্যে প্রতিরোধ ও মুক্তির কথাও উঠে এসেছে বারবার। 'উপজাতির ক্ষতচিহ্ন অথবা ভোল্‌তেইকরা' গল্পটি কেবল আমাদেরকে দাস ব্যবসার চিত্রই দেখায় না। সেইসঙ্গে জাগিয়ে দিতে চায় আমাদের চৈতন্যকে। আমাদেরকে বাধ্য করে ভাবতে ও সক্রিয় হতে। অপারেশন থিয়েটারের বিচক্ষণ শল্যচিকিৎসকের মতো গল্পকার সেমবেন উসমান নিপুণভাবে চিরে চিরে বিশ্লেষণ করেছেন আফ্রিকার দাসব্যবসা সম্পর্কে পশ্চিমাদের তৈরি করা মিথকে; যে মিথ আফ্রিকীদের ঔপনিবেশিক অতীত এবং পশ্চিমাদের দাসব্যবসার সাফাই। তারা আফ্রিকার মানুষ সম্পর্কে অসংখ্য করুণ চিত্রকল্প তৈরি করেছে শুধু দাসব্যবসাকে যুক্তিযুক্ত প্রতিপন্ন করার জন্য ও পরে উপনিবেশ সৃষ্টির পক্ষে সমর্থন সৃষ্টির জন্য। এর ফলে পৃথিবীতে এক বিশেষ ধরনের সাহিত্য

ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে আর সেইসঙ্গে তৈরি হয়েছে আফ্রিকার মানুষকে দেখার এক বিশেষভঙ্গি।

নয়

আফ্রিকার গল্পগুলোতে যে সমাজের চিত্র বিধৃত হয়েছে, সেখানে আমরা দুই ধরনের সমাজের চিত্র পাই– নগর কেন্দ্রিক আধুনিক নাগরিক ফ্লাট জীবনের চিত্র ও গ্রামকেন্দ্রিক গোত্রভিত্তিক আদিবাসী জীবনের চিত্র। নিম্নে সমন্বিতভাবে আফ্রিকার গল্পে রূপায়িত আফ্রিকার সমাজের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হলো :

আফ্রিকার নাগরিক কিংবা গ্রামীণ দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম একটি অনুষঙ্গ মদ (Wine)। সেখানকার নাগরিক কিংবা গ্রামীণ সমাজে মদ খাওয়ার প্রচলন ছিল। আফ্রিকায় প্রাপ্ত মদ দুই ধরনের : প্রথমটি আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের নিজস্ব দেশীয় উপায়ে প্রস্তুত করা মদ অপরটি কলোনাইজারদের সরবরাহ করা ইউরোপীয় মদ। কৃষ্ণাঙ্গরা দেশীয় মদকে ঘৃণা না করলেও শ্বেতাঙ্গদের সরবরাহ করা ইউরোপীয় মদকে ঘৃণা করত। পশ্চিমা মদ সম্পর্কে আফ্রিকানদের মনোভাব বিধৃত হয়েছে সিন্দিওয়ে ম্যাগোনা[১৬] রচিত 'ওইসব নিয়ে এখন কথা হচ্ছে না'[১৭] গল্পে। একটি বৈষম্যবাদী সরকার, শিল্পপতি, পুঁজিপতি ও মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ডাকা বয়কট আন্দোলন, সংঘাত ও সংগ্রামের পটভূমিতে দক্ষিণ আফ্রিকার লাগোসের একটি পরিবারের কাহিনি অবলম্বনে গল্পটি রচিত। বয়কট আন্দোলনটি চলছে তিন সপ্তাহ ধরে। আন্দোলনকারীরা কমরেড নামে পরিচিত। তারা সাম্রাজ্যবাদী ও পুজিবাদী কলোনাইজারদের পুচ্ছধারী সরকারকে অস্বীকার করতে বদ্ধপরিকর। কমরেডদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে মদ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। তাদের মতে, ঐ মদ কৃষ্ণাঙ্গদের মন থেকে আফ্রিকার সত্তাকে সরিয়ে দেয়। "ও একবার যার পেটে ঢোকে আফ্রিকার মাটির গন্ধ আর তার মধ্যে থাকে না" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৩১)। মদকে তারা অভিহিত করে "আফ্রিকানদের জন্য ধরে রাখা সাদা মানুষের মুত" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৩১) বলে। তাদের কাছে পশ্চিমা মদ "সাদালোকদের কীটনাশক যা মেরে ফেলে আফ্রিকার সত্তা" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৪১)। আফ্রিকার সমাজে আনন্দ উদ্‌যাপন করার জন্য কিংবা উৎসবেও মদ পান করার প্রচলন ছিল। 'পদক' গল্পে আমরা দেখি, মেকা পদক প্রাপ্তির আনন্দ উদ্‌যাপন করার জন্য রাতে মদ পান করে ভারসাম্য হারিয়ে শ্বেতাঙ্গদের এলাকায় ঢুকে পড়ে। 'ওইসব নিয়ে এখন কথা হচ্ছে না' গল্পেও দেখা যায় বয়কটের সময়ে সাধারণ লোককে পকেটের পয়সা খরচ করে মদ কিনে খেতে এবং ম্যামভালাইনের স্বামী ল্যাংগাথিকে রাতে মদ খেয়ে মাতাল হতে। তবে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে আমরা মদের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করি 'উপজাতির ক্ষতচিহ্ন' অথবা 'ভোলতেইকরা' গল্পে। সেখানে আমরা দেখি, দেশীয় দাসশিকারিরা দাসদেরকে কয়েক পিপে মদের বিনিময়ে শ্বেতাঙ্গদের কাছে বিক্রি করতে।

আফ্রিকার বহুবিভক্ত গোত্রভিত্তিক সমাজগুলোর মধ্যে গোত্রগত ব্যবধান এবং গোত্রের মধ্যে বিয়ে করার প্রচলন বিদ্যমান। তবে গ্রামীণ সমাজে এই রীতি প্রবলভাবে প্রচল থাকলেও, শহরের শিক্ষিত জনগণের মধ্যে তা দুর্বল। বুকার পুরস্কার বিজয়ী নাইজেরীয় কথাসাহিত্যিক চিনুয়া আচেবে[১৮] (১৯৩০–২০১৩) রচিত 'পরিণয়ে নিজস্ব মত'[১৯] গল্পে আমরা দেখি, গল্পের

নায়ক নিমেকা ইবো গোত্রের লোক। সে "ইউরোপীয় ঘরানায় শিক্ষিত এবং দীক্ষিত এবং সেই কারণে নিজেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, শেকড় ছেঁড়া" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ২০৬)। সে নিজে পছন্দ করে ভালোবেসে বিয়ে করেছে নেনে-কে, যে ইবো গোত্রের নয়। এমতাবস্থায় তাদের পরিণয়ের পারিবারিক স্বীকৃতি অনেকটাই অনিশ্চিত। নায়ক নিমেকা'র কথায় সে সংশয়ের ছাপ স্পষ্ট, "তাছাড়া আমাদের ব্যাপারটা আরো জটিল– যেহেতু তুমি ইবো গোত্রের নও" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৪২)। গল্পটিতে একটি পরিবারের শিক্ষিত সন্তানদের মধ্যদিয়ে গল্পকার তুলে ধরেছেন নাইজেরিয়ার উপনিবেশ-উত্তর সমাজের পরিবর্তন, দেশীয় মূল্যবোধ ও পাশ্চাত্য ভাবধারা তথা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব ও আত্মপরিচয়ের সংকটকে।

আফ্রিকার গোত্রভিত্তিক সমাজগুলোতে আন্তঃগোত্রবিবাহকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিবাহের ক্ষেত্রে কনে দেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাত্রী দেখার সময় "পাত্রীর যে দুটো জিনিস দেখা হয় তা হলো– তার চরিত্র আর ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষা" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৪৪)। চিনুয়া আচেবে রচিত 'পরিণয়ে নিজস্ব মত' গল্পে নিমেকার বাবার কথায় উক্ত বিষয়টিই ফুটে উঠেছে–

> আমাদের প্রতিবেশী জ্যাকব নুয়েকির বড় মেয়ে উগর নুয়েকিকে তোমার জন্য পছন্দ করা হয়েছে। মেয়েটা তোমার জন্য চমৎকার হবে। খ্রিষ্টান ধর্মের সুন্দর আবহে সে বেড়ে উঠেছে। তার বাবা... মেয়েকে একজন প্যাস্টর এর বাড়িতে থাকতে পাঠিয়েছিলেন। ওখানে সে স্ত্রী হিসেবে যেসব গুণাবলী অর্জন করা দরকার তা করেছে।... সে বাইবেল বেশ ভালোভাবেই পড়তে পারে। (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৪৩)

বিয়ের আগে পাত্রের সাথে পাত্রীপক্ষ আলাপ-আলোচনা করত। খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা গির্জায় গিয়ে পবিত্র ক্রুশকে সাক্ষী রেখে ক্রুশের সামনে বিবাহ করত। বিবাহ অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হতো। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল গিটার, ড্রাম, তাম্বুরিন, সরোদ, ঘুংগুর। বিবাহ অনুষ্ঠানে শ্বেতাঙ্গদের অনুকরণে ক্ষমতাবান কৃষ্ণাঙ্গ বর পরিধান করত স্যুট, ওয়েস্ট জ্যাকেট, হ্যাট আর কনে পরিধান করতো সাদা সাটিনের ফুলহাতা গাউন, একটি ওড়না, সাদা দস্তানা, সাদা জুতো-মোজা। বিবাহের মধ্য দিয়ে সমাজে তৈরি হত পরিবার। আফ্রিকার বিশেষত কেনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে আদর্শ পরিবার ও দম্পতির স্বামীটি হবে দীর্ঘাঙ্গ, টিপটপ, একটু আড়ষ্ট ও ধনাঢ্য ভূস্বামী বা ব্যবসায়ী আর স্ত্রীটি হবে আকৃতিতে ছোটখাটো, শান্তশিষ্ট, স্বামীর প্রতি অনুগত, কর্তব্যপরায়ণ, ঝামেলাবিহীন "যেন বিশালাকৃতি স্বামীর পাশে ক্ষীয়মান ছায়ার মতো" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩০৩)।

একক বিবাহের পাশাপাশি বহুবিবাহ আফ্রিকার উপজাতি ভিত্তিক সমাজের সামাজিকরীতি ও প্রথা। স্ত্রী সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সে সমাজে পুরুষের প্রতিপত্তি ও সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হতো। কোনো পুরুষের তিনটি বউ থাকলে বা কোনো পুরুষ তিনটি বিয়ে করলে সমাজ তাকে 'কাপ্তান' (Captain) উপাধিতে ভূষিত করতো। এসব কাপ্তানেরা ছিলো তাদের সমাজে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রাধান্য বিস্তারে আগ্রহী। কতগুলি নারী তার অধিকারভুক্ত এই সংখ্যা ছিলো কাপ্তানদের পৌরুষত্ব প্রমাণের এবং কাপ্তানগিরির বিজ্ঞাপন বিশেষ।

একক কিংবা বহুবিবাহের পাশাপাশি আফ্রিকার সমাজে প্রেম ছিলো; প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটত। 'ক্রুশ সকাশে বিবাহ' গল্পে আমরা দেখি প্রণয়কে পরিণতি

দানের জন্য মিরিয়ামু ওয়ারিউকির হাত ধরে পালিয়ে গেছে আর 'পরিণয়ে নিজস্ব মত' গল্পে পিতার অনুমতি ছাড়াই নিমেকা ভালোবেসে বিয়ে করেছে নেন'-কে।

আফ্রিকার গ্রামীণ জীবনে ধর্মের প্রভাব বেশ সক্রিয়। 'ক্রুশ সকাশে বিবাহ' গল্পে আমরা দেখি, মিরিয়ামুর বাবা-মা বেশ ধর্মভীরু। প্রতি রোববার তারা গির্জায় যেত। সকালে উঠে তাদের প্রথম কাজ ছিল প্রার্থনা করা। সন্ধেবেলায় এবং রাতে খাওয়ার আগে প্রার্থনা করার রীতি ছিল। তারা ছিল ভালো ক্রিশ্চিয়ান পরিবার। আবার 'পরিণয়ে নিজস্ব মত' গল্পেও দেখি, নিমেকার বাবাও বেশ ধার্মিক। সে প্রতিদিন সায়াহ্নে বাইবেল পাঠ করত। উগর নুয়েকির বাবা বাড়িতে প্যাস্টর রেখে মেয়েকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিল। 'ওইসব নিয়ে এখন কথা হচ্ছে না' গল্পেও দেখা যায়, ল্যাংগাথি-ম্যামভেলাইন দম্পতি রাত্রের প্রার্থনা শেষ করে তারপরে ঘুমাতে যেত।

নাইজেরিয়ার ইবো গোত্রের সদস্যদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মের ও বাইবেলের প্রভাব অতি প্রবল। নিমেকা একজন স্কুল শিক্ষয়িত্রীকে বিয়ে করেছে শুনে নিমেকার পিতা ওকে-কে যা বলেছেন তাতে বাইবেলের প্রভাব স্পষ্ট– "কোনো খ্রিষ্টান মেয়ে মানুষ শিক্ষা দেয়ার কাজ করবে না। সেইন্ট পল কারিন্থিয়ানদের তার চিঠিতে লিখেছিলেন– মেয়েরা শুধু নিষ্ক্রিয় থাকবে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৪৪)। খ্রিষ্টধর্ম তথা বাইবেলের প্রভাবের কথা 'ওইসব নিয়ে এখন কথা হচ্ছে না' গল্পেও পাওয়া যায়– সেখানে আমরা দেখি, পুত্র তেতেলি বয়কট আন্দোলনে যোগ দিয়ে পিতা ল্যাংগাথি ও মাতা ম্যামভলেইনের বিরুদ্ধে চলে গেছে। তেতেলি-র মা ম্যামভালেইনের এতে উদ্বিগ্ন। সে বলেছে, "জামানা বদলে গেছে। এখনকার ছেলেদের মতো আমরা আমাদের যুগে হয়তো ভাবতে পারি নি। (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৩৮)। এর উত্তরে স্বামী ল্যাংগাথি বলেছে –"তুমি বলছ বাইবেলের মতো সত্য কথা" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৩৮)। বাইবেলের পাশাপাশি তারা পড়ত রেভারেন্ড ক্লাইভ শোমবার্গ রচিত চিরায়ত গ্রন্থ *আফ্রিকানদের নিমিত্ত ব্রিটিশ সহবৎ* (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩১৪)। আফ্রিকানদের জীবনে ধর্মের এই বিষয়টিকে না বুঝেই ইউরোপের গোষ্ঠীতাত্ত্বিকরা আফ্রিকানদেরকে 'হোমোরেলিজিয়সিস' বলে অভিহিত করতে চান। তাদের মতে, "আফ্রিকাবাসীরা হোমোরেলিজিয়সিস– তারা ধর্মকে এত বেশি গুরুত্ব দেয় বলে জীবনটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।... আফ্রিকীয়দের মানসিকগঠন এরকম বলেই বস্তুগতভাবে তারা আদিম, অনুন্নত" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ২২২)।

সন্তানেরা পিতা-মাতার কথা শুনবে, এটাই আফ্রিকার সমাজের পিতা-মাতাদের প্রত্যাশা ছিল সন্তানদের কাছে। এর ব্যত্যয় ঘটাকে তারা কেয়ামতের আলামত বলে মনে করত। কারণ বাইবেলে কেয়ামতের আলামত হিসেবে বলা হয়েছে যে, ছেলে-মেয়েরা বাবা-মায়ের কথা শুনবে না। এছাড়া বাবা-মায়ের বিরুদ্ধাচরণ কিংবা মুরব্বিদের সম্মান না করাকেও কেয়ামতের আলামত বলে মনে করা হতো। 'পরিণয়ে নিজস্ব মত' গল্পে নিমেকার বাবার সাথে গ্রামের অন্যান্য মুরুব্বিদের আলোচনায় বিষয়টি উদ্ভাসিত হয়েছে এভাবে– "আরেকজন বললেন– আমাদের প্রভু কী বলেছেন? তিনি বলেছেন– ছেলেরা বাবাদের বিরুদ্ধে যাবে– একথা আমাদের পবিত্র গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।... কেয়ামতের শুরু আরকি– আরেকজন বললেন" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৪৫)। তবে এমন ঘটলে তারা ভেঙে না পড়ে ভাবত, সন্তানের কোনো হার্বালিস্ট চিকিৎসকের চিকিৎসা দরকার।

কারণ, সম্ভবত সে অসুস্থ। নাইজেরিয়ার ইবো গোত্রে এই রোগের চিকিৎসায় পথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হত 'এ্যামাইল'। বিপদগামী স্বামীদের ওপর এই ঔষধটি প্রয়োগ করে মেয়েরা তাকে সুপথে নিয়ে আসতে পারত। ঔষধটা তৈরির সময় যাকে খাওয়ানো হবে তার নাম উচ্চারণ করে তৈরি করতে হতো।

আফ্রিকানদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত প্রবল। পরিবার পরিজনকে উদ্ধার করার জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিতেও পিতা কার্পণ্য করে না। 'উপজাতির ক্ষতচিহ্ন অথবা ভোলতেইকরা' গল্পে দেখা যায়, আমু তার মেয়েকে উদ্ধার করার জন্যে মোমতুর দলের সাথে মিশে জীবনবাজি রেখে শ্বেতাঙ্গদের জাহাজ আক্রমণ করেছে এবং মেয়েকে জাহাজ থেকে উদ্ধার করে এনেছে। "যাতে তার স্ত্রীকে এই দাস শিকারিরা ধরে নিয়ে যেতে না পারে সে জন্য সে নিজের হাতে তার স্ত্রীকে খুন করেছিল" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১৫)। আবার নিজের পরিবারকে এত গভীরভাবে ভালোবাসাকে সবাই ইতিবাচকভাবে দেখত না। আমুকে লক্ষ করে মোমতুর দলের একজনের উক্তি, "লোকটা ছিটেল আছে। নিজের গ্রাম, নিজের বৌ, নিজের মেয়ে ছাড়া কিছুর কথাই ও ভাবে না" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৯)।

আফ্রিকার "গ্রাম মানে গোটা তিরিশ কুঁড়ে বাড়ি, একে আরেকের গায়ে জড়াজড়ি করে আছে, ঠিক জঙ্গল আর নদীর মুখটায়" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১৩)। এর একটি কারণ নদী পাশে থাকায় সহজেই প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যেত। অপর কারণটি হলো দাসশিকারীরা নদী পথে আসলে দূর থেকেই তাদের আগমন বুঝা যেত এবং পাশে জঙ্গল থাকায় পালিয়ে আত্মরক্ষা করা সুবিধাজনক ছিল। এছাড়াও দাসব্যবসায়ীদের ভয়ে লোকজন সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় থাকতে ভয় পেত কারণ সেখানে থাকলে ধরা পড়ার ও বন্দি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বেশি।

আফ্রিকার আদিবাসী গোত্রগুলো সাধারণত তাদের পুরাতন বসতি পরিত্যাগ করতে চাইত না; বিশেষত শীতকালে বসতি ত্যাগ করতে একবারেই চাইত না। কারণ তারা যেখানে বাস করে, সেখানে ছিল জলের সহজলভ্যতা ও পারিবারিক কবরস্থান। পুরাতন বসতি ত্যাগ করার সময় সেখানে বলিদান বা উৎসর্গ করার প্রথা ছিল। দাসশিকারিদের আগমন বুঝার জন্য আফ্রিকার গ্রামগুলোতে পাহারার ব্যবস্থা ছিল। দাসশিকারিদের ভয়ে ঘুমানোর সময় তারা হাতের কাছে অস্ত্র রাখত। বিপদের সময়ে বা ক্রান্তিকালে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা সম্পদকে সাধারণ সম্পত্তি বলে মেনে নেওয়ার রীতি ছিল। সবাই গোত্রের প্রয়োজনে যৌথভাবে কাজ করত। সমালোচকের মতে, "আফ্রিকার মানুষেরা সরল, তারা সহজে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথ্যঐতিহ্যের বিধিনিষেধ" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ২২৫)।

কোনো কারণে আফ্রিকানরা পুরাতন বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হলে, নতুন বাসস্থানে যাওয়ার আগে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করত। নতুন বাসস্থান সন্ধানের জন্য তারা লোক পাঠাত। যে জায়গায় তারা যাবে, সেই জায়গার ভৌগোলিক অবস্থানটা দেখত। নতুন জায়গা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা কিছু বিষয়কে বিবেচনায় রাখত। যেমন সেখান থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকাটা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় কিনা? পাশে পানির সহজলভ্যতা আছে কিনা? দাসব্যবসাকালীন আফ্রিকার গ্রামগুলোতে রাতের বেলা আগুন জ্বালানো নিষেধ ছিল। কারণ

এতে দাসশিকারিরা সহজেই অন্য মানুষদের অবস্থান নির্ণয় করে ফেলতে পারত। দাসশিকারিদের সহায়তা করত আড়কাঠিরা। আড়কাঠিরা হলো নিজেদের দেশের লোক। শ্বেতাঙ্গদের হয়ে দাস ধরার কাজ করে বলে তারা দালাল হিসেবে অভিহিত।

আফ্রিকার গোত্রভিত্তিক সমাজগুলো প্রধানত পুরুষতান্ত্রিক তবে কিছু কিছু মাতৃতান্ত্রিক পরিবারও রয়েছে। আফ্রিকার উপনিবেশিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ চরিত্রের মাত্রা দ্বিবিধ; এক দিকে তারা পুরুষ অপরদিকে তারা ঔপনিবেশিক শাসক। অপরদিকে ঐ সমাজে নারীকে শৈশব থেকেই শেখানো হয় যে, স্নেহ-মায়া-মমতা-ক্ষমা– এই অনুভূতিগুলো কেবল তাদের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে এবং নিরাপত্তার জন্যই তাকে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। সেই পুরুষ হতে পারে তার স্বামী, পিতা কিংবা পুত্র যে কেউ। এই সমাজে নারী জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের নিয়ন্ত্রক ও রক্ষাকর্তা একজন পুরুষ। এর প্রমাণ আমরা পাই, সিন্দিওয়ে মাগোনা রচিত 'ওইসব নিয়ে এখন কথা হচ্ছে না' গল্পে। সেখানে আমরা দেখি, আকস্মিক উত্তেজনার বশে ম্যামভালাইনের স্বামীর হাতে পুত্রের মৃত্যু ঘটে। বেঁচে থাকার জন্য তার কাছে স্বামী ও পুত্র দু'জনেরই প্রয়োজন ছিল। ছেলেকে হত্যার অপরাধে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় তার স্বামী ল্যাংগাথিকে। ছেলের শেষকৃত্যের সময় ল্যাংগাথি পুলিশের কাছে প্যারোলের অনুমতিও চায়নি, আসেওনি। কিন্তু কি কারণে ল্যাংগাথি অনুমতি চায়নি বা আসেনি সেই প্রশ্ন ম্যামভালাইন স্বামীকে করতে পারে না। লেখিকার ভাষায়–

> সে বলেছিল– 'আমি চাইনি'। ঠিক কী জিনিস যে সে চায়নি ম্যামভালেইন তা জিজ্ঞেস করতে পারেনি। কারণ যে উত্তর আসবে তা হয়তো শয়তানের গুরুজের মতো তাকে আঘাত করতে থাকবে সারাটা জীবন। সে কি চায়নি যে নিজের ছেলের অন্ত্যেষ্টিতে সে থাক, না কি সে চায়নি অন্ত্যেষ্টিতে অংশগ্রহণের জন্য জেলখানার অনুমতি। ম্যামভালেইন বুঝতে পারেনি এর কোনটি। ম্যামভালেইন এ–ও বুঝতে পারেনি এর কোনটি তার জন্য কম কষ্টের (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩৪১)।

তাই, আফ্রিকার সমাজে পুরুষের শত বঞ্চনাকে নারীরা শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করে। সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নারী পিঠে ছেলেকে নিয়ে মাঠে কায়িকশ্রম করে ছেলেকে মানুষ করে। কারণ পুরুষেরা হয় স্বামী, পিতা বা ছেলে। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই নারী এই বন্ধনকে অস্বীকার করতে পারে না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে বঞ্চিত করার জন্যই শৈশব থেকেই তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ত্যাগের মহিমা।

আফ্রিকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নিজেদের সুবিধার্থে সমাজে নারীদের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যে নারী সুগৃহিণী সে কেবল ঘরের কাজ করে। মেয়েলি কাজের মধ্যেই তার জীবন সীমাবদ্ধ। মেয়েলি কাজ মানে সাংসারিক কাজ। রান্না করা, কাপড় কাঁচা, ছেলে মেয়ে মানুষ করা ইত্যাদি খুঁটিনাটি কিন্তু অন্তহীন কাজ। এই সব সামান্য কাজ পুরুষালি কাজের মধ্যে পড়ে না। আবার যে সব নারী রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তারা সংসার সামলাতে পারে না তাই তারা সাংসারিক কাজকর্ম করে না। অর্থাৎ আফ্রিকার সমাজে নারী হয় ঘরোয়া, শান্ত, সাধারণ, মূক নয়তো সে আধুনিকা কিংবা বিপ্লবিনী।

আফ্রিকার সমাজে নারীকে বিবেচনা করা হয় 'জন্মদুর্বল' ও 'স্বভাবদুর্বল' হিসেবে। যেসব নারীরা সমাজ স্বীকৃত সীমারেখার বাইরে অর্থাৎ সংসারের অন্দর থেকে বেরিয়ে বহির্জগতের

কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তারা 'আধুনিকা' নামে পরিচিত হয়। এসব মেয়েরা চুল ছাঁটে, বিদেশি পোশাক পরে। অর্থাৎ আফ্রিকার সমাজের মেয়েরা কর্মপটিয়সী সুগৃহিণী হয় অথবা ছাঁটা চুলের আধুনিকা হয়।

আফ্রিকার গল্পগুলোতে আমরা যেসব খাদ্যদ্রব্য ও রান্নার সামগ্রীর উল্লেখ পাই, তার মধ্যে রয়েছে গোল আলু, পেঁয়াজ, ডাল, নুন, মাছ, গোশত, সবজি, চা, সুগার, যব, গুঁড়োদুধ, প্যাফিন, সসেজ, রুটি। তারা সবজি ঘন্ট করে। তাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্য ছিল ক্যাসাভা, তালের তেল (পামওয়েল), মাখন, শিম, মধু।

আফ্রিকার সমাজে জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে নৌকা নিয়ে নদীতে মাছ ধরার প্রচলন ছিল। কেনিয়ার স্বাধীনতাপূর্বকালের সমাজে উল্টাভাবে সাইকেল চালিয়ে অন্যদের আনন্দদানের প্রচলন ছিল। ঐ সমাজে মেয়েরা বিপদের সময় বুকের মধ্যে পয়সা লুকিয়ে রাখত। পাখির মাংস খাওয়ার প্রচলন ছিল। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হলে স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে স্বামীগৃহ ত্যাগ করে বাপেরবাড়ি যেত। পিতা-পুত্রের মধ্যে মনোমালিন্য হলে সম্পর্কচ্ছেদের ঘটনাও ঘটত তবে পিতা পুত্রকে ভুলে যেত না।

সময় সম্পর্কে আফ্রিকার গোত্রভিত্তিক সমাজগুলোর ধারণা বেশ স্বতন্ত্র। বেলজিয়ান ঐতিহাসিক এবং আফ্রিকা গবেষক জান ভানসিনার মতে, "মৌখিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে দেখা যাবে আফ্রিকানরা সময়কে ভাবেন অতীতেরই চক্রাকারে ঘূর্ণন হিসেবে, বর্তমান তারই অঙ্গবিশেষ এবং সেখানে ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই" (উদ্ধৃত, শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৪৮)। 'উপজাতির ক্ষতচিহ্ন অথবা ভোলতেইকরা' গল্পে আমরা এই সময় ধারণার পরিচয় পাই। আমুদের গ্রামে দাসশিকারিদের আগমনের সময় নির্দেশ করতে গিয়ে গল্পকার বলেছেন, "তিনগুণ তিন অমাবস্যা আগে দাস শিকারিরা আমুদের গ্রামে হামলা করেছিল" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩০৯)। আর আমুদের গ্রামের এক মুরব্বি নিজেদের অনিরাপত্তার কথা বলেছে এভাবে– "পাঁচ'ছ বর্ষা আগে আমরা ভেবেছিলাম এখানে বেশ নিরাপদ আছি। কিন্তু এখন আর মোটেই নিরাপদ নই। গ্রাম থেকে মাত্র সাড়ে তিন দিনের পথ দূরে একটা দাস শিবির আছে" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১৩)।

পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন ইউরোপের সাথে আফ্রিকার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আফ্রিকার সমাজগুলো ছিল গোত্রভিত্তিক এবং সামন্ততান্ত্রিক। তখনও আফ্রিকার সমাজে ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং সমাজ ছিল মোটামুটি স্বনির্ভর; এক কথায় পুঁজিবাদবিরোধী। তখন গোত্রপতির নামেই বরাদ্দ ছিল সমস্ত ভূ-সম্পত্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদে ছিল গোত্রের সবার সমানাধিকার। গোত্র পরিচালিত হতো দৃঢ় সমষ্টিজ্ঞান, দায়িত্ববোধ এবং অলিখিত নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা।

আফ্রিকার গল্পগুলো আফ্রিকার জীবন ও সমাজের দর্পণ। আফ্রিকার গল্পকারেরা গল্পগুলোতে আফ্রিকার জনগোষ্ঠীর রীতি, আচার, উৎসব, প্রবাদ, লোককথার পর্যাপ্ত ব্যবহার করেন ফলে, "পাঠকের চৈতন্যে আফ্রিকী বাস্তবতা চিত্রিত হয়ে যায়" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ২০৬)।

দশ

আফ্রিকার গল্পগুলোয় কেবল ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ, অত্যাচার, বঞ্চনা ও বঞ্চনার উপলব্ধির রূপায়ণই ঘটেনি অধিকন্তু গল্পগুলোতে রূপায়িত হয়েছে বঞ্চনার অবসান প্রকাশক এক অপরিমেয় আশাবাদের ও সোনালি সুদিনের আগমনের প্রত্যাশার, য়ার ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটি সুন্দরজীবন, স্বাধীনদেশ ও খাদ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা। 'অন্য পশু কেন খোদা করো না' গল্পটিতে আমরা দেখেছি এক চিত্রকরকে, যে কোনোদিন জলপ্রপাত দেখেনি অথচ সে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের ছবি এঁকেছে পত্র-পত্রিকায় দেখা জলপ্রপাতের ছবির স্মৃতির ওপর ভিত্তি করে। সে কখনো জলপ্রপাত দেখেনি ফলে সে জানে না জলপ্রপাতের জলের রং কেমন। সে কোথায় যেন শুনেছিল মানচিত্রে সমুদের জলের রং নীল দেখানো হয়েছে। সে মনে মনে ভাবে জলপ্রপাতের পানি তো সমুদ্রের পানির মতোই এবং আকাশের রঙের মতো দেখায়, তাই জলপ্রপাতের পানির রং হবে নীল। এছাড়াও সে ভাবে ছবিতে আবেগ সঞ্চার করতে হলে জলের রং অবশ্যই হতে হবে নীল। এভাবেই সে জলপ্রপাতের ছবি আঁকে আর ছবিটাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য ছবির এক কোনায় প্রেমিক-প্রেমিকাকে নিয়ে আসে। গল্পকারের ভাষায়–

> চিত্রকর কল্পনায় তার ছবির এক কোনায় দু'জন প্রেমিক-প্রেমিকাকে নিয়ে আসে। তারা পরস্পরকে এমনভাবে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে যেন তাদের প্রেম নীল জলে স্থির হয়ে আছে। ছবিটার সবচেয়ে উপরে রয়েছে একটি পাখি যে গান গাইছে। তার ঠোঁট দুটো খোলা। জলপ্রপাত থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা প্রেমিক প্রেমিকার ওপর আসতে পারে তাই সে তাদের ওপরে একটা লাল রঙের ছাতা এঁকে দেয়। কিন্তু তার মনে হয় ছবি থেকে কিছু যেন বাদ পড়েছে তাই সে প্রেমিক যুগলের হাতগুলো লম্বা করে তাতে ধরিয়ে দেয় হলুদ আইসক্রিম। ছবিটি এখন জীবনে পরিপূর্ণ (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০২ : ৩৩২)।

শত প্রতিকূল অবস্থার পরেও তাঁদের মনে একটি নির্মল, সুন্দর, সৃষ্টিশীল সত্তা ক্রিয়াশীল ছিল। 'উপজাতির ক্ষতচিহ্ন অথবা ভোলতেইকরা' গল্পে আমরা দেখেছি বিপদের সম্ভাবনার মধ্যে থেকেও আমুর মনের সৃজনশীল সত্তা সক্রিয় রয়েছে। সে "একটা কাঠের টুকরো কেটে কেটে একটা পুতুল বানাচ্ছিল" (শিবনারায়ণ ও শামীম, ২০০৪ : ৩১১)।

এগারো

আফ্রিকার গল্পগুলো আফ্রিকী জীবন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ, সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও প্রকাশক। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলো যথা- ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ, অত্যাচার, বঞ্চনা, দাসব্যবসা, বর্ণবাদ ও শ্রেণিবিভক্ত সমাজ এবং এগুলোর পাশাপাশি আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের জীবনের সার্বিক চিত্র গল্পগুলোতে নিপুণভাবে উৎকীর্ণ। গল্পগুলো আফ্রিকার বিভিন্নদেশের সাহিত্যিকদের দ্বারা রচিত হলেও গল্পগুলোতে একদিকে যেমন মহৎ শিল্পের লক্ষণগুলো পরিদৃশ্যমান তেমনি অপরদিকে বিপন্ন ও কলুষিত অতীত ইতিহাসকে ধারণ করেও সোনালি সুদিনের আগমনের প্রত্যাশায় প্রোজ্জ্বল এবং সেখানে নবযুগ সৃষ্টির পূর্ণ প্রতিশ্রুতিও বিদ্যমান। শত শোষণ, শাসন, অত্যাচার, বঞ্চনা ও বিপন্নতার ভিতরে অবস্থান করেও গল্পকারগণ তাঁদের সাহিত্যে বৈরাগ্য, বিতৃষ্ণা, হতাশা কিংবা বিকারের চিত্র

অঙ্কন করেননি বরং মানুষ ও জীবনের প্রতি অবিচল বিশ্বাসকে সমুন্নত রেখে সোনালি সুদিনের ও মঙ্গলময়তার কথাই বারবার বলেছেন। আফ্রিকার গল্পগুলো সমকালের হয়েও সর্বকালের।

আকর গ্রন্থ

ক. শিবনারায়ণ রায় ও শামীম রেজা *সম্পা.* (২০০২)। *আফ্রিকার সাহিত্য সংগ্রহ–১*। কাগজ প্রকাশন, ঢাকা।

খ. শিবনারায়ণ রায় ও শামীম রেজা *সম্পা.* (২০০৪)। *আফ্রিকার সাহিত্য সংগ্রহ–২*। কাগজ প্রকাশন, ঢাকা।

টীকা

১. 'একমুঠো খেজুর' গল্পটি তায়েব সালেহ রচিত '*A Handful of Dates*' গল্পের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন মুহম্মদ মুহসিন।

২. 'আধুনিক আরবি উপন্যাসের অন্যতম প্রতিভা' কৃষাঙ্গ লেখক তায়েব সালিহ'র (Tayeb Salih, 1929-2009) জন্ম সুদানের উত্তর প্রদেশের নীল নদের তীরবর্তী শহর আল ডাব্বা'য় (Al Dabbah)। তিনি সুদানের একজন প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক। তিনি খার্তুমের গর্ডন কলেজ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং শিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল কৃষি সংশ্লিষ্ট পেশায় নিযুক্ত হবেন কিন্তু উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ইংল্যান্ডে চলে যান। তিনি ইউনেস্কোর হয়ে প্যারিসে, বিবিসি আরবি বিভাগে ও কাতারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের ডাইরেক্টর জেনারেল হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেন। তাঁর গ্রন্থগুলো হলো : Doumat wad Hamid (১৯৬০); Urs al-Zayn (The Wedding of Zein, 1964); *A Handful of Dates* (1964); *Mawsim al-Hijra ila al-Shamal* (Season of Migration to the North, 1967); *Daw al-Bayt* (Bandarshah I, 1971); *Maryud* (Bandarshah II, 1976)। দামেস্ক ভিত্তিক আরব লিটারারি অ্যাকাডেমি ২০০১ সালে তাঁর *Season of Migration to the North* উপন্যাসটিকে 'বিশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরবি উপন্যাস' হিসেবে স্বীকৃতিদান করে। তাঁর রচিত গ্রন্থ ২০টিরও অধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। পূর্ব-পশ্চিমের সংস্কৃতির সংঘর্ষ, বাস্তবতা ও বিভ্রম, ভ্রাতৃত্বের ঐক্য ও দ্বন্দ্ব এবং এসব অসঙ্গতির মধ্যে সংমিশ্রণ খুঁজে পাওয়ার জন্য ব্যক্তির যে দায়িত্ব তা তাঁর লেখার বিষয়বস্তুতে ও অঙ্কিত চরিত্রে স্পষ্ট। তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় বিদেশে অতিবাহিত করেছেন কিন্তু তাঁর অধিকাংশ লেখার পটভূমি গড়ে উঠেছে ইসলামিক আবহমণ্ডিত গ্রামীণজীবন ও উত্তর সুদানের জনগণের জটিল সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে; যে জীবনকে তিনি শৈশব ও কৈশোরে অতিবাহিত করেছিলেন।

৩. কৃষ্ণাঙ্গ লেখক নগুগি ওয়া থিয়ঙ্গ (Ngũgĩ wa Thiong'o) আফ্রিকার অন্যতম ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক ও শিশুসাহিত্যিক। তাঁর জন্ম কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি'র নিকটবর্তী Kamiriithu-তে ১৯৩৮ সালের ৫ই জানুয়ারি গিকুয়ু গোত্রে। খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁর নাম রাখা হয় জেমস্ নগুগি। স্থানীয় বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে তিনি উগান্ডায় চলে যান এবং সেখানকার Makerere University College থেকে ১৯৬৩ সালে ইংরেজিতে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি ১৯৬২ সালে সেখানে অনুষ্ঠিত আফ্রিকান সাহিত্যিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি চিনুয়া আচেবে'-কে তাঁর লেখা *The River Between Ges Weep Not, Child* উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করতে দেন। এর কয়েক বছর পরই ১৯৬৪ সালে লন্ডন থেকে বইটি প্রকাশিত হয়। চিনুয়া আচেবে ছিলেন বইটির সম্পাদনা পরিষদের উপদেষ্টা। বইটি ছিল লন্ডন থেকে ইংরেজিতে প্রকাশিত প্রথম কোনো পূর্ব আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ লেখকের বই। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো হলো : *Weep Not, Child* (১৯৬৪); *The River Between* (১৯৬৫); *A Grain of Wheat,* (১৯৬৭); *Petals of Blood* (১৯৭৭); *Caitaani*

mutharaba-Ini (*Devil on the Cross*, 1980); *Matigari ma Njiruungi* (১৯৮৬); *Mũrogi wa Kagogo* (*Wizard of the Crow*, 2004)। তাঁর গল্পগ্রন্থ দুটির নাম হলো : *A Meeting in the Dark* (১৯৭৪); *Secret Lives, and Other Stories* (১৯৭৬)। তিনি প্রথমে ইংরেজি ভাষায় লেখালেখি শুরু করলেও পরবর্তীকালে বুঝতে পারেন যে, এগুলো আসলে ঔপনিবেশিক মানসিকতার ছাপ। তাই ১৯৬৭ সাল থেকে তিনি জেমস্ নগুগি নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নাম রাখেন এবং নিজস্ব Gikuyu ও Swahili ভাষায় লেখা শুরু করেন। গিকুয়ু ভাষায় প্রকাশিত *Mũtĩiri* নামক জার্নালের তিনি সম্পাদক। তিনি কেনিয়ায় বেশ কয়েক বছর কারাভোগ করেন। অতঃপর কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং ১৯৮৯-১৯৯২ সাল পর্যন্ত ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করেন। ১৯৯২ সালে তিনি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে Comparative Literature এবং Performance Studies বিষয়ে অধ্যাপনা করেন এবং 'এনরিখ মারিয়া রেমার্ক চেয়ার' হিসেবে মনোনীত হন। বর্তমানে তিনি Distinguished Professor of English and Comparative Literature এবং Director of the International Center for Writing and Translation হিসেবে University of California (Irvine)-এ কর্মরত আছেন। তিনি বেশ কয়েকবার নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। তাঁর লেখার বিষয়বস্তু অনেকাংশে রাজনৈতিক এবং উত্তর ঔপনিবেশিক। তাঁর লেখার বিষয়বস্তু ও ভাষা সম্পর্কে *Publishers Weekly* মন্তব্য করেছিল : "Ngugi's language is fresh; the questions he raises are profound, the argument he makes is clear: 'To starve or kill a language is to starve and kill a people's memory bank।"

৪. 'ক্রুশ সকাশে বিবাহ' গল্পটি নগুগি ওয়া থিয়ঙ্গ রচিত 'Wedding at the Cross' গল্পের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন ধ্রুব গুপ্ত।

৫. কৃষ্ণাঙ্গ লেখিকা ভেরোনিক তাজো'র (Véronique Tadjo, 1955-) জন্ম ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। তিনি বড় হয়ে ওঠেন আইভরিকোস্টের রাজধানী আবিষদজানে। সেখানে স্কুল জীবন শেষ করে তিনি ভর্তি হন আবিদজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে। পরবর্তীকালে ফ্রান্সের সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 'আফ্রিকার সাহিত্য ও সভ্যতা' বিষয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ শতকের আশির দশকের প্রথম দিকে তিনি আবিদজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং নব্বইয়ের দশকে স্বামীর সঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি'তে। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরু কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। ১৯৮৪ সালে *Latérite* নামে একটি কবিতা সংকলন বের হয়। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হলো : *A vol d'oiseau* (১৯৮৬), *A mi-chemin* (২০০০)। তাঁর উপন্যাসগুলো হলো : *Le Royaume aveugle* (*The Blind Kingdom*, 1991); *Champs de bataille et d'amour* (১৯৯৯); *L'ombre d'Imana: Voyages jusqu'au bout du Rwanda* (*The Shadow of Imana: Travels in the Heart of Rwanda*, 2000); *Reine Pokou* (*Queen Pokou*, 2005); *Loin de mon père* (*Far from My Father*, 2010)। তাঁর রচিত '*Mamy Wata et le Monstre*' গ্রন্থটি বিশ শতকে আফ্রিকায় রচিত শ্রেষ্ঠ ১০০টি বইয়ের মধ্যে স্থান লাভ করে। তিনি ইউনিসেফ পুরস্কারসহ বেশ কয়েকটি পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ২০০৭ সাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গে অবস্থিত University of the Witwatersrand-এ 'ফ্রেন্স স্ট্যাডিজ' বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন।

৬. 'এক জাদুকর ও এক তরুণীর গল্প'টি অনুবাদ করেছেন আহমেদ শামীম।

৭. উপনিবেশ পরবর্তী আফ্রিকার সাহিত্যিকদের মধ্যে পাঠকদের কাছে ব্যাপকভাবে পঠিত ও সমাদৃত কৃষ্ণাঙ্গ লেখিকা ইভোন্নি ভেরা'র (Yvonne Vera, 1964-2005) জন্ম জিম্বাবুয়ের বুলাওয়েতে। স্থানীয় বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে তিনি ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি (টরেন্টো, কানাডা) থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচ. ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। তাঁর গল্প সংকলনের নাম *Why Don't You Carve Other Animals* (১৯৯২)। তিনি ১৯৯৭ সালে বুলাওয়েতে অবস্থিত National Gallery of Zimbabwe-র পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ২০০৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হলো *Nehanda* (1993), *Without a Name* (1994), *Under the Tongue* (1996), *Butterfly Burning* (1998), *The Stone Virgins* (২০০২)। এর পাশাপাশি তিনি

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের নারীদের লেখা নিয়ে কয়েকটি সংকলনও সম্পাদনা করেছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম একটি হলো '*Opening Spaces : an Anthology of Contemporary African Women's* Writing' (১৯৯৯)। তাঁর লেখা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে জিম্বাবুয়ে ও কানাডাতে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখালেখির বিষয়বস্তু জিম্বাবুয়ের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কঠিন অতীতের খুন, ধর্ষণ, নিষ্ঠুরতা, শিশুহত্যা ও লিঙ্গবৈষম্য। তাঁর কাহিনির নির্বাসিত আত্মারা ইতিহাস ও তাৎক্ষণিকতার ভেতরে পাঠককে যোগাযোগ খুঁজতে প্ররোচিত করে। তাঁর গল্পের নারী চরিত্রগুলো বেশ বলিষ্ঠ। তাঁর গদ্য প্রগাঢ়, গীতিধর্মী ও কাব্যময়। নিজের জাতিকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। শব্দ ব্যবহারে তাঁর কোনো ভীতি ছিল না। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "I would love to be remembered as a writer who had no fear for words and who had an intense love for her nation."

৮. 'অন্য পশু কেন খোদাই করো না' গল্পটি ইভোন্নি ভেরা রচিত '*Why Don't You Carve Other Animals*' গল্পের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন মোস্তফা মীর।

৯. নাডিন গার্ডিমার (Nadine Gordimer, 1923–2014) দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক কর্মী। তাঁর জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গের অদূরে East Rand mining শহরের অন্তর্গত Springs, Gauteng নামক স্থানে। তিনি স্থানীয় ক্যাথোলিক কনভেন্ট স্কুলে অধ্যয়ন করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস *The Lying Days* প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে। তাঁর লেখালেখির বিষয় দক্ষিণ আফ্রিকার নৈতিক ও জাতিগত সমস্যা, বিশেষত বর্ণবাদ। অল্প বয়স থেকেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবিধানিক বর্ণবৈষম্য ও জাতিগতবিভেদ সম্পর্কে অবগত ও সোচ্চার ছিলেন, কারণ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গ পরিবারের লোক হলেও শৈশব থেকে তাঁর এসব ভালো লাগেনি। কালো মানুষদের ওপর শ্বেতাঙ্গ জনগণ এমনকি সরকার আরোপিত জাতিগত অর্থনৈতিক অসমতা, দারিদ্র্য, বৈষম্য প্রভৃতির চিত্র যেমন তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি রূপায়িত হয়েছে নির্বাসিত ও অভিবাসী কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের জীবন। তিনি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লেখার কারণে তাঁর দুটি উপন্যাস *Burger's Daughter* এবং *July's People* দক্ষিণ আফ্রিকায় নিষিদ্ধ হয়। তিনি মনে করতেন, দক্ষিণ আফ্রিকার উচিত তার দীর্ঘদিনের অনুসৃত বর্ণবাদ নীতিকে পুনর্নিরীক্ষা করা ও বদলে ফেলা। তিনি এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির পক্ষেও কাজ করেন। তিনি ১৯৯১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১০. 'সাড়ে তিন হাত মাটি' গল্পটি নাডিন গার্ডিমার রচিত 'Six Feet of the Country' গল্পের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন দুলাল আল মনসুর।

১১. কৃষ্ণাঙ্গ সাহিত্যিক ফার্দিনান্দ ওইনো (Ferdinand Oyono)'র জন্ম আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলীয় দেশ ক্যামেরুনের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশের Ebolowa এর নিকটবর্তী N'Goulémakong-তে ১৯২৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। তাঁর মূল নাম Ferdinand Léopold Oyono। তিনি ছিলেন ক্যামেরুনের একজন কূটনৈতিক, রাজনৈতিক এবং উপনিবেশবিরোধী কথাসাহিত্যিক। তিনি ক্যামেরুনের রাজধানী ইয়াউন্ডে থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং আইন ও প্রশাসন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করার জন্য প্যারিসে যান। ক্যামেরুনের স্বাধীনতা লাভের পর তিনি প্রথম পর্যায়ে ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৮২-৮৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে ক্যামেরুনের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৪-৮২ কালপর্বে জাতিসংঘে ক্যামেরুনের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ২০১০ সালের ১০ জুন মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সময়ে ক্যামেরুন সরকারের গৃহায়ণ ও নগর পরিকল্পনা মন্ত্রী, বৈদেশিক সম্পর্ক তথা পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সংস্কৃতি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হলো : *Une vie de boy* (*Houseboy*, ১৯৫৬); *Le Vieux Nègre et la médaille* (*The Old Man and the Medal,* 1956); *Chemin d'Europe* (*Road to Europe,* 1960)। তিনি প্রথমে ফরাসি ভাষায় লিখতেন। পরে সেগুলোকে ইংরেজিতে ভাষান্তর করা হয়েছিল। তাঁর লেখালেখি কলোনিয়াল ব্যঙ্গ ও উপহাসে ভরপুর এবং সেখানে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে মানুষকে অতি সহজে বোকা বানানো যায়।

১২. 'পদক' গল্পটি তাঁর ফার্দিনান্দ ওইনো রচিত '*The Old Man and the Medal*' গল্পের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন খলিকুজ্জামান ইলিয়াস।

১৩. পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সেনেগালের চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক ও লেখক সেমবেন ওসমান (Ousmane Sembène, 1923-2007) উপনিবেশ পরবর্তী আফ্রিকান সাহিত্যের অন্যতম সাহিত্যিক। তিনি 'আফ্রিকান চলচ্চিত্রের জনক' হিসেবে খ্যাত আর 'Los Angeles Times' এর মতে, তিনি 'আফ্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকদের একজন'। তিনি পশ্চিম আফ্রিকার সেয়ার (Serer) গোত্রের লোক। তাঁর জন্ম সেনেগালের দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকা Casamance-র Ziguinchor শহরে একটি কৃষ্ণাঙ্গ জেলে পরিবারে। তাঁর মাতৃভাষা উওলোফ (Wolof) কিন্তু তিনি ফ্রেন্স ও আরবি জানতেন। তিনি প্রথমে কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও উপন্যাস রচনার মাধ্যমে সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং সাহিত্যরচনাকেই জীবিকানির্বাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা *Liberté* (১৯৫৬)। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম '*Le Docker Noir*' (The Black Docker, 1956), '*O Pays, mon beau peuple!*' (Oh country, my beautiful people!, 1957), তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাস হলো '*Les Bouts de Bois de Dieu*' (God's Bits of Wood, 1960)। উপন্যাসটিকে তুলনা করা হয় Émile Zola'র 'Germinal' উপন্যাসের সাথে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলো হলো : *Le dernier de l'empire* (The Last of the Empire, 1981), *Guelwaar* (১৯৯৬), *Le mandat, précédé de Vehi-Ciosane* (The Money-Order with White Genesis, 1966)। তাঁর ছোটগল্পের সংকলনের নাম '*Voltaïque*' (Tribal Scars)। সংকলনটি প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে আর ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থগুলো হলো : *L'Harmattan* (১৯৬৪), *Xala* (১৯৭৩), *Niiwam* (১৯৮৭)। তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মে নারীরা একটি বড় ভূমিকা পালন করে। তাঁর রচনার একটি বড় বিষয় বর্ণবাদ। তাঁর প্রকাশিত দশটি সাহিত্যকর্মের সাতটিই ইংরেজিতে অনূদিত হয়। প্রথমে সাহিত্যরচনায় নিমগ্ন থাকলেও তিনি পরে বুঝতে পারেন যে, সাহিত্যের মাধ্যমে আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরক্ষর সাধারণ লোকের কাছে তিনি পৌঁছাতে পারছেন না। তাঁর দৃষ্টিতে, তাদের কাছে পৌঁছানোর আরও সক্রিয় মাধ্যম হলো চলচ্চিত্র। তাই তিনি লেখালেখির জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ১৯৬২–৬৩ সাল পর্যন্ত মস্কোয় অবস্থান করেন এবং বিখ্যাত সোভিয়েত চলচ্চিত্র পরিচালক মার্ক ডস্কয় এর তত্ত্বাবধানে 'গোর্কি ফিল্ম স্টুডিও'তে চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। তাঁর নির্মিত প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের নাম 'Black Girl' (১৯৬৬)। চলচ্চিত্রটির জন্য তিনি সম্মাজনক 'Jean Vigo' পুরস্কার লাভ করেন।

১৪. উপজাতির ক্ষতচিহ্ন অথবা ভোলতেইকরা গল্পটি সেমবেন ওসমান রচিত 'Tribal scars or The Volaique' গল্পের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫. কৃষ্ণাঙ্গ কবি, নাট্যকার, গল্পকথক, অভিনেত্রী, অনুবাদক ও প্রেরণাদানকারী বক্তা সিন্দিওয়ে ম্যাগোনা (Sindiwe Magona)'র জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সকিতে ১৯৪৩ সালের ২৭ আগস্ট। তিনি বেড়ে ওঠেন কেপটাউন শহর এলাকায় এবং সেখান থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি University of South Africa থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং Columbia University থেকে সাংগঠনিক সমাজকর্ম বিষয়ে এম.এসসি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি Hartwick College, Oneonta থেকে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি প্রায় ২০ বছরেরও অধিক সময় জাতিসংঘে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করছেন এবং আবাসিক লেখক হিসেবে কাজ করছেন University of the Western Cape (দক্ষিণ আফ্রিকা) এবং Georgia State University (আটলান্ট, যুক্তরাষ্ট্র)-তে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ প্রথার অবসানে তিনি ভূমিকা পালন করেন। তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা হলো : *To My Children's Children* (১৯৯০); *Forced to Grow* (১৯৯২), গল্পগ্রন্থগুলো হলো : *Living, Loving and Lying Awake at Night* (১৯৯১); *Push-Push and other stories* (১৯৯৬), উপন্যাসগুলো হলো : *The Best Meal Ever!* (১৯৯৮); *Beauty's Gift* (২০০৮), শিশুতোষগ্রন্থগুলো হলো : *Die heel, héél lekkerste kos!* (২০০৬); *Esona-sona sidlo!* (২০০৬); *The Best Meal Ever*! (২০০৬)। তিনি লিখেছেন প্রথমে ইংরেজিতে পরবর্তীকালে সেগুলো অনূদিত হয়েছে নিজস্ব ঝোসা (Xosa) সহ অন্যান্য ভাষায়।

১৬. 'ওইসব নিয়ে এখন কথা হচ্ছে না' গল্পটি সিন্দিওয়ে ম্যাগোনা রচিত "I'm Not Talking About That, Now" গল্পের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন মুহম্মদ মুহসিন।

১৭. কৃষ্ণাঙ্গ ঔপন্যাসিক, কবি, সমালোচক ও শিক্ষক চিনুয়া আচেবে (Chinua Achebe, 1930–2013)-র জন্ম পূর্ব নাইজেরিয়ার Ogidi-র অন্তর্গত ইগবো শহরে ১৬ নভেম্বর ১৯৩০ সালে। তাঁর মূল নাম Albert Chinụalụmọgụ Achebe। তাঁকে 'আধুনিক আফ্রিকান সাহিত্যের জনক' হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি গল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস *Things Fall Apart* প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। উপন্যাসটিকে বিবেচনা করা হয় আধুনিক আফ্রিকান সাহিত্যের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ হিসেবে। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলো হলো : *No Longer at Ease* (১৯৬০); *Arrow of God* (১৯৬৪); *A Man of the People* (১৯৬৬); *Anthills of the Savannah* (১৯৮৭)। তাঁর ছোটগল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : *Marriage Is A Private Affair* (১৯৫২); *Dead Men's Path* (১৯৫৩); *The Sacrificial Egg and Other Stories* (১৯৫৩); *Civil Peace* (১৯৭১); *Girls at War and Other Stories* (১৯৭৩); *The Voter*, *An Image of Africa: Racism in Conrad's* "Heart of Darkness" তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ। লেখালেখিতে তিনি ইগবো সমাজের বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করেছেন এবং দেখিয়েছেন উপনিবেশকালীন ও উপনিবেশ পরবর্তী ইগবো সমাজে খ্রিষ্টান ধর্মের প্রভাবকে এবং আফ্রিকার নিজস্ব মূল্যবোধের সাথে পশ্চিমা মূল্যবোধের দ্বন্দ্বকে। তাঁর উপস্থাপনরীতি হলো ইগবো সমাজের গল্প বলার মৌখিক রীতি, যার সাথে মিশে থাকে লোকগল্প, প্রবাদ-প্রবচন এবং সহজবোধ্য বিবরণ। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি আফ্রিকান চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে আফ্রিকার নিজস্বরীতিতে আফ্রিকার গল্পগুলো বর্ণনা করেন। তিনি ১৯৯০–২০০৯ কালপর্বে যুক্তরাষ্ট্রের Bard College, David and Marianna Fisher University এবং Brown University-তে অধ্যাপনা করেন। তিনি ২০০৭ সালে Man Booker International Prize লাভ করেন।

১৮. পরিণয়ে নিজস্ব মত গল্পটি চিনুয়া আচেবে রচিত 'Marriage is a Private Affair' গল্পের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন দুলাল আল মনসুর।

সহায়কপঞ্জি

ফখরুল চৌধুরী (২০১১)। *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ*। আগামী, ঢাকা।

বিষ্ণু বসু *সম্পা.* (২০০৫)। *আফ্রিকার সাহিত্য সংকলন*। বৈশাখী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬৭)। *রবীন্দ্র রচনাবলী–বিংশ খণ্ড*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

শামসুজ্জামান খান (২০১১)। *আফ্রিকার কবিতা*। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (২০১২)। *আফ্রিকার কবিতা*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (২০০২)। *দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাস*। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

Folk-Traditions of Dhaka : Pottery

Shipra Sarkar*

[Abstract : Pottery is one of the ancient folk-trades of Bangladesh. In fact, this trade flourished widely not only in Bangladesh, but in this subcontinent many centuries back. The practice of pottery in Dhaka, the capital of Bangladesh, is highly significant for its trade, cultural and historical importance. Four hundred years old pottery-factory situated at Rayer Bazar in Dhaka is an important phenomenon of the traditional folk-trade of the city. This paper is concerned, almost exclusively with the study of the glorious history of pottery, materials, production methods and the marketization of the Potteries of the city of Dhaka.]

Pottery is one of the ancient folk-trades of Bangladesh. Since many centuries back pottery flourished widely in this region. Not only in Bangladesh, but also all over India this trade was seen to develop since the ancient times. Scholars think pottery developed on a large area of land extending from the eastern region to Harappa and Mohenjodaro in the subcontinent about five thousand years ago (Gosh, 2004 : 61). Various decorated earthenware, pots, dolls, pitchers, lids, glasses, cups, bowls, plates, spoons, etc., have been found in different areas of India. These things bear witness to the skill of the then potters. It specifically flourished on the banks of Saraswati/Indus river in about 5,500–4,800 B.C.[1] But some scholars think the nude figure of Venus made by clay in Czech Republic dates back 29000–25000 B.C.[2]

The designs and decorations of the potteries of Harappa and Mohenjodaro in the Indus Civilization bear witness to dexterous craftsmanship. During the Vedic era, the potters also decorated earthenware in many ways. Besides, decorated potteries of the times of Morya, Kushan and Gupta are also discovered. It is therefore anticipated that the potters of India have had the same tradition of decorating clay-pots for centuries. Those clay-pots present before us the life-style and various social aspects of the time. The trend of pottery, which was introduced before the birth of Christ, has still been prevailing in this area. In the subcontinent, particularly in different places of Bangladesh, there are small and big centers of pottery. Different earthenwares are is produced in these centers.

The potters of Harappa and Mohenjodaro made various kinds of toys. These toys include humans, cows, buffalos, sheep, monkeys, pigs, birds, tigers, marbles, carts, bats etc. The potters of today's Bangladesh have a wonderful resemblance with the tradition that existed a thousand years ago. Since the time of Indus

* Professor, Department of Sociology, Jagannath University.

Civilization till today, these toys have been made in the same manner. Like the artisans of Indus Civilization the potters of our country still make dolls by pressing their fingers. The potters of our country have still borne the age old methods and traditions of art.

It has been found that a kind of terracotta method developed in the valley of Ganges and Yamuna from 300-200BC to 200-300AD (Ghosh, 2004 : 29). Terracotta plaques have been discovered in Mahasthangarh, Mainamati and Paharpur of Bangladesh and in Pokharna, Medinipur, Burdwan, Hoogly and Birbhum of West Bengal in India. These terracotta plaques were used to decorate temples. The use of terracotta plaques in decorating temples is Bengal's own artistic tradition.

People, gods and goddesses and animals were used as common motifs on terracotta plaques of Mahasthangarh, Paharpur and Mainamati. These kinds of plaques were used in decorating temples only. But in the religious institutes of Muslims such as mosques and shrines, pictures of trees and creepers were used. The skill of the potters as well as social life of the time is reflected on these terracotta plaques. These terracotta plaques depict not only the skill of the potters but also the social life of the time. The important motifs of the plaques discovered from Mahasthangarh, Paharpur and Mainamati regions by excavation include many deities from the Indian Purana, various pictures from Buddhism, mothers holding babies in their arms, wives carrying pitchers in their laps, newly wed wives waiting for their husbands, farmers with their ploughs on their shoulders, fishermen with nets in their hands and so on.

A rich trend of pottery thus developed in various regions of Bangladesh during the period of thousand years. The city of Dhaka, as a famous centre, has a glorious history of pottery. A about four hundred year old pottery-factory situated at Rayer Bazar in Dhaka is an important phenomenon of the traditional folk-trade of the city.

Pottery at Rayer Bazar in Dhaka

It has already been mentioned that pottery-factories/workshops flourished at Rayer Bazar in Dhaka about four hundred years ago. Once the potter-hamlet of Rayer Bazar was extended to a large area. This potter-area covered one mile in length and half a mile in width ranging from Tenarir Morh to Satmasjid. During the period of development of the pottery-region, nearly 800 families of pottery-artisans lived in this area. In a research, it is seen that once the number of artisans of pottery was about fifteen thousand. (Glassie, 1997 : 225)

The pottery of Rayer Bazar has lost its past glory. On a changing situation, pottery has now reached its miserable state. Yet the dedicated community of potters has made this branch of traditional folk-trade survive and thus they have borne the glorious tradition of Dhaka. We have made an effort to know various

aspects of this craft from interviews with artisans of pottery working at Rayer Bazar now. The artisans of pottery with whom we had interviews include Shambhunath Pal, Krishnaballabh Pal, Nibaranchandra Pal, Maranchand Pal, Haripada Pal, Gaurangachandra Pal, Nepalchandra Pal, Mohammad Ali and others. We have presented the following aspects of pottery in the light of information we gathered from the interviews with them. Not only interviews but also our experiences gathered from our participatory observation have worked as a research methodology here.

Methods of Producing Pottery

The methods the potters use to make various earthen goods can be divided into some stages. Those are as follows:

1. Collecting materials;
2. Clay preservation and preparing it for making pots;
3. Giving shape to different things by hand or by the wheel;
4. To dry produced goods in the sun;
5. To dye and decorate the goods made ready; and
6. Giving final shape to the produced goods by burning in fire.

Collecting Materials

A very vital component of pottery is clay. So collecting proper type of clay is the main task of procuring materials of this craft. Generally the potters themselves select a place for collecting clay from. Various types of clay are collected for pottery. Types of clay are as follows :

Clayed soil : The potters of Rayer Bazar make earthen goods generally by clayed soil[3]. It is usually of black or grey colour. This type of soil contains a little sand. It is not available in all types of land. It is found in the land by the river-bank. The layer of clayed soil is usually found by digging four or five feet into the ground. Clayed soil is collected by digging wells up to 10 feet by spades and other digging tools. The potters of Rayer Bazar collect clayed soil from the land adjacent to the banks of the Buriganga and the Dhaleswari. No payment is required to collect the clay except for the labour cost of digging and conveyance.

Sandy soil : The soil containing much sand is called sandy soil. A type of soil which is made up of sandy and clayed soils is loamy soil. The potters of Rayer Bazar use loamy soil to make small pots, kitchenware, tubs for flower-trees and different other pots.

Korha soil : The potters of Dhaka sometimes make goods with *Korha* soil. The colour of this soil is light yellow. The soil lying on the top layer of land is termed

Korha soil. The clay-modelers usually use this soil for giving a cover on the images made with straw.

Red soil : A kind of soil is found on the highland of Bangladesh, which is called red soil. The potters use red soil for dyeing and decorating earthen pots. The artisans of pottery at Rayer Bazar generally collect this soil from the region of Mymensingh.

White soil : Usually the potters of Rayer Bazar do not use white soil. This soil found at Bijoypur of Mymensingh is used in making ceramics. Sometimes the potters use white soil to produce superb quality goods to export to foreign countries.

The names of soil vary from region to region in Bangladesh. For example, the potters of Rayer Bazar call clayed soil 'Bali Mati'. It is called in Faridpur 'Rang Mati', in Jamalpur 'Adal Mati', in Mymensingh 'Athalia Mati' and so on. Similarly, the potters of Rayer Bazar call sandy soil 'Abol Mati'. Sandy soil is known in Faridpur as 'Pakak Mati' and in Tangail 'Chara Mati'. It has been found that these soils also differ in colour and quality in accordance with localities.

It is essential to mention here that after the collection of soil from the ground, the more days it can be kept piled, the more its quality can be increased. If the soil collected can be kept piled for more days, it becomes easy to make it as smooth and appropriate for modeling pots and to make them as more durable. The potters of Rayer Bazar keep soil piled up to two months to one year[4].

Pottery requires more components besides clay. Of those components, there are sand, bamboo, wood, straw, fuel, lime and paint. Lime is used for decorating earthen pots. Wood, fuel and dry leaves are usually used for making fire. Straw is used to make big images of men or deities. First a structural shape of body is made with straw. Then a coating with clay is given to model the shape of an image. According to modern technology, Plaster of Paris, various kinds of oxide and quality colours are used to model high quality earthen pots. As for the earthen goods the famous potter of Rayer Bazar Maranchand Pal uses these components to export his artifacts to foreign countries.

Preserving Soil and Making it Suitable for Pottery

When the clay is collected from the ground, they have to preserve it and make it suitable for modeling pots. The clay collected is kept in the room or on the yard under a thatched roof. It is because if it is kept in an open place under the sky, its quality may be destroyed either by getting dried in the sun or by being wet in rains. The potters of Rayer Bazar adopt two methods for preserving the clay. A group of potters preserve the clay on the yard of the house or on that of the factory under a thatch. Those who do not have a place under a thatch on their yards keep the clay collected in a hole dug there. The mouth of the hole is

covered with water-hyacinth and a piece of tin. The potters keep a keen eye over it so that the sun or rains cannot spoil the quality of the clay put in the hole.

The potters make the clay suitable in different processes for moulding pots or other goods. The clay-processing of the potters can be divided into five categories as follows :

a. From the preserved soil a required amount of clay is separated and put in a corner of the yard.

b. The clay is cut thinly with a spade. Then it is cut more delicately with an iron rake.

c. After that the clay is kept on a coarse mat with sand thrown on it. It is trampled with a little water sprinkled on it. As a result of trampling, the clay starts to be soft. At this time, stones, gravels, pieces of wood, etc., mingled with it are brought out. The clay gets smooth when it is done seven and eight times.

d. At the fourth stage, the main job for preparing clay to make pots or other goods starts. A required amount of clay is first made round and separated. Then the clay is cut into small and thin pieces with a knife of wood or iron. At this time, the potters remove carefully very small particles of things from the clay with their thumbs massaging on it. An important aspect of this stage is that the work of mixing another soil with the clay is now done. Both kinds of soil are treated in the same ways to make it suitable. This process continues until the clay gets properly soft.

e. At the final stage, a cover is made with this clay on a coarse mat of date leaves. Now this cover is hammered strongly with a wooden hammer. Then the clay gets perfectly prepared for giving shape to a particular pot or other goods.

It is necessary to mention here that it is the female members of the families of potters who do the aforesaid work of processing the clay almost in all factories of Rayer Bazar. It is true not only for Rayer Bazar, but for any other region of Bangladesh as well.

Giving Shape to Earthen Goods either with the Wheels or Manually

For giving shape to earthen goods after processing the clay, the following methods are adopted :

a. After processing the soil, equal amounts of clay for making pots are separated and made round. This method is usually called ‘Buti’.

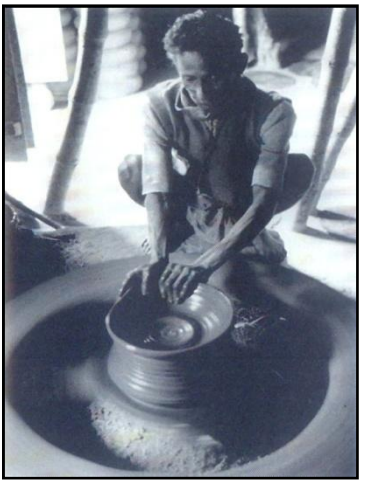
b. Then pots are shaped with the help of wheels. There is another method still prevalent in one or two regions of our country to shape the pot manually. At first, the wheel of the machine is turned round with a

stick to make it move speedily. When the wheel moves quickly, one 'Buti' or a circular piece of clay is kept in the middle of it. At this stage, the potter gives shape to the pot with his or her hands as he or she wishes.

c. After giving shape to a pot, its outside surface is very carefully made smooth. In the same way, the inside of the pot is also smoothed.

d. At the end of shaping the pot, the lower part of the clay-pot is cut off with thread and separated from the wheel.

The skilled potter gives shape to a particular thing in one or two minutes after putting the circular clay on the wheel. Of all these works, it is the most difficult job. There are about twenty-five skilled artisans for this work at Rayer Bazar. It is to be noted that where the female artisans do everything for processing the clay for pottery, the male artisans do the job of modeling the pots or other goods. Big pots, flower tubs, dishes, etc., are modeled on the wheel.



Gaurangachandra Pal is making clay-pot by wheels



Rajeshwari Pal is smoothing the surface of the clay-pots

Besides the wheel, the form is also used to model pots or other things. The female artisans of Rayer Bazar produce several goods on the form. It takes much time to make pots on a form compared to the wheel. The processes adopted to model pots on the form are as follows :

a. A circular 'Buti' is put first on the form. Then it is beaten to be thin with a wooden hammer. This process is called 'to massage,' ('dala deoa').

b. After that the clay is attached carefully to the form with the fingers massaging on it. Thus the portion of the clay assumes the size of the form.

c. Then the form is put in the sun for 10 to 20 minutes.

d. After that the model is separated from the form with a steel or iron chakti (a round and flat thing).
e. Then the outside surface is rubbed with a piece of wet cloth to smooth it. The pot or other goods are again kept in the sun for ten to twenty minutes. After that, the goods are put in a room and covered with gunny. When the pot is covered with gunny, it does not get hard soon.
f. Then, to smooth its inside the excess parts of clay are cut off with a cockle-shell.
g. After that, pots or other goods are kept in the yard with a shed on it. When it is properly dried, it is brought into the room for the next work.
h. Then starts the work of smoothing the pot finally. For that, the potters use a thing made of clay called "Bokka".
i. At the end of smoothing, the pot is again kept in the place on the yard with a thatch on it. When the pot is perfectly dried, it is again brought into the room after 20 to 25 days for the next job.

The carpenters make the wheels or the forms the potters use to give shape to the pot. The potters at Rayer Bazar buy the wheel or the form from the carpenters.

To Dry the Produced Goods in the Sun

The goods modeled on the wheel are kept in the sun to be dried. How many days they will take to be dried depends on their sizes and weight. Comparatively big and heavy goods take more time to be dried. The produced goods are arranged in rows on the yard. At first, all the pots are turned upside down to dry. When the lower parts of the pots are dried well, their front sides are kept facing the sun for drying out. A pot, at this stage, gets dried in 8 to 10 days in summer. In the rainy season, it takes much more time. The potters sometimes use electric fans to dry out the pot when it rains incessantly. When the pots or other goods are dried out white, they are brought into the room. They are then perfectly ready for dyeing.

Dyeing and Decorating Earthen Pots and Other Goods

The potters of Rayer Bazar like those in other regions of Bangladesh also use a special red colour on earthern goods. The usual colour of clay disappears after this colour is used. The potters themselves prepare this colour. For this purpose red clay is collected from hilly regions. The colour is prepared by mixing catechu and washing soda with this red clay in right proportion. In Chittagong areas certain bark is also mixed with this to make the colour lasting.

At first one hundred grams of catechu is mixed with two litres of water and then it is boiled. After that, soda is put into it and then red clay-powder is mixed with it. When the water cools, they are mixed well with hands to turn it into a liquid colour. Sometimes a wooden stick is also used to mix it well. Then this mixture is

put into 10 or 12 litres of water and is again boiled. When it cools, the mixture of colour is kept into separate pots.

The potters dye the pot slowly with a piece of cloth. When the work of dyeing ends, the pot is dried out in the sun. After 20 to 30 minutes it is again brought to the shade, and decorating on it starts. The potters draw various designs on the pots using different colour components. Female potters of the family also take part in decorating designs with the male members. The potters decorate carefully Laksmi's lids, fancy pots, clay-dolls, flower tubs, ash-trays, earthen animals, etc. In most cases, they draw *alpana*, leaves and creepers, fruits and flowers, birds, different motifs of folk-culture, human faces, etc.

Giving Final Shape to the Produced Goods by Burning in Fire

The potters finish their final job of burning in an earthen furnace after their clay-pots and other goods are dried out in the sun. The furnace in which earthenware is burnt is generally called 'Payin' by them. Almost all the potters of Rayer Bazar have their own 'Payin' or furnace. They observe some rituals before burning their clay-goods. At first, incense is fumigated around the furnace. Then water mixed with gold and silver is thrown into the furnace. After that the clay-goods are arranged in rows inside the 'Payin'. In the spaces among the pots arranged, firewood is put. Then everything is covered with a coating of mud. Little holes are made around the coat to let the smoke out.

First, cow-dung, straw and dried leaves are used to make fire. The 'Payin' is thus made hot by continuing this fire for at least two hours. To increase the fire slowly firewood is given into the 'Payin'. When the fire burns well, adding firewood is stopped. It is kept in this state for two days. The earthen pots or goods burnt with the firewood inside the *payin* grow red. When the *payin* becomes normal, the coating of mud is broken away and the pots are carefully taken out. Next the earthen products are used or sold. At present, the produced earthen goods are burnt in 3/4 gas-stoves besides the earthen furnace at Rayer Bazar.

Potteries

Like the potters of Bangladesh at large, the potters of Rayer Bazar mould various clay-goods. In accordance with the age-old traditions, they make household goods, dolls, various birds and animals, fruits, vegetables, fishes, toys, images of deities and so on. On certain orders placed, they also sometimes make terracotta images. The female members of the family usually make dolls, different kinds of birds and animals and toys. A list of the goods the potters of Rayer Bazar make is given below :

a. *Household Utensils*

   Cooking pots, pitchers, jars, bowls, plates, clay-furnces, jugs, glasses, candle-holders, lids, frying pans, flower-vases, ash-trays, clay-banks, etc.

b. *Dolls*

Mother and her child, babies sucking its mother's milk, rural woman carrying pitchers in their arms, the bride farmer, a woman with her wedding dress on, the bride and the bridegroom, kings, queens, etc.

c. *Birds and Animals*

Lions, tigers, bears, elephants, horses, deer, monkeys, oxen, cows, dogs, cats, crocodiles, snakes, peacocks, parrots, ducks, magpie robins, mynas, weaver-birds, cocks, etc.

d. *Fruits*

Mangoes, oranges, jack-fruits, blackberries, pineapples, bananas, papayas, apples, green-coconuts, guavas, etc.

e. *Vegetables*

Tomatoes, lady's fingers, lemons, pumpkins, olives, coconuts, water-melons, green bananas, brinjals, etc.

f. *Fishes*

Ruis, *katlas*, *mrigels*, shrimps, the walking fish, catfish, *puntis* (fresh water tiny-fish), etc.

g. *Toys*

Boats, cars, steamers, launches, aeroplanes, trains, cricket bats, balls, flutes, etc.

h. *Images of Deities*

Durga, Shiva, Manasha, Shitala, Saraswati, Lakshmi, Kartik, Ganesh, Kali, etc.



Clay-pots for making curd



Pitchers made by Nibaranchandra Pal

In addition to the images of deities, the potters of Rayer Bazar also mould the images of nationally and internationally renowned personalities at home and abroad. These images include Rabindranath Tagore, Kazi Nazrul Islam, Sheikh Mujibur Rahman, Lalan Sha, Gautam Buddha, Vibekananda and others. Of the potteries of Rayer Bazar, Lakshmi's lids and fancy pots deserve mention. These two potteries find a nice expression of its dextrous decoration. The Lakshmi's lids are generally made to be used in the worship of Lakshmi. This lid with the image of Lakshmi drawn on it is hung in the houses of Hindu farmers in

Bangladesh. The Lakshmi's lids of Rayer Bazar have a characteristic that only the image of one deity is drawn on them. The image of the goddess, Lakshmi is drawn on the middle of the lid with *alpanas* painted around. Like the Lakshmi's lid the fancy-pots are also decorated with different pictures. Fancy pots generally resemble a standard size curry-pot. People go to houses of their relatives with sweets in this pot on the occasion of a wedding ceremony or in any local function. The fancy pots of Rayer Bazar are primarily painted yellow. Red, green and yellow lines are drawn around the neck of the pot. Sometimes motifs of leaves and creepers, birds, fishes, horses, the bride, etc., are drawn on the pots. People buy these pots on the occasions of Hindu worships, festivals and *Maharram*.



Clay-pots made by Krishnaballav Pal

Marketization of the Potteries of Rayer Bazar

The marketization of potteries at Rayer Bazar is not at all satisfactory like in other regions of Bangladesh. For want of proper marketization this traditional folk-craft is now on the verge of extinction. It is seen that the prices of the same goods differ in many ways as there is no well-controlled marketization for it. The experienced people think the wholesale buyers take this opportunity to exploit the potters. Most of the potters of Rayer Bazar opine that they incur loss as there is no specific price-list and the law of intellectual rights of the potteries.

There are two main impediments for developing a market for the potteries of Rayer Bazar. First, most of the potters have no permanent arrangements for preserving their goods. Second, they lack transportation for carrying goods for sale to the market. It is, in fact, for these two reasons that the prices of

earthenware of Rayer Bazar have gradually come down posing a great threat to the existence of this industry. For want of proper places for preservation the potters cannot mould their products in large quantities. Or they are bound to sell them at a very cheap rate.

The potteries produced at Rayer Bazar are usually sold in two ways. Firstly, the wholesale pottery-traders from all over the country purchased goods from here. Secondly, the government or many export-organizations buy fancy potteries to export them abroad. But every potter cannot avail himself of this opportunity. The exporting authorities buy earthenware only from one or two skilled potters.

Nowadays a favourable situation for buying and selling potteries is prevailing in Dhaka on the occasion of the Bengali New Year celebrations, Ekushe February and *Muharram* or in the *Bhaishakhi* fair. For this reason, most of the potters have said they make more goods before these festivals or occasions. To them, potteries are sold well from September to February. On the other hand, the period between June and August is a dull season for this business. The potters mould their clay-goods according to the festivals or celebrations. For, every festival or celebration has a demand for a particular pottery.

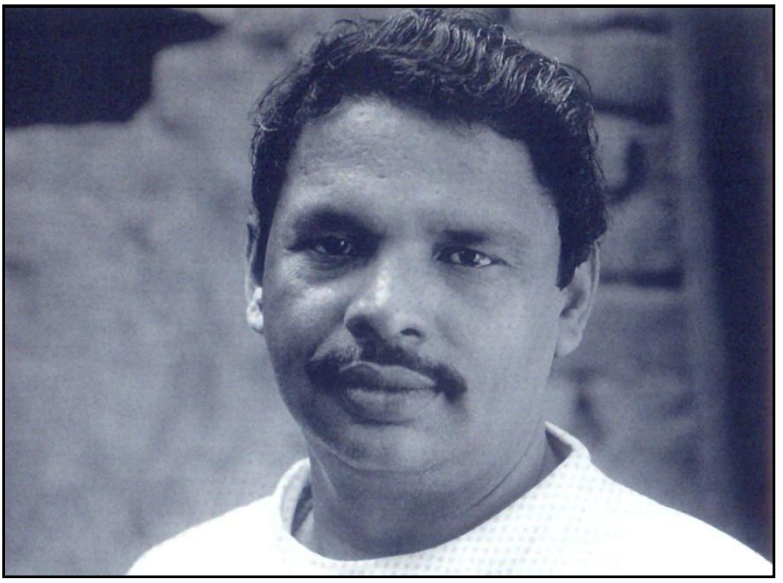
Particulars of Some Potters of Rayer Bazar

Once pottery flourished largely at Rayer Bazar. About two hundred years ago, there were more than fifty factories of pottery here (Glassie, 1977 : 226). Then skilled potters worked here. Due to poor economic condition and the threat of modern technology, the number of skilled potters has come down to a very few. Of the potters of Rayer Bazar, those who have earned fame as skilled potters are Maranchand Pal, Mohammad Ali, Amulyachandra Pal, Subhashchandra Pal, Haripada Pal, Manindra Pal, Santoshchandra Pal, Gobindachandra Pal, Nepalchandra Pal and others. Of them, we shall give accounts of two skilled potters, Maranchand Pal and Mohammad Ali. We believe the accounts of these two skilled artisans will help us know about the pottery of Rayer Bazar.

Maranchand Pal

All concerned with pottery have known the name of Maranchand Pal, one of the skilled potters of Rayer Bazar. He was born at Rayer Bazar on 4 September 1946. His father Shri Gopalhari Pal and mother Surbala PalÍboth were potters. Since his boyhood, he was interested in helping his parents in their works more than study. As a result, he did not progress so much in his formal studies. He studied up to class six. When he was 14, he, of his own accord, enrolled

himself into the then Dhaka Art School to learn ceramics. At the end of his studies, he sat for the Certificate Course Examinations in 1963 and stood first in first class.



Potter Maranchand Pal

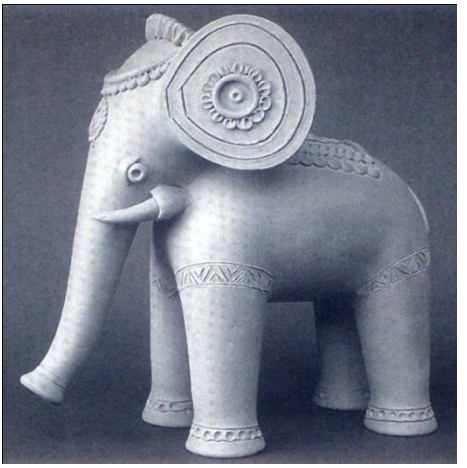
An artisan, Maranchand Pal has added a new dimension to the pottery of Bangladesh. He has superbly made a harmony between the old and the modern methods in his works. He was acquainted with the concept of harmonization between the two methods from his teacher Mir Mostafa Ali. Maranchand Pal has brought about a new era in the pottery of Bangladesh striking a balance between the old and the modern methods. He has already received many awards in recognition of his artistry. He taught ceramics at the Institute of Fine Arts in Dhaka University.

Craftsman Maranchand Pal makes various goods for everyday use with modern materials. He moulds different clay-pots. But his craftsmanship in modeling toys and other earthen articles for decorating houses earned him specialty. A folk trend of pottery finds expression in different dolls and toys moulded by him. He has harmonized the know-how of modern technology in the age-old pottery of Bengal. Maranchand Pal has used wheels to make the dolls and toys more attractive. Though he uses local materials in his factory, he has chosen gas-stoves in place of the old *Payin*. When questioned about the harmonization of the old and the modern methods, he said, “When I intend to mould flower-vases, I think

of sizes or samples of cooking pots, pitchers, pots, casks, little jars, etc. I prepare a model of flower vases from these samples. I have collected dolls like elephants, mother and child dolls, horses, etc., from various regions of Bangladesh. Using these samples I model toys and dolls with modern techniques. Various *alpanas* are used in the houses or on yards in the Lakshmi worship or other festivals of rural Bengal. I use the designs of these goods also on flower tubs, flower vases or on other earthen pots."[5]



Maranchand Pal in his workshop

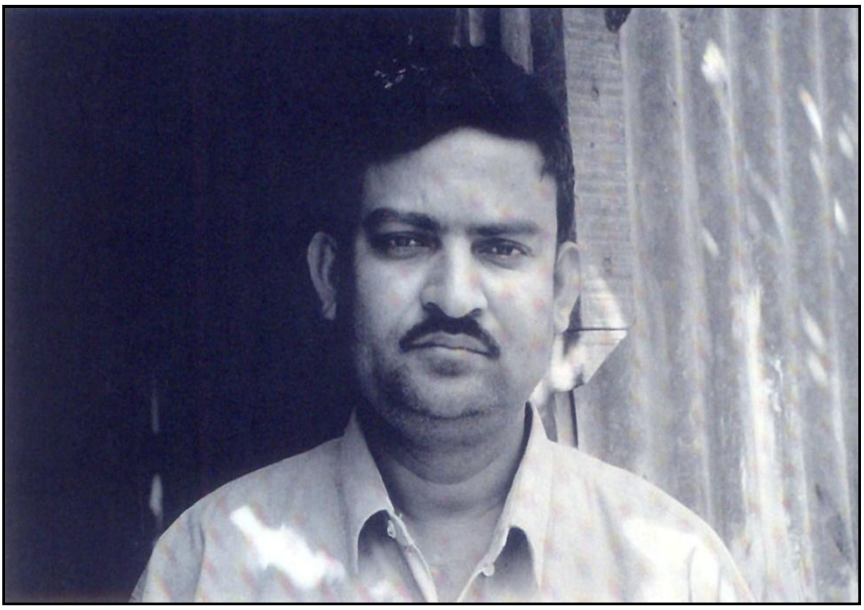


Elephant made by Maranchand Pal

He has grown very skilled in modeling various clay-pots and decorated earthenware. The earthenware he makes includes mother and child dolls, elephants, horses, cycles, cycle-riders, peacocks, candle-holders, elephant candle-holders, Bogra-horses, horses with wheels, tortoises, monkeys, boars, Bankura-horses, designed ash-trays, flower vases, flower tubs and others. He sells these goods to wholesale buyers; sometimes he sells those things to the shops of Karika, Kumudini Trust, etc. The potteries of Maranchand Pal are exported to more than fifty countries of the world including Holland, England, France, Germany, Japan, Australia, China and the United States of America. He always wants to model new things. But it is not always possible for him to make new things as he remains busy with orders placed to him. This is why, the born craftsman Maranchand Pal has much discontentment in him. So he said, "I always want to make new things. But I can do nothing as I remain busy to work for the export. I get money, but I do not have peace in mind, I don't enjoy it."[6] Yet, amidst this discontentment, the contributions of Maranchand Pal to the history of the pottery of Dhaka will be remembered.

Mohammad Ali

Of the potters of Rayer Bazar, Mohammad Ali has earned fame. He was born at Fulbaria in Dhaka on 8 August 1948. It is from his childhood friend Maranchand Pal that he received his first lesson in pottery. He did not have any knowledge in pottery by his paternal profession. Rather he grew interested in this work by seeing earthen work in the pottery factories of Maranchand Pal and one or two other potters and mastered knowledge about different stages of the trade. After he had involved in this profession fully, he would primarily make flower tubs only. He moulds dolls, pots, toys, etc., only in the old methods burning those goods with firewood in the furnace.[7]

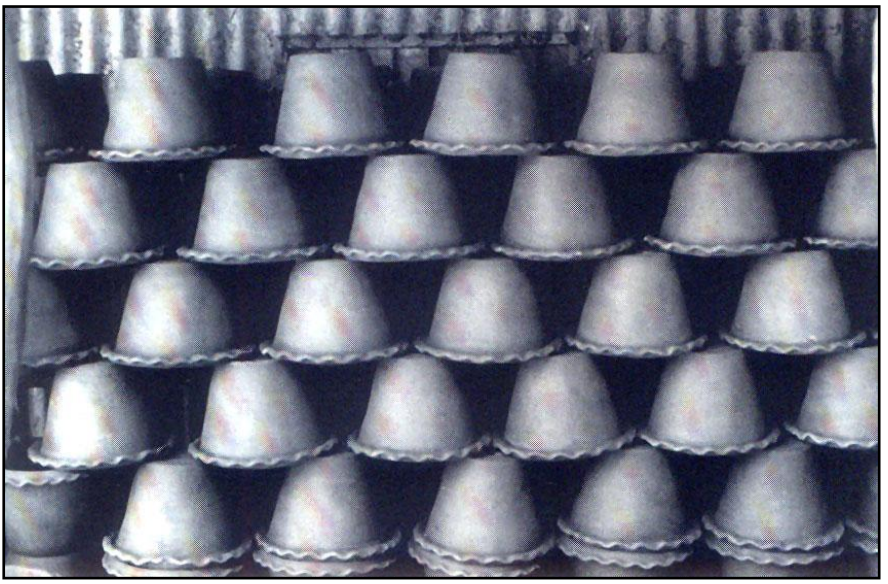


Potter Mohammad Ali

Though he had no formal education, inspired by Maranchand Pal, he started to study ceramics in secret. Besides, to observe and learn the work practically, he has gone to the industries of Munnu Ceramic, National Ceramic, P.C.I., etc., and gathered practical experience on it. But he could not keep pace with it long because it needs much money. Rather he began modeling earthenware using local clay with the help of ceramic technology. Thus he introduced a new trend in pottery.

Mohammad Ali makes flower vases, ash-trays and other earthenware very skillfully. The potteries he has produced are flower tubs, ash-trays, flower vases, toy-elephants, horses, ducks, soup-bowls, salt-pots, sugar-pots, jugs, foot-brashes, etc. The potteries moulded by Mohammad Ali are also exported abroad. He usually

models earthenware with a kind of white clay called ‘Mymensingh Clay’. Like Maranchand, he also burns his potteries in a gas-stove. This role of Mohammad Ali for developing pottery at Rayer Bazar deserves special mention.



Flower-vases made by Mohammad Ali

Conclusion

Pottery is a remarkable part of the traditions and glories of our national identity. With the amazing rise of technology, pottery loses its past glory. In fact, the glorious tradition of pottery is now about to face extinction. As a result, thousands of workers and craftsmen who had depended on this trade directly and indirectly, are now living an uncertain life. They have no pecuniary security. Many of them have been compelled to leave this profession for want of money. A dearth of government and social patronage is being widely seen in this sector. For lack of proper care, this traditional trade of Bangladesh is now on the verge of extinction. Though BSIC assists it a bit, that is insufficient compared to its requirement. As a result, many of them have moved to other jobs or taken up another profession by giving up the glorious profession of their ancestors.

Pottery is facing a great challenge today with the rise of modern industries. Aluminum, melamine and plastic have now occupied the place of the potteries. For many reasons, pottery cannot survive any longer in competition with the modern industrial technologies.

We all concerned shall have to play an initiative role to protect this ancient trade of Bangladesh from tremendous ruin. Specially the government shall have to come forward for this. It is essential to make arrangements to distribute the raw

materials, fuel or firewood, dyeing materials, etc. of pottery at a low price. It is necessary to sanction loans on easy terms to the potter community. BSIC and other organizations can play a positive part for developing a market for earthenware. All associated with the with the heritage of pottery think. if these initiatives are taken, it would be possible to protect this age-old folk-trade.

Notes

1. See, "No. 359 : The Dolni Vestonice Ceramics". Uh.edu. 1989–11. 1989–11–24. Also See, Proceedings, American Philosophical Society (Vol. 85, 1942). ISBN 1-4223-7221-9.
2. Wu, X; Zhang, C; Goldberg, P; Cohen, D. et al. (June 29, 2012).
3. Information received from the Interviews with Maranchand Pal and Subhashchandra Pal. Interviews taken on 25.07.1999 and 26.07.1999. "Early Pottery at 20,000 years ago in xianrengdong Cove, China. Science, 336 96089); 1696–700.
4. Ibid
5. Information received from the Interview with Maranchand Pal. The Interview taken on 28.07.1999 (Interview with Maranchand Pal, 1999).
6. Ibid
7. Information received from the Interview with Mohammad Ali. The Interview taken on 30.07.1999 (Interview with Mohammad Ali, 1999).

References

Henry Glassie (1997). *Art and Life in Bangladesh*. Indiana University Press, Indiana.

M.A. Kuddus (1982). *Mrittikbijnan Parichiti*. Bangla Academy, Dhaka.

Md. Rafiqul Alam (2001). "Mritshilpa O Bangladesh". *Shilpakala*, Akabinsha Barsha : Pratham Shangkhya. Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka.

Mohammad Shahjalal (1985). *Bangladesher Mritshilpa*. Bangla Academy, Dhaka.

Mr. Abdullah Al Mamun (2007). "Oitihyabahi Lokaj Mritshilpa O Shilpisamaj : Matir Bantna". *Dhaka Bishwabidyalay Patrika*, Issue No. 87, February 2007. Dhaka University, Dhaka.

N.C. Brady (1984). *The Nature and Properties of Soils*. OPI, New York.

Pradyot Ghosh (2004). *Banglar Lokashilpa*. Pustak Bipani, Calcutta.

Tofael Ahmad (1999). *Loka Oitihyer Dash-Diganta*. Bangla Academy, Dhaka.

Some aspects of problems and prospects of Tourism Sector in Bangladesh : A critical review of relevant studies.

Ayrin Chowdhury*

[Abstract : Tourism industry in Bangladesh has bright prospect due to heavy demand and expectations of foreign tourist and our local people because of our cultural heritage located in Cox's Bazar, Kuakata, Sundarbans areas, Saintmartin's Island, Bandarban, Rangamati, Khagrachari and Sylhet areas. We have constraints in providing security measures, accommodation facilities protection of the interesting spots and providing satisfaction for the tourists. We hope that with the completion of seven tourist development areas their satisfaction will be given through govt. initiatives in cooperation with emerging entrepreneurs.]

Introduction

Tourism industry in Bangladesh has an immense prospect due to our excellent Tourist centers by the side of the Bay of Bengal located at the Cox'sBazar, Kuakata, Sundarbans areas, Saintmartin, Bandarban, Rangamati, Khagrachari and Sylhet areas etc. We know that foreign tourists enjoy our different tourist centers in a very nice way and their perceptions towards the magnificent tourist center in Bangladesh are very satisfactory. We have increasing number of tourists, good earnings, good attractions, nice image in this vital sector. There is also heavy potentiality of this emerging sector in the eyes of global demand.

The objective of the study is to find out the problems and prospects of this vital sector. The study is based mainly on secondary data collected through intensive library work.

Need for the study

We have nice natural world heritage centers which need regular maintenance and protection. There might be increasing revenues from the preservation and conservation of our cultural heritage through long term strategic plans.

We need more attractions for our local and foreign tourists through ensuring security measures and providing incentives for their day to day attractions. This study will be beneficial to the policy marks and other stakeholders to arrive at concluding remarks.

* Lecturer, Department of Tourism and Hospitality Management, University of Rajshahi.

Observations in related research studies

We know that various studies have been done on our Tourism sector, related papers are reviewed as follows : Hossain (2007 : 69-85) made a study on "Domestic Tourists Attitude Towards the Tourism destination and Retention in Bangladesh". The major object of the study is to focus the Local tourist attitudes towards their destination and retention in Bangladesh, Three tourism destinations are studied narrating 20 indicators. Findings of the study are that tourists have the highest attraction for Cox's Bazar area. Cost in destination, Extent of Hospitality of local community, opportunity for adventure, availability of transports, and historical impact are the major attributes drawing the attention of the sample tourists. We need strategic plans for the sustainable development of our tourist centers through initiative of our government.

Harun and Himel (2016 : 115-122) studied on "Tourism Destination Branding and 7 Ps : A Case on Bangladesh". Objectives of the study are to measure the contribution of the 7 Ps in tourism industry of Bangladesh and to utilise the same for wide branding of the tourist destinations. They interviewed 3 tourists groups of 6 tourist sites of Bangladesh 130 respondents were there . Findings are that tourism marketers follow seven 7Ps like product, place, price, promotion, people, physical evidence, perceived image and process for increasing the awareness for destination, image of the destination as to develop the brand equality among the interested tourists so that their attractions become more. Poor entertainment facilities, lack of efficient service providers, lack of consistency in the service, reliable information for the centers, few pages in face book of Bangladesh etc, are the major constraints. Tourism Board may have the responsibility for the development of the vital sector.

Rahman (2017 : 97-115) authored an article on "Unique Selling proposition : An attempt to set Bangladesh's Tourism apart from Balancing diversity and Ambiguity". He found that in spite of having unparalleled potential, tourists are not confident of their better services at the centers. We need the wide use of USP approach for branding the unusual situation in Bangladesh and controlling the rough image in the minds of the tourists.

Tuhin et al., (2014 : 29-46) had a study on "Tourists Attitude towards Archaeological Tourism site of Bangladesh : A Study on Mainamoti Boudhavihar Comilla". The object of the study is to assess the tourists' attitude for the Mainamati Boudhavihar as an archaeological place of tourists' interest. Secondary and primary data are used. They observed that archaeological history of Mainamoti is yet to be traced out. Facilities made there are not sufficient rather unplanned and inconvenient. We need creation of better services for the tourists in these places though using marketing strategies for the satisfaction of the local and foreign tourists.

Lincoln (2008) wrote an article on "Tourism Industry in Bangladesh : A Tremendous Potential for Foreign Currency". He analyzed the various tourism products and services available in Bangladesh. He found that our tourism industry has bright prospect. Our tourism season is 6 months as against 3 months in Europe and USA. We have also healthy weather, largest sea beach in Cox's Bazar and Kuakata. There is easy journey opportunity from Cox's Bazar, Saintmartin's Island, Rangamati, Khangachari and Bandarban.

Major difficulties are shortage of international standard Hotel or restaurant. Dhaka to Chittagong communication is difficult, security in Sea beach is also questionable.

Islam (2008 : 69) had a study on "The significance of Tourism Products in Bangladesh". The aim of the paper was to analyse the various impacts of tourism products on the economic development of Bangladesh. The study is based on both primary and secondary data. He narrated that quality of hotels product and services has negative impact on the perception of tourists.

Prices and charges are reasonable and it shows positive impact. Cultural background history of our tourist's products are really very much prospective, sports tourism products are of below standard.

He suggested for raising tourists products, creating tourists interest, security and other safety measures.

Kamal (2008 : 83-90) developed an article on "Economic Impact of Tourism and Globalization in Bangladesh". He found that tourism growth has positive impact on our economic development in the context of global challenges. He found that the combined effects of the growth of foreign tourism and globalization are very much contributory. Our trade balance and govt. accounts are in better position due to increasing revenue from this vital sector.

Sarkar et al., (2008 : 105-110) had an article on "Sustainable development of Eco-Tourism in the southern part of Bangladesh". They found that tourism has immense social, economic, environmental cultural benefits. If also helps in poverty alleviation programs through creating employment opportunity for the local poor.

They suggested for increasing awareness for eco-tourism, conservation of tourism centers, further research activities, security measures, more hotels and restaurants and creating satisfactory image of our available tourism centers.

Conclusion

We know that in Bangladesh Govt. motivates the private sector to participate in investment in Tourism sector. That will generate employment opportunity and

raising income of the stakeholders. During 2017, following seven important projects are approved for rapid implementation through public private partnership collaboration in this vital sector.

Integrated Tourism and entertainment village at Cox'sBazar,Five star hotel Chittagong, International standard tourism complex, Cox'sBazar,Sabrang exclusive tourist zone, Star hotel at Sylhet, Star hotel at Khulna & Star hotel at Mongla etc.

We need active cooperation of our young entrepreneurs to cooperate with govt. initiatives for the easy implementation of the projects and fulfill the desires of our tourists as well as other stakeholders in the face global challenges for the achievement of sustainable development goals of our Bangladesh.

References

M. A. Harun and M. J. A. Himel (2016). "Tourism Destination Branding and 7 Ps : A Case on Bangladesh." *Jahangir Nagar Journal of Business studies*, vol- 6, No-1.

M. A. Kamal. "Economic Impact of Tourism and Globalization in Bangladesh". *Journal of IBAIS University*, Vol-1, No-1.

M. E. Hossain (2007). "Domestic Tourists Attitude Towards the Tourism Destination and Retention in Bangladesh." *Journal of Business Research*, Dept of B. Admin., JNU, June 2007, Vol-9.

M. Sarkar, et al., (2008). "Sustainable Development of Eco-Tourism in the Southern Part of Bangladesh", *Journal of IBAIS University*, Vol-1, No-1.

M. Z. Rahman (2017). "Unique Selling proposition : An Attempt to set Bangladesh's Tourism apart from Balancing diversity and Ambiguity." *Dhaka University Journal of Business studies*, Vol- XXXVIII, No. 1.

M.K.W. Tuhin, et al., (2014)."Tourists Attitude towards Archaelogical Tourism Site of Bangladesh : A Study on Mainamoti Boudhavihar Comilla". *Jahangir Nagar Journal of Business studies*, Vol- 4, No-1.

Ministry of Finance (2017). "Bangladesh Economic Survey 2017", Government of Bangladesh.

N. Islam (2008). "The Significance of Tourism Products in Bangladesh". *Journal of IBAIS University*, Vol-1, No-1.

Planning Commission (2018). "The Sixth & Seventh Five year Plans", Govt. of Bangladesh.

Z. Lincoln (2008). "Tourism Industry in Bangladesh : A Tremendous Potential for Foreign Currency." *Journal of IBAIS University*, Vol-1, No-1.

Factors behind EFL Learners' Low Proficiency Level : Tertiary-level EFL Learners' Perceptions

Muslima Jannat Mou*

[Abstract : Students' low proficiency in tertiary level is a matter of concern. This situation is the result of incomplete learning during primary, secondary, and higher secondary level. The purpose of this study is to find out the reasons behind their low proficiency level from the perceptions of those students who could not develop their English language learning as expected from them. The participants selected for the research were 10 students who are extremely weak at English and are at present studying at University level. Data were collected from individual and focus group interviews. This study has brought this fact in light that teachers non-cooperative attitude has caused these limitations. This study can at least change the perspectives, attitudes and mind set-up of those teachers who somehow do not co-operate with shy, introvert and weak students. This paper does not only focus to find out the reasons of students' low proficiency level but also how counseling can bring students' thoughts outside of their mind. Future study can be conducted by giving suggestions to students on how to overcome several challenges and make improvement in learning English.]

[Keywords : Proficiency level, weak students, challenges, suggestions]

Introduction

Students' low proficiency level causes difficulties for teachers who teach at university. Teachers teaching at university expect that at this level students will come up with their creative idea. They will represent something new , something innovative . But the real scenario is not so welcoming to fulfill teachers expectations. In a classroom where the number of students is 40, at least 5 to 7 students have low proficiency in English Language. At this point low proficiency level means confusion about easy spelling, sentence making, making of frequent mistakes, poor development of ideas and so on. Students' low proficiency level is not limited only for one skill but this condition is found in all four language skills, such as reading, writing, speaking and listening.

There is a gap between participants' existing level and expected level of proficiency in English language. It is expected from them that they will be able to understand other speaker's messages, communicate effectively with others, read comprehensibly, use all reading strategies, write something properly avoiding grammatical problems and other confusions while making sentences. But participants cannot understand the meaning of messages by listening once, find

* Lecturer, Department of Rabindra Studies, Rabindra University, Bangladesh.

exact words and make sentences while speaking, use different reading strategies, write something appropriately.

Nature of students differ from one another. It is a very common issue that in one classroom there are good students, average students and also weak students. Each student has their own way of learning. Some students are extrovert, some are introvert. Some student are industrious, some are lazy. A teacher has the responsibility to make students improve their level of learning. In this condition, sometimes only teaching itself can not help to improve the proficiency level of weak students. Counseling can play significant role in bringing motivation and confidence of the students.

This study aims to answer the following research questions

1. Do the students feel that they are responsible for their low proficiency level in English?
2. What are the reasons behind the tertiary level students' low proficiency level?
3. Which areas do they find difficult in terms of applying English Language?

Literature Review

Academic performances in terms of examinations and classroom learning tasks help to distinguish low English proficiency learners according to Hsu & Sheu (2008). Sijali K. K. (2016) states, "English language proficiency (ELP) refers to the learners' command over English language to use it in the variety of purposes." Due to student's low proficiency level in English language, students cannot use language in variety of purposes. They face difficulties in listening, speaking, reading, and writing. There is also a relation between classroom instruction and students' proficiency level.

Low proficiency in listening and speaking skill

Eckard and Kearny (1981), Florez (1999), Howarth (2001 : 39-44), and Abd El Fattah Torky (2006) have agreed at this point that speaking is not a one way process , it is a two way process which includes a real exchange of opinions, emotions, information. Speaking and listening are linked with one another. It is commonly said that a good listener is a good speaker. According to Doff (1998), without developing listening ability, it is impossible for learners to bring improvement in their speaking ability.

Students' low proficiency level mean their weakness to decode meaning from the person standing in front of him or her, to find the right word to express their thoughts, lack of confidence, lack of enriched vocabulary, fear of being embarrassed in front of classmates while trying to speak in classroom, lack of not

developing thoughts process in English, lack of proper environment and so on. Vocabulary acquisition plays a central role in learning a second language (Sökmen, 1997 : 237-257). Tendency of using mother tongue also inhibits the learning badly. According to Tuan & Mai (2015 : 8-23), learners use mother tongue in speaking class because they find it easy to use.

Speaking is the primary way of communication. Above mentioned limitations play vital role to make students think twice whether they will try to speak or not. At this point students choose to be silent. There are several variables that affect students' ability to practice speaking smoothly. According to Krashen (1982), affective variables like anxiety, motivation, self-confidence influence the acquisition of second language. Enriched vocabulary increases confidence of the learners and makes them feel comfortable while speaking. Sharma (2010) has given emphasis on teaching active vocabulary because it makes everyday communication easy.

Low proficiency level in speaking is found for almost 80% students of rural area. There are lots of students who have good expertise in reading and writing but are not good at speaking. This scenario is found both in rural and urban area. Shyness, fear of comments, fear of taunts inhibit learners to flourish properly.

Low proficiency in reading and writing skill

These two skills are also related with one another. Reading enriches ideas, comprehension level and contributes in developing a good piece of writing. Reading ability does not include only the ability to read but it includes the ability to use different reading strategies to comprehend a specific passage or topic. Only reading without decoding meaning and understanding will not help. There are issues like extensive reading and intensive reading. Spelling corrections while writing demands intensive reading habit. In terms of writing, students face problems like not getting enough ideas to develop a good piece of writing, not able to make sentences, not able to translate those sentences quickly that he or she thinks in their mother tongue, spelling problems, For example : 'professor or profesor' 'village or villeage' and so on. Minimum required vocabulary knowledge is a must to write at least an average piece of writing. Nina MK opines, æ Once you are sure that your students are ready for some independent work and that they have the minimum required vocabulary, allot writing tasks."

There are lots of words that they feel confusing to remember the spelling. This problem is not created within only one day, one week or one month. It has become the habits of students not to read something carefully. Weak students have problems with adopting strategies also. For example, there are students who

spends more than enough time on a topic but due to lack of strategic approach all theirs efforts do not bring something good for them. Hsu and Sheu (2008) found that good learners lack proper learning strategies, proper learning behavior, aptitude in comparison to good learners. Weak learners also differ from good learners in terms of their beliefs.

Writing is related with creativity. One can write well means one can think well. If one always reads and does not use the information available from reading to make analogy and to come up with something similar or close but different idea then it is not going to help that particular student at all.

Relation between proficiency level and classroom instruction

It can be debated whether using English language as medium of instruction will accelerate the learning process or not. Only using English or using students' mother tongue will not be helpful to develop students proficiency in English. There should have balance in using both English and mother tongue. According to Keomany (2006) one of the important reasons of students' low achievement is, using English as medium of instruction in English class.

Methodology

Participants

For this study, ten students have been considered as sample of this study who are very weak in English and have low proficiency level. The method that had been followed to select those students was to give 100 students a topic to write a paragraph. They had written and after that all those scripts were checked to select the appropriate sample for this study. Participants whom the researcher has got, are from outside of Dhaka. Some of them live in rural areas.

Data collection process

Qualitative research method is used in this research. Individual interview and focus group discussions were carried out in order to find out the answers of few questions. Questionnaire is also prepared but only to get the demographic information of those participants. Interviews were recorded. Questions asked by the researcher were in Bengali, mother tongue of those participants so that they could feel comfortable to share their thoughts clearly. Questions asked through questionnaire were close ended and responses were predefined.

Data Analysis Process

Responses got from the questionnaire and focus group interviews are analyzed and presented as answer of the selected research questions.. Interview, though

followed by asking few questions, was an in-depth discussion about the participants' thoughts, feelings, attitudes towards learning English language. Recorded responses and discussion were analyzed according to the themes, presented differently in this paper.

Findings and Discussion

Participants' age varies from 17 to 24 years. They all are from rural areas. They are aware of their weaknesses in using English language both inside and outside of their classroom. Their family income also differs from one another. These facts contribute on learners' proficiency level.

1. **Do students having low proficiency level feel that they are responsible for their existing level of English language learning?**

Students believe that they are responsible for their low proficiency level but they claim that they are responsible partially not totally. They agree at this point that, there are several other issues that has affected their learning.

2. **What are the reasons behind the tertiary level students low proficiency level?**

According to students, main reasons are lack of teacher's co-operative attitudes, lack of family members attention, lack of alternative options, lack of opportunities to develop, lack of other assistances. It is accepted by all that Bangladeshi classrooms are mostly conducted using teacher-centered not student-centered instructions. Though this situation is changing day by day but the change is not rapid. This issue of being cooperative comes when weak students do not get opportunities to be connected with their teachers directly. Teachers are busy with their own issues. They are not interested to give extra time out of the class and to listen problems of students individually.

They do not get proper feedback. Learning a language, without that language community and proper environment where that particular language can be practiced, is difficult. Family members also play important role in the development of the foundation of each student. Educational background, income of family, family environment all these affect learners a lot. For example, one of the participants said that his school teacher was not co-operative enough. So, his family appointed a private tutor. But, that tutor was not careful to student's study but did other works while teaching the students at home. He always spoke over phone for hours. That student informed to his parents. But parents' opinions regarding this issue were unexpected. They thought this tutor is giving more time to their child and the child is not attentive, that's why he is complaining. They thought he is a good teacher as he

is spending more time. They started misunderstanding their child and trusting that tutor blindly. Being surprised with this incident, researcher asked him about their parents educational back ground. They replied their parents were not so educated. Another important thing was noticed that whether they had any elder brother or sister, or not. Two of them said that they had elder brother and sister but they did not give attention to them. Where family should be ultimate educator, these students have not got any logical support from them such as students who are very weak and need extra assistance and care out of the classroom, do not get that sufficiently.

Family environment should also be considered. If a student luckily get a student friendly environment from their family then it is a blessing for them. They will get all the opportunities to flourish. But if the environment is not friendly, means there is no environment to study, there is always chaos and their parents are always fighting, then this environment will play negative role to build a student for future.

Family income also influences the development of students' proficiency level. Due to a small amount of family income parents cannot afford to appoint a private tutor for their children. Family tutor provides extra assistance needed for particular student who is not capable to solve his or her problems alone. If weak student does not get proper assistance at the right time they start to fear and lose confidence and ultimately they lose their interest of reading and learning.

There are also lack of alternative options. It means that the students have no alternative option to choose but to accept the existing system. Suppose a student is brought up in a rural area, for them it is tough getting friendly environment. If she or he wants a school where there will be extra-care, fun, study, all that we find in the kindergarten schools from urban areas, will not be found there. In remote areas, only two or three schools are found and environment of these schools are more or less same. There is nothing different or special. So, students who can be shifted to better places can not be shifted due to lack of alternative options.

3. Which areas do they find difficult in terms of applying English Language?

These participants are easy with reading skill but they find difficulty in writing, listening and speaking. Lack of listening practice and speaking from the very beginning of their study is the main reason. Students have not got instructions in English in their English language classroom also. So, they feel hesitated and they are shy to speak in English. In their classroom, equipments for practicing listening were not available. This is a case for almost all the schools situated in rural areas. Schools where these facilities were available, these students could

not afford to go there. Every English classes they have got were conducted in Bangla. So, it is difficult for them to cope up with a class conducted in English. They are slow to deduct the meaning of every sentences. Condition of writing skill is really poor. Students frequently make spelling mistakes like 'negetive'instead of 'negative', 'socity' instead of 'society', 'carrier' instead of 'career' etc. They are also weak in word meaning. So many spelling mistakes are found within their writings. What they do actually, they forget the spelling and they try to pronounce that particular word and following the pronunciation they try to arrange the letters of a word like 'negetive' (ˈ/negətɪv/). They can make sentences in Bangla about a topic but they can not convert the sentences in English. Even they forget the known things while writing and end up with making mistakes.

In this study, student has also been found who is very weak but he does not care. He does not want to remove his weaknesses. He does not care about grades, he thinks whatever he is afraid of is not necessary to learn. This is really shocking for a teacher. A teacher can remove all those fear from that student but how much it is feasible for a teacher to counsel him for hours and hours to remove a deep rooted fear from a student. This student has expressed this but there are other students who have same fear but have not expressed as they feel they will be embarrassed before others.

Conclusion

Limitations in tertiary level students mean there were limitation in primary level, high school level and also in intermediate level. All these problems can not be sorted in one day but it is needed to go for long term planning. It is necessary to find out the roots of these problem. Root of problem for every student is different because each student has his or her own specific problems. It can not be expected that within night all parents will be educated and take proper care of their children. But some suggestions can be made like doing workshop or seminar in schools to make parents aware about making right decisions from their part. Counseling opportunities should be mandatory for all educational institution. Each student is special but for a single teacher it is not possible to reach every student personally. But family members can reach to every child and bring their problems in front of teachers, institution. Then teacher and institution can take necessary steps to bring improvement of those students. When members of a group are increased in number, it becomes difficult to control the group by the group commander only. Then we decide to make several sub-groups. Naturally, there are sub-groups of students. Only teacher can not take care of all the students. But family members can take care of their two or three children and provide reports to the teacher. Then it is possible to bring change in the existing system.

References

Doff (1998). *Teach English : A Training Course for Teacher*. Cambridge University Pres.

J. A. Sökmen (1997). 'Current trends in teaching second language vocabulary.' N. Schmitt & M. McCarthy (Eds.), Vocabulary acquisition and pedagogy. Cambridge University Press, Cambridge.

K.K. Sijali (2016). 'English language proficiency level of Higher Secondary level students in Nepal.' *Journal of Advanced Academic Research* (JAAR), Vol. 3. No. I.

L. Hsu & C. M. Sheu (2008). 'A Study of Low English Proficiency Students' Attitude toward Online Learning.' *Electric Journal of Foreign Language Teaching*, 5(2), 240264. Retrieved from http://eflt.nus.edu.sg/v5n22008/hsu.pdf?origin= publication_detail.

M. A. Florez (1999). 'Improving Adult English Language Learners' Speaking Skills'. *ERIC Digest*. (ERIC Document Reproduction Service No. ED : 435204)

N. H. Tuan & T. N. Mai (2015). *Factors Affecting Students' Speaking Performance at LE Thanh Hien High School*. Asian Journal of Educational Research, 3(2).

P. Howarth, (2001). *Process Speaking :* Preparing to Repeat Yourself. MET, 10(1).

R. Eckard & M. Kearny (1981). *Teaching Conversational Skills in ESL*. Center of Applied Linguistics, Washington.

S. Abd El Fattah Torky (2006). *The Effectiveness of a Task- Based Instruction Program in Developing the English Language Speaking Skills of Secondary Stage Students.* Ph.D. Dissertation. Curricula and Methods of Teaching Department, Women's College, Ain Shams University, Cairo.

S. D. Krashen (1982). *Principles and Practice in Second Language Acquisition*. Pergamon Press, New York.

T. Keomany (2006). *Consensus building for curriculum improvement based on evaluation of student achievement in the Department of English*. Faculty of Letters, National University of Laos. Unpublished master thesis : the Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University, Hiroshima, Japan.

U. N. Sharma (2010). *A Course in ELT Methods*. Highland Publication Pvt. Ltd., Kathmandu.

https://www.teachingenglish.org.uk/blogs/ninamk/low-level-students

Questionnaire

1. Age : a) 17-20 b) 21-24 c) 25-30
2. Name of school (primary level) :
3. Name of school (secondary level) :
4. Name of college :
5. Family income : a) 5000–15000 b) 16000–25000
   c) 26000–40000 d) family income $\geq$ 40000

6. English language proficiency level : a) excellent b) average c)low

Questions asked while taking interview and doing a group discussion :

a) Do you feel that you are responsible for your existing level of English language learning?
b) What are the reasons do you think behind your low proficiency level?
c) How many members are there in your family?
d) Tell me about the educational background of your family.
e) Tell me about your family environment. Is the environment friendly or not?
f) Did your teacher co-operate with you when you were in your primary level, secondary and higher secondary level?
g) Is there any opportunity in your school or college to counsel students individually?
h) Is there any elder sibling of you in your family? Do they help you in your education?
i) How is your relation with your parents?
j) Did you have any private tutor to teach you?
k) Did your teacher use English language in classroom to instruct you?
l) Have your parents ever attended any kind of meeting or workshop in your school?
m) Which areas do you find difficult in terms of applying English Language?

The Present Scenario of Agro-Forestry Practices and its Conservation in Jashore District of Bangladesh

Sabiha Sarwar*

[Abstract : The study was conducted to explore the present scenario of agro-forestry practices as well as its conservation in Jashore district of Bangladesh. We surveyed 60 farmers of two sub-districts named Chowgacha and Manirampur Upazilla under Jashore district in the North-West and South-West region of Bangladesh through using a questionnaire during the period of June to July 2018. Data were collected by using a structured interview schedule. Comparative study was done between agro-forestry and non-agro-forestry system village. Majority of the people were 30% directly involved in yard stead cultivation in Chowgacha Upazilla. But in Manirampur Upazilla, they were almost 25% involved in farmland activities. There was a significant difference between annual incomes between two Upazilla. Findings from the study revealed that agro-forestry system practiced in these Upazilla net income analyses are more profitable than non-agro-forestry village. The comparative analysis revealed that socio-economic condition is better than that of Non-Agro-forestry (NAF) or monoculture farmers. Compare to non-agro-forestry villages, income from sale of livestock, fruits, milk and milk products was higher in agro-forestry villages. It is high time to integrate agro-forestry into existing farming system which will be the strongest driver to meet the food sufficiency of rural resident for longer months and ensure food security sustainably in the study area. Furthermore, agro-forestry system should be properly practiced to maintain an environmental friendly solution.]

[Keywords : Agro-forestry, Cultivation status, Cropland, Livelihood condition, Socio-economic development.]

Introduction

Bangladesh is the 12th densely populated country in the world with population density of 1,115.62 people per square Kilometer (BBS, 2019). About 80% of the total population lives in the rural areas whose livelihood are centered on agriculture and related activities. There are 64 Districts in Bangladesh. Jashore is one of them. Geographically it is in the South-Western zone of Bangladesh. It is located at 88º40′ to 89º50′ East and 22º47′ to 23º47′ North. It is bounded by Jhenaidaha and Magura Districts on the North, Satkhira and Khulna Districts on the South, Narail and Khulna District on the East. Jashore District encompasses 2606.98 km². Jashore consists of the eight Upazilla. These are the Abhaynagar, Bagherpara, Chowgacha, Jashore Sadar, Jhikargachha, Keshabpur, Manirampur

*Lecturer, Department of Environmental Science and Technology, Jashore University of Science and Technology.

and Sharsha (BBS, 2011 : 13-33). Our study area Chowgacha and Monirampur upazilla are situated in Jashore district.

In Bangladesh about 17% of the Gross Domestic Product; GDP comes from the most prominent sector of agriculture which provides 45% employment opportunity (BBS, 2014). With the passage of time over population creates pressure on its limited resources such as agriculture, forest and land. The size of the forest coverage of Bangladesh was 17% but now with increasing pressure of population on forest the size decreases gradually about 6-7 % at present. Due to man-made disturbances such as deforestation, illegal logging and harvesting, slash and burn on agriculture, conversion of non-forest land for settlement, farming, recreation and industrialization have forced to decrease the percentage of forest about 2.1% annually over the last three decades (Wood, 1990). Over population is the main burden which decreases per capita land area about 0.005 ha/capita/year since 1989 (Hossain and Bari, 1996 : 21-28).

To maintain the balance of environment, 25% of the forests is mandatory. But it is a matter of great regret that forests coverage is decreases gradually about 11% and its deforestation rate is increased as 33% per year of any country in the world (Gain, 1995; FAO, 2010; Rahman, 2010 : 134-141). Our government is trying to solve these problems to increase our agricultural land for the well-being of our farmers; therefore further benefits on economic sectors. To meet up the demand and to maintain sustainable environment, a new possible solution is mandatory. A new emerging solution, agro-forestry has been practiced in many parts of Bangladesh in a limited land.

Since the period of Genesis II, the mythical Garden of Eden that time every tree was pleasant to sight and good for food. That was the time of early Mediterranean when agro-forestry had recognized subsequently as an integral component of agriculture (Ninez, 1984). At present plant trees on same land has become monotonous for farmers to meet up their demand for fodder, fuel, timber and fruit. Agro-forestry practices is defined as the concurrent use of the limited land for different purposes such as agriculture, forestry, horticulture and raising livestock in association with crops (Neupane, 2000). Similarly, it can be used as proper land use practices for growing trees, crops and of both with animals in the same unit of land (Shams, 2013).

The adoption of agro-forestry system brings not only sustainability of environment but also provides organic matter and nutrient recovery in soil (Sanchez, 1997). Agro-forestry systems are capable to grow different types of trees such as Jackfruit (Artocarpus heterophyllus), Sisso (Dalbergiasisso), Babla (Acacia nilotica), date palm (Phoenix sylyestris) in association with crops such as rice, wheat, jute, oilseed, sugarcane, vegetables and others surrounding agro-ecological region (Abedin and Quddus, 1991; Banglapedia, 2014; Food Agricultural Organization; FAO, 2004; and Hasan *et al.*, 1997 : 55-62). The

practice of monoculture has been reduced through the adoption of agro-forestry production which reduces the rate of deforestation (Rahman, 2012).

Farmers can overcome their economic problems through product diversification; increase the productivity of soil fertility and ameliorating the microclimate situation surrounding environment (World Bank, 2011). To ensure self-sustained life and meet up the demand for fuel, fodder, timber, medicinal products, essential materials are found from agro-forestry products (Haque, 1993 : 12-16). It has been estimated that about 80-82% of forests products comes annually from agro-forestry system to meet up our daily requirements (Scherr, 1992; Sanchez, 1995 : 5-55). The objective of the study was to explore the mode of agro-forestry practices and non-agro-forestry practices between Chowgacha and Manirampur village.

2. Materials and Methods

2.1. Study Area

The main two Upazilla such as Chowgacha and Manirampur had been selected under Jashore district for considering their role in economic sectors. Chowgacha is located about 23.2667° North latitudes and 89.0250° East longitudes beside the Jashore University of Science and Technology. It has a total population of about 269.31 km² and situated on the bank of river Kopothakho (Banglapedia, 2016).Another Manirampur is located between 22°55' and 23°06' North Latitudes and in between 89°09' and 89°22' East Longitudes. The area of Manirampur Upazilla is 444.72 sq km. Among the two Upazilla Durbadanga and Kultia union from Manirampur Upazilla and Narayanpur and Phulsara union from Chowgacha Upazilla were selected. Three persons per household are economically employed on an average in the two study area.

The study area enjoyed a tropical monsoon climate with the lowest rainfall in Bangladesh. The monsoon usually starts in May and ends in late September. The annual rainfall within the tract varies from 1,400-1,800 mm. and the average daily temperature ranges from 12° C during December-January to about 31°C during May-August .Four main seasons namely the dry or winter season (December to February), the pre-monsoon hot season (March -May), the monsoon or rainy season (June-September) and the post monsoon or autumn season (October–November) are recognized in the study area.

2.2. Sampling Design

South-western and North-Western part of Jashore district plays a dominant role in agriculture sector of Bangladesh. For this reasons, among the eight upazillas, two upazillas such as Chowgacha and Monirampur had been chosen for getting proper idea about the present status of production mode of agro-forestry practiced.

Two unions out of the seventeen unions from Monirampur and two unions out of eleven unions from Chowgacha Upazilla, a total of four unions were selected to get proper overview of the study area.

To get proper idea random sampling techniques were used to identify a total of twelve villages of which three villages from each union were selected. To find out the agro-forestry and non-agro-forestry practices, sixty household selected randomly. From these twelve villages, a total of 60 households are randomly selected. In selecting 60 households ware imposed to make sure that half of the households are Agro-forestry practitioners and the rest half was Non-Agro forestry or monoculture practitioners.

2.3. Data Collection and Analysis

To fulfill the objectives of the study and to get proper idea, a household survey with proper structured questionnaire is obligatory. To gain actual idea about the landscape, farm behavior, mode of production, income analysis, livelihood condition, transect walk ware carried out. Microsoft Excel was used to enter the initial collected data. To avoid some errors collected data was checked randomly compared to original completed questionnaire. Descriptive statistical analysis including frequency distribution, percentage, cross tabulation, mean and standard deviation (SD) are used for data analysis to summarize the farmers' socio-economic characteristics and farm specific characteristics.

This study classified surveyed farms into three categories : small (< 0.25 ha), medium (between 0.25 to 0.35 ha) and large (>0.35 ha) whereas farmers are classified as four income groups. Income group 1 includes less than Tk. 0.20 million yearly household income; group 2 includes Tk. 0.21 to 0.41 million.

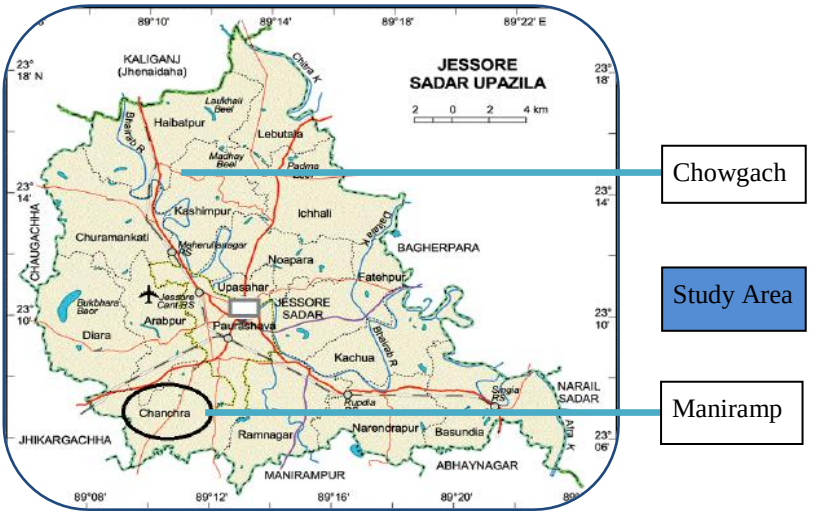


Figure 1 : Map of Study area

The commonly used technique for valuing agriculture and tree crops is the income approach Information is collected on all the sources of income of the households. Four major indicators of farmer's household livelihood situation have been taken into consideration to evaluate overall household situation. A Weighted Mean Index (WMI) has been constructed for each of the indicators, and finally an aggregate WMI is determined to examine the overall situation. Aggregate WMI is calculated through equation 1 following [16].

$$WMI = W_1 f_1 + W_2 f_2 + ... + W_n f_n = \frac{\sum W_i f_i}{\sum f_i} \qquad (1)$$

Where, WMI= Weighted Mean Index

Wi= Assigned weight for a particular class under satisfaction scale

fi= Corresponding frequency of that class

Results and Discussion

Respondent Occupation

Agriculture is the main occupation of this selected area. In Chowgacha upazilla about 56% (25 respondents) were engaged in agriculture mainly agro-forestry practices whereas 65% (20 respondents) were involved in monoculture activities. Apart from that in Manirampur upazilla 65% (20 respondents) were take part in agro-forestry practices which is quite low from Chowgacha area.

Upazilla		**Respondent's occupation**			
	Sector	**Agriculture**	**Labor**	**Service**	**Total**
Chowgacha	AP	25(56)	5(30)	10(14)	40(100)
	NAP	20(65)	10(15)	10(20)	40(100)
	Total	45	15	20	80
Manirampur	AP	20(65)	10(20)	5(15)	35(100)
	NAP	25(60)	7(30)	3(10)	35(100)
	Total	45	17	8	70

Table 1 : Occupation pattern of respondents in the study area (Source : Field Survey, 2018)
Note : AP=Agro-forestry Practices, NAP=Non-Agro-forestry Practices

Land Asset of the respondents

From the below table, it is clearly revealed that total land of Chowgacha upazilla is 1.05 ha (SD=.84, N=30) and Manirampur upazilla 0.68 (SD=.54, N=30) which indicates that people of this upazilla involved in agro-forestry practices. Besides, Farm size is enough to fulfill their demand especially people of these upazilla are not so idle because they are involved in farmland activities like livestock management etc.

Land Asset	Chowgacha upazilla (N=30)		Manirampur Upazilla (N=30)	
	Mean	SD	Mean	SD
Total land (ha)	1.05	.84	.68	.54
Arable land (ha)	.68	.56	.39	.18
Farmland (ha)	.34	.18	.29	.22

Table 2 : Land Asset of the Respondents (Source : Based on field survey, 2018)

Different category of Agro-forestry Products practices

From thee supplied fig. 2 showed different types of agro-forestry products were chosen varies with their mode of cultivation style. Majority of the people of Chowgacha Upazilla had taken different types of agro-forestry products. Among these, they involved in yard stead productions about 30% followed by 24% crop-based, 20% medicine based and so on. On the other hand, in Manirampur Upazilla, majority of the people almost 25% were directly involved in farmland activities followed by 20% crop-based and fish-based activities. This figure showed clear concept of taking different agro-forestry system to become solvent. They were adapted with different types of agro-forestry production system.

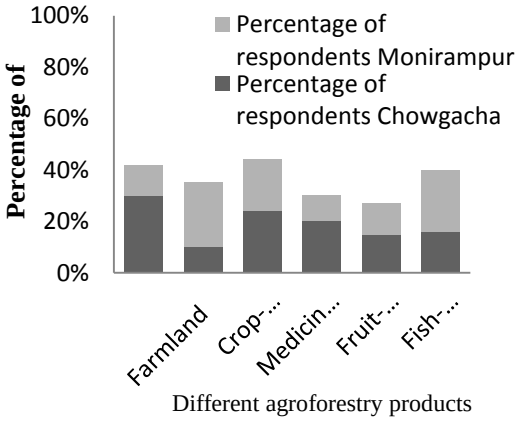


Figure : Different agro-forestry practices in the study area

Financial benefits of the Respondents

Agro-forestry practices brought not only significant differences in case of income and expenditure changed bout also rendered pivotal role in changing their livelihood condition.

Indicators	Chowgacha Upazilla	Monirampur Upazilla
Annual income in mean (BDT in million)	0.24	0.23
Standard deviation	0.15	0.09
Value of minimum	0.09	0.07
Value of maximum	0.67	0.55
Annual expenditure in mean	0.23	0.22
Calculation of Standard deviation	0.07	0.05
Value of minimum	0.05	0.03
Value of maximum	0.17	0.13

Table 3 : Financial benefits of the Respondents

From the above table, it was found that with the passage of time their mean annual income was increased rapidly in Chowgacha Upazilla than in Manirampur Upazilla. People of Chowgacha Upazilla took agro-forestry practices as their main occupation that was why their annual income was higher than that of Manirampur Upazilla. People of Manirampur Upazilla also became conscious to earn their income through agro-forestry system which paved the way to earn higher income to solve their socio-economic condition to lead their life easy and comfortable.

Trees on Farmland

From the below table, it was clearly observed that people of this Chowgacha Upazilla was directly involved to grow different types of medicinal products than Manirampur Upazilla which showed that farmers were more eager to grow medicinal products. Apart from that fruits numbers practices were greater than that of Manirampur Upazilla. However, the number of fodder trees was almost similar due to the land holding capacity was greater in non-forestry villages than agro-forestry practices.

Village	FT	Variation	FWT	Variation	MTN	Variation	FN		Variation (AP-NAP)
CAP	52	30	146	129	125	102	136	110	6
CNAP	22		27		23		26		
MAP	46	26	123	91	136	80	128	66	18
MNAP	20		32		56		62		

Table 4 : Number and types of trees on farmland (Source : Household Survey, 2018)

Note : FTN= Fodder Trees number, FN= Fruit numbers, MTN= Medicinal Trees numbers, FWT= Fuel wood and timber

CAP= Chowgacha Agro-forestry Practices; CNAP= Chowgacha Non-Agro-forestry Practices

MAP= Manirampur Agro-forestry practices, MNAP= Manirampur Non-Agro-forestry Practices

Category of AP and NAP in case of Income Group and Farm size

	Income Group of Chowgacha Upazilla					
Size of farm	**Agro-forestry Practices (AP)**			**Non-Agro-forestry Practices (NAP)**		
Farm Size	Group no 1	Group no 2	Total	Group no 1	Group no 2	Total
Small	2	22	24	0	2	2
Medium	3	5	8	3	1	4
Large	1	2	3	2	0	2
Total	6	29	35	5	3	8

Table 5 : Cross-tabulation of CAF Farmers : Income Group and Farm Size

	Income Group of Manirampur Upazilla					
Farm Size	**Agro-forestry Practices (AP)**			**Non-Agro-forestry Practices (NAP)**		
Farm Size	Group 1	Group 2	Total	Group 1	Group 2	Total
Small farm	15	2	17	0	1	1
Medium	2	0	2	0	1	1
Large farm	4	1	5	2	0	2
Total	23	3	26	1	3	4

Table 6 : Cross-tabulation of Manirampur Farmers : Income Group and Farm Size

From the above table, it was clearly observed that most of the AP in Chowgacha farmers belongs to group 2 whereas in Manirampur Upazilla group 1 indicates higher income. In agro-forestry practices village this indicated that farmers were

able to meet up their demand through agro-forestry production than that of the non-agro-forestry villages. Apart from that the non-agro-forestry farmers' income would be less than 1 lack which was not enough to meet up their demand.

Impact of CAF on Livelihood of Households

From the weighted mean of two Upazilla, it was clearly revealed that Agro-forestry household condition was good than that of the Non-agro-forestry household. Members of the household were satisfied with their agro-forestry practices.

Indicators	**Chowgacha Weighted Mean**		**Manirampur Weighted Mean**	
	AP	NAP	AP	NAP
Household Food Security Condition	3.28	2.54	2.88	1.56
Household Education Expenditure Affordability	4.84	3.83	3.50	2.45
Household Clothing Expenditure Affordability	3.53	2.54	4.76	3.34
Household Medical Expenditure Affordability	4.23	3.34	4.87	3.27

Table 7 : Calculation of Weighted mean of Livelihood of the Households

Income from livestock products

Chowgacha village	BMP (Lit)	CMP (Lit)	IMS (TK)	QGS (N)	IGS (TK)	IOL(TK)	IMP (TK)	CE (TK)
AP	1500	680	20116	916	11207	2026	4201	640
NAP	500	200	6456	213	4200	600	2312	3000
AP-NAP	1000	480	13660	703	7007	1426	1889	-2360
Manirampur Village								
AP	1450	760	22367	528	11626	3045	5423	876
NAP	400	300	7860	328	2000	567	3425	459
AP-NAP	1050	460	14507	200	9526	2478	1998	417

Table 8 : Income from livestock production and source of income by village (Source : Household Survey, 2018)

Note : AP- Agro-forestry Practices, NAP-Non-Agro forestry Practices, BMP-Buffalo milk production, CMP-cow milk production, IMS-income from milk sale, QGS-quantity goat sale, IGS-income from goat sale, QO-quantity of livestock other than above, IOL-income from other livestock, IMP- income from milk product, CE-income from chicken and egg, N-number of livestock., Tk= Bangladeshi taka

From the above table, it was clearly revealed that agro-forestry practices village was more capable to buffalo and milk production approximately 1500 and 680 liters compared to Non-agro-forestry village. This is due to abundant fodder supply which enhances their farm size. Apart from that that there was a significant difference in the milk production and income status derived from the livestock (large cattle) in Agro-forestry and Non-agro-forestry villages. However, the result showed that income derived from chicken and eggs was more in Non-agro-forestry village.

Conclusion

Agro-forestry is the land use science, which deals with the interactions between trees, crops, and of both with animals in the same unit of land. The study clearly showed variation of the chosen agro-forestry products. Majority of the people were 30% directly involved in yard stead cultivation in Chowgacha Upazilla. But in Manirampur Upazilla, they were almost 25% involved in farmland activities. There was a significant difference between annual incomes between two Upazilla. Annual income was higher in Chowgacha Upazilla whereas in Manirampur Upazilla people became more active to take part different agro-forestry production to increase their income. Similarly, the study clearly showed that the non-agro-forestry village was facing a shortage of firewood and fodder due to heavy pressure of grazing on forest and community lands. Agro-forestry system practiced in both the Chowgacha and Manirampur Upazilla, income analysis showed that agro-forestry farms are more profitable than non-agro-forestry farms. Income from sale of livestock, fruits, milk and milk products was higher in agro-forestry village as compared to non-agro-forestry village.

At present, it is mandatory to take effective steps for Programme implementation to teach about the benefits of agro-forestry system. Not only this, small home agro-forestry system should be ensured first than community-based approach to gain sustainable solution. In fine, agro-forestry practices are becoming an environmental friendly at present. Besides, it has no environmental impact to fulfill the sustainable development goal as well as in meeting food requirement of rural household to greater extent.

Recommendation

The benefits of agro-forestry system can bring drastic changes in our agricultural sectors. Besides, to alleviate poverty reduction agro-forestry practices in agricultural sectors can introduce new way to get rid of poverty so to enhance our economic development. It is high time, our government can render pivotal role to facilitate more training to teach every farmers about the effective role of agro-forestry to develop our nation's economy. In addition, policy makers can take part active role to design the necessary support measures to increase farm income as well as livelihood in every district. Therefore, it suggests for planned expansion of cropland agro-forestry for overall socio-economic development of the farmers.

References

Bangladesh Bureau of Statistics; BBS (2011). *Statistical Year Book of Bangladesh*. Statistics Division, Ministry of Planning, Bangladesh Secretariat, The Government of the People's Republic of Bangladesh.

Bangladesh Bureau of Statistics; BBS (2014). *Yearbook of Agricultural Statistics, Bangladesh Bureau of Statistics*. The Government of the People's Republic of Bangladesh.

Banglapedia (2014). 'Forest and Forestry'. National encyclopedia of Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka. Retrieved January 3 from www.banglapedia.org.

Food Agricultural Organization; FAO (2004). 'Community Forestry for Poverty Reduction in Bangladesh, In Proceedings of the regional Workshop on Forests for Poverty Reduction : Can Community Forestry Make Money'. Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, Thailand. 19 : 7. http://www.fao.org/docrep/007/ad511e/ad511e00.htm.

Food and Agriculture Organization; FAO (2010). 'Global Forest Resources Assessment 2010.' Main report, *FAO Forestry Paper* 163. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome (PDF), A review of the status and trends of forest cover in Bangladesh and Philippines.

M. F. Haque (1993). *Agroforestry Training Course Module for Bangladesh*. Training Support Series 2 BRAC– Winrock International, BRAC, Bangladesh.

M. Z. Abedin and M. A. Quddus (1991). *Agroforestry Systems in Bangladesh with Particular Reference to Economics and Tenurial Issues*, in Mellink, *Agroforestry in the Asia and the Pacific.* FAO and Winrock International, Bangkok, Thailand.

P. Gain (1995). *Forest and Forest People of Bangladesh*. Bangladesh, Land, Forest and Forest People, Society for Environment and Human Development (SEHD).

P. J. Wood (1990). 'The scope and potential of agroforestry, Outlook on Agriculture'. 19:141-14

P. Sanchez (1995). *Science in agroforestry, Agroforestry Systems*, 30(1-2) : 5-55. doi : 10.1007/bf00708912

R. P. Neupane (2000). *Prospects of Agroforestry promotion in the hills of Nepal*. Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand.

R. Shams (2013). *Socio-cultural Impacts of Agroforestry Improvements in Narsingdi, Bangladesh*, M. S. Dissertation, University of Alberta, Canada.

S. A. Rahman (2012). 'Bangladesh forests disappearing at alarming rate', Center for International Forestry Research (CIFOR). Available at : https://forestsnews.cifor.org /9434/bangladesh-forestsdisappearing-at-alarming- rate.

S. A. Rahman, K.M. Farhana, A. Imtiaj, S.W. Wachira, M.A. Rahman and S. Saha (2010). 'Sustainable Forest Management for Poverty Reduction through Agroforestry Options : Lesson from the Remote Uplands of Eastern Bangladesh.' *Libyan Agriculture Research Center Journal International*, 1 (3) : 134-141.

S.M.A. Hossain and M. N. Bari (1996). Agroforestry Farming System, In M.A. Haque (eds.), Agroforestry in Bangladesh, Swiss Development Co-operation (SDC), Dhaka and Bangladesh Agricultural University (BAU), Mymensingh.

Satter Hasan, S. M. Asaduzzaman, M. A. Hussain, and M. F. Haque (1997). 'Agroforestry Systems in the Crop Field and Homestead at Bagherpara FSR Site', Jessore, Proc. National Workshop on Agroforestry Research, Dhaka, Bangladesh.

V. K. Ninez (1984). *Household gardens : Theoretical considerations on an old survival strategy.* Potatoes in Food Systems Research Series, Report No. 1, International Potato Center, Lima, Peru.

নিয়মাবলি

১. নিবন্ধের দুটি কপি সরাসরি বা ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে। লেখার সঙ্গে একটি সিডি (CD)-ও পাঠাতে হবে।

২. নিবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখার শিরোনাম, লেখকের নাম, প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি/পদবি লিপিবদ্ধ থাকবে। মূল প্রবন্ধ শিরোনামসহ দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে শুরু হবে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লেখকের নাম থাকবে না।

৩. নিবন্ধের মূল পাঠ A4 কাগজে ১৪ পয়েন্ট বাংলা 'সুতন্বী এমজে' ফন্টে দুই লাইনের মাঝে ১.৫ ফাঁক রেখে দুই দিকে সমতা (justified) বিধান করে কম্পোজ করতে হবে।

৪. মূল পাঠে সারণি (table) ও চিত্রাদি থাকলে সেগুলোর পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা (যেমন : ১, ২, ৩...) প্রদান করতে হবে। প্রত্যেক সারণি ও চিত্রের যথাযথ আখ্যা (caption) প্রদান জরুরি।

৫. প্রবন্ধের মূল পাঠে অন্য কোনো উৎসের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থাকলে তা একই অনুচ্ছেদে উদ্ধৃতি চিহ্ন (" ") ও সূত্রসহ উল্লেখ করতে হবে। তবে উদ্ধৃতিটি ২৫ শব্দের বেশি হলে তা মূল পাঠের নিচে বাঁ দিকে ১/৪ ইঞ্চি ভেতরে (indenting) ১২ পয়েন্টে নতুন অনুচ্ছেদে সূত্রসহ উল্লেখ করতে হবে। এক্ষত্রে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করার দরকার নেই। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তিবিন্যাস অক্ষুণ্ন থাকবে।

৬. প্রবন্ধ বাংলা একাডেমি প্রণীত *আধুনিক বাংলা অভিধান*-এর বানান অনুযায়ী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের পরিবর্তন হবে না।

৮. প্রবন্ধের শুরুতে ১০০ শব্দের সারসংক্ষেপ থাকতে হবে। বাংলা ভাষায় রচিত প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ বাংলায় এবং ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ ইংরেজিতে লেখা বাঞ্ছনীয়।

৯. মূল পাঠে কোনো বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করতে চাইলে তা মূল পাঠের শেষে অন্ত্য-টীকায় (end-note) উপস্থাপন করতে হবে। এ ধরনের টীকা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল পাঠের উদ্দিষ্ট ব্যাখ্যা বা বক্তব্য অধিসংখ্যা (superscript) দিয়ে ([১], [২], [৩] ইত্যাদি) নির্দেশ করতে হবে।

১০. অন্য কোনো লেখকের উদ্ধৃতি ব্যবহারের নিয়ম :

১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর *নজরুল ইসলাম : কবি ও কবিতা* বইয়ের ২৫২তম পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত অংশটি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপিত হবে :

> চিত্রকল্প প্রধানত বিষয়ের আত্মার চেয়ে বিষয়ের শরীর ফলিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষী। অনেক সময় উপমা, রূপক ও প্রতীক : কবিতার এই সব উপচারের ছদ্মপোশাক প'রে লুকিয়ে থাকে চিত্রকল্প; অবশ্য উপমা, ও প্রতীক মাত্রেই-যে চিত্রকল্প নয়—সে তো বলা বাহুল্য। (মান্নান, ১৯৭৭ : ২৫২)

১১. প্রবন্ধের মূল পাঠের শেষে একটি সহায়কপঞ্জি (reference) থাকবে। এই সহায়কপঞ্জিতে কেবল মূল পাঠে যেসব লেখক ও গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তা

বর্ণানুক্রমে (alphabetic order) বিন্যস্ত করতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সহায়কপঞ্জি রচনা করতে হবে, যেখানে প্রথমে বাংলা বই স্থান পাবে। সহায়কপঞ্জি রচনার নিয়ম নিম্নরূপ :

গ্রন্থ

আহমদ শরীফ (১৯৭৭)। *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*। মুক্তধারা, ঢাকা।

M. A. Rahim (2013). *The History of the University of Dacca*. Dhaka University, Dhaka.

গবেষণা পত্রিকা

আনোয়ার পাশা (১৩৭৫)। 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি ও হিন্দুমেলা'। *সাহিত্য পত্রিকা*, দশম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১২. গ্রন্থের একাধিক লেখক থাকলে তথ্যনির্দেশে সকলের নাম থাকতে হবে।

১৩. প্রকাশিত কিংবা প্রকাশের জন্য বিবেচনাধীন লেখা গ্রহণ করা হয় না।

১৪. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার দুটি কপি এবং তাঁর লেখার ৫ কপি অফপ্রিন্ট পাবেন।

১৫. প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য নিয়মানুযায়ী সম্মানী প্রদান করা হবে।

প্রবন্ধ প্রেরণ ও যোগাযোগ

সম্পাদক
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
ইমেইল : rub.patrika@rub.ac.bd

